আরশি নগর

বাউল ফকির তত্ত্বতালাশ

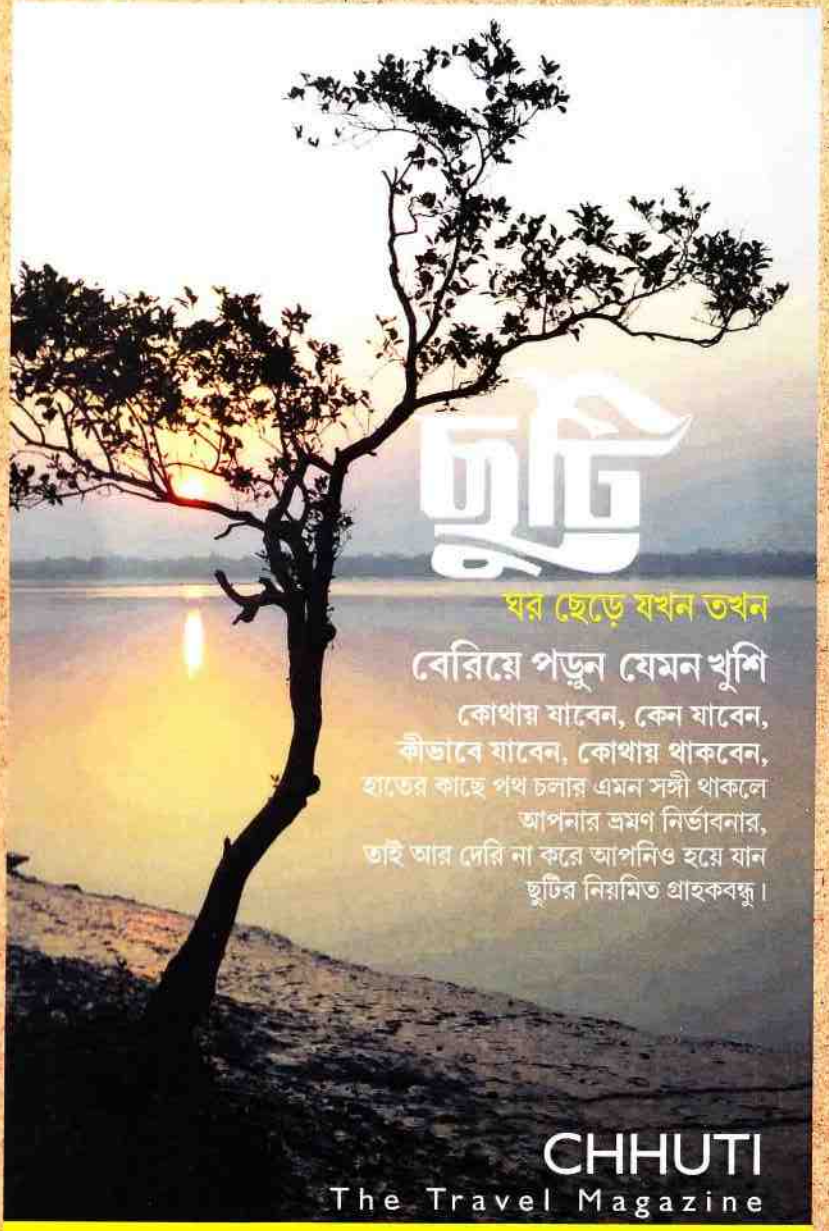

CITY OFFICE : G-2, GLOBAL BUSINESS HUB,
7A, RANI RASHMONI ROAD, KOLKATA - 700 013,
PH.: [033] 6567 2416, e-mail : edichhuti@gmail.com

আরশিনগর

আরশিনগর
প্রথম প্রকাশ : জানুয়ারী, ২০১১

© বাউল-ফকির উৎসব কমিটি

প্রকাশক : বাউল ফকির উৎসব কমিটি
প্রচ্ছদ : অমিত রায়
অক্ষরবিন্যাস : সাইনোস্যুর
মুদ্রক :
সারদা প্রিন্টিং ওয়ার্কস
৯সি, শিব নারায়ণ দাস লেন
কলকাতা—৭০০ ০০৬

বিনিময় : ১৫০ টাকা

সূচীপত্র

আমাদের কথা
শিকড়বাকড়
লালনের জবান ৭
স্বপ্নরাজ্যের সন্ধানে : প্রান্তিক সমাজের ব্রাত্য ধর্ম ও রাজনীতি ২৫
রূপান্তরিত হতে হতেও বাউল বেঁচে আছে — আবুল আহসান ৩৭
সুফিবাদ ও তার পরম্পরা ৬৯
মরমি সাধক পাঞ্জু শাহ ৮৩
আজকের বাংলাদেশে সাধক বাউল-ফকিরদের ভবিষ্যৎ অন্ধকার
— তনভির মোকাম্মেল ১০৭
বাংলার বাউল তথা অন্যান্য দেশজ ও লোকগান চর্চার
আধুনিক ইতিহাস : একটি উদ্ধৃতি সংকলন ১২৩
এখন বাংলা গান ও বাউল-ফকির একটি আলোচনা ১৮৯

মায়া লাগাইছে, পীরিতি শিখাইছে
দেওয়ানা বানাইছে,
কী জাদু করিয়া বন্দে
মায়া লাগাইছে

আমাদের কথা

বাউল গান বা ফকিরি গান কলকাতায় তো কতই হয়। তা বলে একটা গোটা উৎসব শহরের বুকে এবং শুধু বাউল-ফকিরদের নিয়ে? এমনটা, বলাই বাহুল্য, শোনা দুষ্কর। কিন্তু এমনটাই হয়ে চলেছে প্রতি বছর জানুয়ারীর দ্বিতীয় শনি-রবিবার গত পাঁচ বছর ধরে কলকাতার যাদবপুর অঞ্চল সংলগ্ন শক্তিগড় ময়দানে। আগামী ৮-৯ জানুয়ারী, ২০১১, প্রথা মেনেই অনুষ্ঠিত হতে চলেছে ষষ্ঠ বাউল-ফকির উৎসব। আয়োজক বাউল-ফকির উৎসব কমিটি। ভণিতাহীন নামেই কমিটির উদ্দেশ্য পরিস্কার। কমিটির সদস্যরা কেউ শিল্পী, কেউ গায়ক, কেউ বাজনদার, কেউ সংগীত গবেষণায় ব্যপৃত, কেউ এন.জি.ও কর্মী অথবা ব্যবসায়ী। বয়স পঁচিশ থেকে পঞ্চান্ন। কিন্তু এঁদের একটা মিল এঁরা সকলেই বাউল এবং ফকিরি গানের ভক্ত। আর একটা মিল এঁরা বহু বছর ধরে শক্তিগড় ময়দান সংলগ্ন ১৭ শক্তিগড় বাড়িতে রবিবার সন্ধ্যায় জমাটি আড্ডায় মাতেন।

২০০৫ সালের জুন মাসে এমনই এক রবিবারের আড্ডায় আড্ডাধারীরা ক্ষেদ প্রকাশ করতে থাকেন যে আজকাল মেলা মহোৎসবে গিয়েও আর মনের মত গান শুনতে পাওয়া যায় না। কারণ গায়কের অভাব নয়। কারণ, প্রাচীন মহাজনের পদ শুনতে সাধারণ অদীক্ষিত শ্রোতার অনীহা। ফল বৃহদাংশ শ্রোতার দাবিতে রসের গানের নামে নাচাকোঁদাই এখন দস্তুর হয়ে উঠেছে। একনিষ্ঠ বাউল গানের শ্রোতার মন তাতে ভরা অসম্ভব।

এমনই সব ক্ষেদোক্তির মাঝেই একজনের মন্তব্য, আমরা নিজেরাই একটি উৎসবের আয়োজন করি না কেন এই শক্তিগড় মাঠেই? তাতে আমাদেরও শোনা হয়, শিল্পীরাও প্রাচীন পদ গেয়ে আনন্দ পান। সকলেই এই প্রস্তাবে একবাক্যে সম্মতি জানান সোৎসাহে। কবে হবে উৎসব? সবচেয়ে ভালো সময় শান্তিনিকেতনের পৌষ মেলা আর কেঁদুলির জয়দেব মেলার মধ্যবর্তী সময়। তাই জানুয়ারীর দ্বিতীয় সপ্তাহান্তই প্রতিবছর উৎসবের সময় সাব্যস্ত হল। উৎসবের খরচা আসবে কোথা থেকে? কেন আর সব উৎসবের খরচা আসে যেমন ভাবে। বন্ধুবান্ধব-শুভানুধ্যায়ী-সমব্যথীদের চাঁদা আর উৎসাহে। আর খুচরো-খাচরা বিজ্ঞাপণে।

আর ঠিক হল প্রতি উৎসবে একজন প্রবীণ শিল্পীকে সম্মানিত করা হবে।

২০০৬ সালের জানুয়ারী মাসে শুরু হয়ে গেল প্রথম উৎসব। সম্মানিত হলেন বাঁকুড়ার খয়েরবনি থেকে আগত বাউল শ্রী সনাতন দাস ঠাকুর। তাঁর বয়স তখন ৮৫। শিল্পীর সংখ্যা সেবার ছিল প্রায় পঞ্চাশ। ২০০৭ সালে সম্মানিত হলেন বীরভূম থেকে আগত প্রবীণ গায়ক শ্রী বিশ্বনাথ দাস বাউল। শিল্পীর সংখ্যা সেবার ষাট ছাড়িয়েছিল।

২০০৮ সালের তৃতীয় উৎসবের আগে আয়োজকেরা উৎসব বন্ধ করে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েই নিয়েছিলেন। কিন্তু ততদিনে উৎসব কমিটির স্থায়ী সদস্য হয়ে ওঠা নদীয়ার গৌড়ভাঙা গ্রামের আরমান ফকির, তাঁর ভাই গোলাম ফকির আর গুসকরার কার্তিক দাস বাউল বসলেন বেঁকে। তাঁদের বক্তব্য এই উৎসব কলকাতায় বাউল-ফকিরদের একমাত্র নিজস্ব জায়গা। এ তাঁরা এত সহজে হাতছাড়া করবেন না। অতএব হল তৃতীয় উৎসব। এবার সম্মানিত হলেন আড়ংঘাটা, নদীয়ার শ্রী সুবল দাস বাউল।

উৎসবের বার্তা যে ক্রমেই ছড়াচ্ছে বোঝা গেল যখন এই উৎসব শুরুর আগে দিন বিখ্যাত বাউল শিল্পী শ্রী পবন দাস স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে এই কমিটির নম্বর যোগাড় করে উৎসবে গান গাইতে চাইলেন। তিনি গাইলেনও।

চতুর্থ উৎসব ২০০৯। সম্মানিত হলেন প্রবাদপ্রতিম শিল্পী গৌর ক্ষ্যাপা। এবারে শিল্পীর সংখ্যা একশ। নদীয়া থেকে ষষ্ঠী ক্ষ্যাপা এলেন নিজের উদ্যোগে। সঙ্গে রঞ্জিত গোঁসাই সহ আরও ছয়জন।

পঞ্চমবারে এ উৎসব আক্ষরিক অর্থেই আন্তর্জাতিক হয়ে উঠল। বন্ধুবর শ্রীহট্টের অম্বরীষ দত্ত ততদিনে এ উৎসবে উপস্থিত থাকা নিয়ম করে ফেলেছেন। তাঁরই উদ্যোগে সিলেট থেকে ৮-৯ জনের একটি দল এসে মাতিয়ে দিয়ে গেলেন উৎসব। সঙ্গে এপারের শিল্পীরাতো ছিলেনই। সম্মানিত হলেন সিলেট থেকে আগত শ্রীমতী চন্দ্রবতী রায় বর্মণ ও নদীয়ার শ্রী বীরেন দাস।

সিলেটের দলটি এবছরও আসছেন। আর আসছেন কুষ্টিয়ার লালনপন্থীদের থেকেও একদল শিল্পী। সে দায়িত্ব বর্তেছে ওপারের প্রখ্যাত বাউল গবেষক এবং কৃতী লেখক শ্রী আবুল আহসান চৌধুরীর ওপর। এছাড়াও আসছেন ঢাকার মাণিকগঞ্জ থেকে প্রখ্যাত গায়ক শাহজাহান মুন্সী। এতে করে ওপারের প্রতিনিধিত্ব বাড়বে। এবং উৎসব আয়োজকরা ধীরে ধীরে আগামী বছরগুলিতে শিলচর বা ত্রিপুরার শিল্পীদের সঙ্গেও কলকাতার উৎসাহী শ্রোতাদের পরিচয় করিয়ে দেওয়ার দায়ভার গ্রহণ করবে। শিলচর থেকে এবারই আসছেন ফরেজুদ্দিন ও ময়না। কিন্তু শিলচর থেকে পরবর্তী বছরগুলিতে আরো গায়ককে নিয়ে আসা আমাদের অবশ্য কর্তব্য।

এই কয়েক বছরে উৎসবের অভিমুখও অনেক বদলে গেছে। নিছক ভালো গান শোনার তাগিদ থেকে যে উৎসব শুরু হয়েছিল তা এখন পুরোন গায়নরীতি আবিষ্কারেও ব্রতী হয়েছে। গত দু'বছরে সারা রাতব্যাপী পাল্লাগানের অনুষ্ঠান অনুভবী শ্রোতার নজর কেড়েছে এবং সে রেকর্ডিং উৎসরের সময় প্রকাশিতও হয়েছে।

এবছরের উৎসবে নতুন ঘটনা দুটি। প্রথম নিঃসন্দেহে আরশিনগর পত্রিকার প্রকাশ। শুরু থেকেই আমাদের ইচ্ছে ছিল উৎসব উপলক্ষে বাউল-ফকির বিষয়ে একটি মার্জিত রুচিসম্পন্ন পত্রিকার প্রকাশ। অবশেষে এই বছর আরশিনগর যাত্রা শুরু করল। আমাদের দর্শকদের পক্ষে এ দাবী বহুবার উঠেছে। আশা করি সে দাবী এবার কিছুটা হলেও মিটবে।

আরশিনগর সম্বন্ধে একটা-দুটো কথা বলা দরকার। আমাদের প্রশ্ন ছিল প্রাচীন বাউল অথবা ফকিরি গানে তো বহু আরবি-ফারসি শব্দ আছে, তাহলে লিখিত বাংলা ভাষা এত সংস্কৃতগন্ধী কেন? মানে যে কোন প্রাচীন বাংলা বয়ানেই তো আরবি-ফারসি শব্দের ছড়াছড়ি, তাহলে বাংলা ভাষার এর কোন প্রভাব নেই কেন? প্রখ্যাত ভাষাতাত্ত্বিক শ্রী প্রবাল দাশগুপ্ত আমাদের সে প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন এবং প্রশ্নটি শুধু শব্দ ব্যবহারেই সীমাবদ্ধ কিনা সে প্রশ্নও তুলেছেন। বলাই বাহুল্য, তাঁর নিজস্ব অনুকরণীয় ভঙ্গীতে।

প্রখ্যাত ভাষ্যকার সুমন্ত বন্দ্যোপাধ্যায় রাজনৈতিক আন্দোলনের ওপর বাউল গানের প্রভাব বিষয়ে একটি মনোগ্রাহী নিবন্ধ লিখেছেন। বলাই বাহুল্য, তাঁর দৃষ্টিকোণ শুধু নতুন নয়, চমকপ্রদ।

আমরা প্রতি বছর একজন পদকর্তার জীবনী এই পত্রিকায় প্রকাশ করব। সে পথে প্রথম পদক্ষেপ এবারে প্রকাশিত পাঞ্জু শাহের ওপর লেখা নিবন্ধটি।

এছাড়া থাকছে আবুল আহসান চৌধুরী ও চলচ্চিত্রকার জনাব তনভির মোকাম্মেলের সাক্ষাৎকার। বাউল ও ফকির বিষয়ে তাঁরা দীর্ঘদিন কাজ করছেন। সাক্ষাৎকার দুটি নিঃসন্দেহে সাধারণ পাঠকদের আলোকিত করবে।

বাউল চর্চার ইতিহাস বিবৃত আছে সাত্যকি বন্দ্যোপাধ্যায় নির্বাচিত উদ্ধৃতিমালায়। এছাড়া বাউল গানের ভবিষ্যৎ নিয়ে আছে রংগন চক্রবর্তীর সঙ্গে আলোচনা।

দ্বিতীয় নতুন ঘটনাটি আরও গুরুত্বপূর্ণ। আমাদের ইচ্ছে ছিল বাউল-ফকির গবেষকদের দুষ্প্রাপ্য বইগুলির পুনঃপ্রকাশ। সেইদিকে নজর রেখেই আবুল

আহসান চৌধুরীর লালন ফকির এর জীবনী গ্রন্থটি প্রকাশিত হবে গাংচিল প্রকাশনার সহায়তায়। বইটিকে দুষ্প্রাপ্য বলার কারণ এপার বাংলায় বইটি পাওয়া যায় না। বাউল ফকির উৎসব তার নিজের সীমিত ক্ষমতার মধ্যে থেকেই দুই বাংলার মুখোমুখি আলাপের কিছু সুযোগ তৈরী করার চেষ্টা চালাতে পারছে। এটাই আনন্দের।

এবারের উৎসবের শুরু হচ্ছে চরম দুঃখের স্মৃতি বয়ে। আমাদের পরম সুহৃদ ও উৎসবের পরামর্শদাতা প্রবাদপ্রতিম বাউল শ্রী সুবল দাস গোঁসাই গত অক্টোবর মাসে আমাদের মায়া কাটিয়ে আমাদের ছেড়ে গেছেন। এ আমাদের অপূরণীয় ক্ষতি। কত গান যে হারিয়ে গেল তার সাথে। সুবলদাকে যাঁরা চিনতেন তাঁরা বুঝবেন কত ক্ষতি আমাদের হল।

এই আদ্যন্ত নাগরিক আবহে বাউল-ফকির উৎসব গ্রামীণ লোকশিল্পীদের কিছুটা পরিসর করে দিতে পেরেছে এখন অব্দি। সকলের সাহায্য ছাড়া তাতো সম্ভব হত না। আশা করি দিনে দিনে আমাদের সহায়তায় আরো আরো মানুষ এগিয়ে আসবেন।

সম্পাদনা সম্বন্ধে কিছু কথা বলা উচিৎ। বানানরীতি সব সময় একভাবে অনুসরণ করা যায়নি। এতে পাঠকরা বিভ্রান্ত হবেন নিশ্চয়। এছাড়াও যতিচিহ্নের ব্যবহার কথোপকথনের ক্ষেত্রে খানিকটা অন্যরকম। বিভ্রান্তি ছড়ানোর কোন বাসনা আমাদের ছিল না। কিন্তু তা হয়তো কিছুটা হবে। সম্পাদক হিসেবে এর দায়িত্ব একান্তই আমার।

পার্থ মজুমদার
শক্তিগড়, যাদবপুর
কলকাতা

শিকড়বাকড়

অনিন্দ্য চাকী

প্রান্ত থেকে অবাধ প্রান্তরে মেশে নিকট ও দূর
বলো বলো কে বাজালো রাঙামাটি, ধুলো পায়ে সুর?
নষ্টস্মৃতি আমি আলো ছায়া আঙিনায় দাঁড়ালাম
বলো বলো কে আমি কোথায় বাড়ি কি আমার নাম?
ধ্বনি সন্ধানে যদি মাধুকরী করে প্রতিধ্বনি
জীবনের প্রিয়তম অন্তরাকে পাবে কি অরণি?
আলপথ বলো ঝরা পাতার আগুন ভালোবেসে
কে জাগালো মায়া অজয়ের আকাশে বাতাসে?

দোতারার টানে ভেসে গিয়ে কে বললো 'আছি, আছি'
অক্ষরে অক্ষরে বৃথা কানামাছি কতো যে খেলেছি!
চোখ থেকে খসে গেছে সব তারা বিষাক্ত ছোবলে,
প্রাণের পৃথিবী আজ অপ্রেমের রক্তাক্ত দখলে
পায়ের তলায় পড়ে আছে ফেঁসে যাওয়া নামাবলী,
পায়ে পায়ে, সুর, চলো শিকড়বাকড় নিয়ে চলি
ফিরে এসো, ভয়ে উড়ে যাওয়া হাজার হাজার পাখি
ধ্বংসস্তূপে দু একটা জলে ভেজা বীজ পুঁতে রাখি!

আলোয় লুকিয়ে থাকে অন্ধকারে আসে কাছাকাছি
জানালা দরজা সব খুলে দেয় সুজন সে মাঝি
গানে গানে কি সহজ মন্ত্রে ভাঙায় সমস্ত ভুল
কাঁটাতার ভেসে যায়, ভাসে নদী এ কূল ও কূল।

সর্বসাধন সিদ্ধ হয় তার
ভবে মানুষগুরুর নিষ্ঠা যার

লালনের জবান

প্রবাল দাশগুপ্ত

আমি তো নেহাতই লিখিয়ে। আপনারা যাঁরা এই লেখাটার পড়িয়ে তাঁদের তো হরেকের মালুম আছে যে, এই যে এখন ২০৮৮ সনে আমরা পা দিয়েছি, এর বহুত সাল আগে, ২০৫০ সনের গোড়াতেই, বাংলা জবানের ইউনিফিকেশন চুক্তিতে দস্তখত করা হয়। ঝাণ্ডার গেরুয়া অংশের হিন্দু অনুস্বর বিসর্গ, সবুজ হিসসার ইসলামি আলেফ মীম আর শাদা পার্টের ইসাই এ বি সি ডি যাতে সমান মওকা পায় উসলিয়ে তখন থেকে মেপে মেপে আমরা ম্যাক্সিমাম বরাবর বরাবর অনুপাতে তিন রকম লবজ মিশিয়ে মিশিয়ে বাংলা বোলির ভোলবদল করে দেওয়াতে সাম্প্রদায়িক ভাইচারা এনটায়ারলি হুকুমতের আয়ত্তে চলে আসে। আপনারা আলবত ভুলে যাননি যে ২০১১-র চুনাওয়ে বাম ফ্রন্টের ডিফিটের পর বহুত-সারে কমিউনিস্ট লোগ বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের সাজেশন ফলো করে রাতারাতি ইসাই হয়ে যাওয়াতে বাঙালি পপুলেশন তখন থেকে হাফ ইসাই। তখন থেকে তরাজু সীধা রাখার খাস তৌরের কোশিশ চালু আছে। জবানের এলাকাও সেই কোশিশের আওতায় শামিল।

ইসলিয়ে, ডিয়ার ফ্রেন্ডস, আপনাদের দিলচস্প লাগবে জানতে পেরে যে সুপ্রাচীন এক তোরঙ্গ থেকে ডিসকাভার করা গিয়েছে সেকেলে বাংলায় রচিত বয়ান। কোন এক দস্তিদারের লেখা, নামের বাকিটা ডিসাইফার করতে নারলাম। বয়ানের টপিক 'লালনের ভাষা'। জবানকে যে সেকালে ভাষা বলত এটুকু পুরোনো ডিকশনারি থেকে মালুম হল। লেকিন দস্তিদারের বয়ানের বহুত কথা আমি সমঝাতে নারছি। পড়িয়েদের সহারা মিললে আমাকে বহুত খুশি লাগবে।

... দস্তিদারের পাণ্ডুলিপি :

উনিশ শতক থেকে যে বাংলা প্রতিপত্তি লাভ করেছে সে কি সংস্কৃতের ওজন বইবার বিড়ম্বনায় আটকে গেছে? তার কপালে যেসব আরবি-ফারসি শব্দের ঐশ্বর্য জুটতে পারত সেগুলো হয়তো ফসকে গেল সাংস্কৃতিক ইতিহাসের কারসাজিতে। এই পথের যে বাঁকে লালন ফকিরের কাছ থেকে রবীন্দ্রনাথ কিছু শেখার সুযোগ পাচ্ছিলেন, সেই বাঁকটার দিকে বিশেষ মন দিয়ে তাকালে কিছু

লাভ হতেও পারে। রবীন্দ্রতাত্ত্বিকদের হাতে সেই গবেষণার কয়েকটা ধাপের দায়িত্ব ন্যস্ত রেখে এখানে আমরা লালনের শব্দচয়নে আরবি-ফারসির স্থান নিয়ে দু-চার কথা চালাচালি করলে পারি। করে দেখি লাভ সত্যিই হল কিনা।

এ কাজ যিনি শব্দবিদ্যার পারদর্শিতার পূর্ণাবয়ব স্তরে করতে চান তাঁর অপরিহার্য সঙ্গী নিশ্চয়ই শক্তিনাথ ঝা-র "ফকির লালন সাঁই : দেশ কাল এবং শিল্প" (কলকাতা : সংবাদ, ১৯৯৫)। শক্তিনাথ ঝা ওই বইয়ে লালনের মূল খাতার বানানের অবিকল মুদ্রণের ব্যবস্থা করে লালনের বয়ানচর্চাকে এক ধাপ এগিয়ে নিয়ে গেছেন। কারক অনুযায়ী বিভক্তি প্রয়োগের এবং সমস্যাদির জরিপও করেছেন বাংলা ব্যাকরণের প্রথাসিদ্ধ চর্চার পৌর্বাপর্য মেনে; সেই জরিপও গবেষকদের কাজে লাগবে।

তবে কেউ যদি বাংলা ভাষার সামগ্রিক উত্তরাধিকারের দিক থেকে, নির্বিশেষ ভাষাতত্ত্বের মূলসূত্র মাথায় রেখে, লালনের শব্দচয়নের দিকেই তাকাতে চান, তাহলে অবশ্য মূল বানানের অবিকল চেহারার প্রতি অত্যধিক মন দিতে চেষ্টা করলে হিতে বিপরীত হবার সম্ভাবনা। সেজন্যে "লালন-সঙ্গীত : প্রথম খণ্ড" (ফকির আনোয়ার শাহ সংকলিত ও সম্পাদিত, কুষ্টিয়া : লালন মাজার শরীফ ও সেবা-সদন কমিটি, দ্বিতীয় সংস্করণ ২০০০) সম্বল করেই এগোচ্ছি এ যাত্রা। জানি যে ভাবী কাল — হয়তো ২০৫০ সালে, হয়তো ২০৮৮,আচ্ছা কেন বিশেষ করে ২০৮৮ সালের কথা মনে হচ্ছে বলুন তো, ঠিক বুঝতে পারছি না, যাক গে — জানতে চাইবে "আর অপর দুই খণ্ড?"। সেই জিজ্ঞাসার আগাম জবাব দিয়ে বলি, মরমিয়া সাধকের বয়ানের বেলাতেও যদি বিন্দুতে সিন্ধু দর্শনের চেষ্টা আমাদের চোখে অসংগত ঠেকে, তাহলে আমাদের সামূহিক লোডশেডিং কেউ ঘোচাতে পারবে না। হতেই তো পারে যে অপর দুই খণ্ডে (একই সংকলক-সম্পাদক, একই প্রকাশক, তৃতীয় খণ্ড ১৯৯৮, দ্বিতীয় খণ্ডের দ্বিতীয় সংস্করণ ২০০০) এমন কিছু হাতে পাবেন যার অভিঘাতে এখানে বিবৃত সমস্ত বক্তব্য চুরমার হয়ে যাবে, তাসের দেশের ভাষায় যাকে বলে খণ্ডিত। জানতে যিনি সত্যিই চাইবেন তিনি নিশ্চয়ই নিজেই ঘেঁটে দেখবেন। অত আগ্রহ যাঁর আছে তিনি তাছাড়া আমার বক্তব্যটা একটু শুনে নিতে চাইবেন প্রথমে। "অপর দুই খণ্ড?" বাক্যটা যে অনতিপ্রাচীন এক বয়ানের উদ্ধৃতি একথা জেনে আপনাদের কোনো লাভই হবে না; আপনাদের জানবার দরকার নেই, আমার দরকার আছে জানানোর; এটাও অভিবাদনের একটা ধরন।

ফকির আনোয়ার শাহের সংকলন অবলম্বন করেও কেউ নিশ্চয়ই জরিপের কাজটাও করতে চাইতে পারেন। শক্তিনাথ ঝা-কৃত জরিপের জের টেনে কেউ হয়তো সেই মেজাজ খেয়াল করতে চাইবেন, 'নৈরাত্ম্য'-জাতীয় শব্দের নির্মাণরীতির সঙ্গে 'নিরাকার'-এর লালন ফকির-কৃত সংশ্লেষের যে নজির 'নৈরেকার' (ফকির আনোয়ার শাহের সংকলনের ১৮ আর ২০ সংখ্যক গান দ্রঃ, এর সঙ্গে তুলনীয় সাদামাটা 'নিরাকার' ২২ নম্বরে), সেটাকে আর্ষপ্রয়োগ বলে ধরতে হবে। একই ধরনের তার তম্য ২৯-এ, "নিরেতে নিরাঞ্জন [= নিরঞ্জন আছে] আছে"। কথার এদিক ওদিক মোচড় দেওয়ার এই খেলা নজর টানে — "নিলা" (১৮) যদি লীলার রকমফের হয় তাহলে ধ্বনিতত্বটুকু খুবই সহজবোধ্য; ভাষার তারতম্য আর পরিবর্তনের এইসব স্বাক্ষরের জরিপ লোকসংস্কৃতির গবেষণায় বিশেষ জরুরি। তবে ঠিক ওই দৃষ্টিভঙ্গি থেকে কাজ করা যে আমাদের আশু উদ্দেশ্য নয়, একথা গোড়াতেই বলে নেওয়া ভালো। আমাদের প্রশ্ন শব্দচয়নে আরবি-ফারসি আর সংস্কৃতের উনিশ-বিশ নিয়ে।

ফকির আনোয়ার শাহের সংকলনভুক্ত লালনের প্রথম গানে ব্যবহৃত আরবি-ফারসি শব্দের সবগুলো আলাদা করে ইসলামি ভাবনার ধারক নয় — "আপনি লাগাও *কিনারে*", "*জাহের* আছে ত্রিসংসারে", "আবার তারা *খালাস* পাবে" দ্রষ্টব্য। কিন্তু ওই গানেরই বেশ কয়েকটা আরবি-ফারসি শব্দ তো উঠে আসছে ইসলামের সঙ্গে বিশেষ মোকাবিলা থেকেই : "এলাহী আলমীন (গো) আল্লা বাদশা আলানপনা তুমি/ ডুবাইয়ে ভাসাইতে পার", "নুহু নামে এক নবীরে", "নবী না মানে যারা, মোয়াহেদ কাফের তারা/ সেই মোয়াহেদ দায়মাল হবে, বেহিসাব দোজখে যাবে"।

একেবারে গোড়া থেকেই তাই লালনের বয়ানের আরবি-ফারসি উপদানের দিকে তাকানোর প্রকল্পটা নিয়ে সংশয় এসে পড়ছে। আমরা কি তাহলে দুই ধর্মতত্ত্বের দিকে তাকাতে চাইছি, নাকি খালি দুরকম উত্তমর্ণের কাছ থেকে শব্দ নেওয়া না নেওয়া নিয়ে ভাবতে বসেছি? সংশয়টা মুলতুবি রেখে খানিক দূর এগোই। প্রথম গানের 'কিনার, খালাস' তো আমাদের সময়েও চালু আছে, যদিও আমাদের কবিরা 'খালাস' খুব বেশি যে বলেন তা নয়। আর 'জাহের' দেখেই কেউ কেউ হয়তো চিনবেন না, কিন্তু আরবি ভাষায় এ-র সঙ্গে হ্রস্ব ই-র অভেদ মনে রাখলে একই শব্দের বানানান্তর 'জাহির'-এ পৌঁছে যাই, তখন খেয়াল করি যে 'জাহির করা' শব্দবন্ধটা কিন্তু আজকের বাংলাতেও চালু আছে, কথাটা একেবারে অপরিচিত বললে ভুল হবে।

দ্বিতীয় গানে পাচ্ছি "ভবনদীর তুফান দেখে/ ভয়ে প্রাণ কেঁপে ওঠে" — ও, তুফান? হ্যাঁ, 'তুফান' চিনি, এটা তো এখনও বহু প্রচলিত শব্দ, একটু কাব্যিক বলেও ভাবা হয়। যা দিন কাল পড়েছে, অনেক অর্ধসাক্ষর বাঙালি বড় হচ্ছে, তারা ণত্ব ষত্বও জানে না, সংস্কৃতের শিকড়ই বলো, আরবি-ফারসি শিকড়ই বলো, কোনোরকম মূলের সঙ্গেই তারা বাংলা শব্দের কোনো সম্পর্ক নিয়েই কিচ্ছু জানে না। আচ্ছা, এই ইস্যুটা নিয়ে আমরা ভাবছি কেন আদৌ? কমবয়সি অনেক পাঠক তো নিশ্চয়ই জিগ্যেস করলে বলতেই পারবে না কোন শব্দের কি ইতিহাস, তারা খালি ইংরিজি থেকে এসেছে কিনা সেটুকুই বুঝতে চায়। তাহলে?

চেতনাপ্রবাহ অতটা হারিয়ে যেয়ো না, দ্বিতীয় গানের বাকিটা দেখ। একটাও আরবি-ফারসি থেকে উদ্ভূত শব্দ পেলে না? তৃতীয় গানেও তথৈবচ? বলো কী? যাইহোক, চতুর্থ গান তোমাকে হতাশ করল না, 'চিজ' আছে সেখানে, সাধারণ ফারসি শব্দ, কোনো ধর্মীয় অনুষঙ্গ নেই, তোমার প্রকল্পটার আশা আছে। দাঁড়াও, দাঁড়াও। এই চতুর্থ গানের পুরো বয়ানটার দিকে মন দিয়ে তাকাতে হবে তোমাকে : "জানতে হয় আদম ছবির আদ্য কথা/ না দেখে আজাজীল সে/ কিরূপ আদম গঠলেন সেথা।। আনিয়ে জেদ্দার মাটি/ গঠলেন বোরখা পরিপাটি/ মিথ্যা নয় সে কথা খাঁটি/ কোন চিজে তার গঠলেন আত্মা।। সেই যে আদমের ধড়ে/ অনন্ত কুঠরী গড়ে/ মাঝখানে হাতনে কল জুড়ে/ কীর্তিকর্মা বসলেন সেথা।। আদমি হইলে আদম চেনে/ ঠিক নামায় সে দেল কোরানে/ লালন কয় সিরাজ সাঁইর গুণে/ আদম অধর ধরার সুতা।।"

এখানে সরাসরি কোরান শরীফের কাহিনীর সিলসিলায় শামিল হয়ে ফকির তাঁর সাধনার একরকম চালচিত্র তুলে ধরেছেন। তাই চলে এসেছে আরবি-ফারসি শব্দ। সে শব্দ 'চিজ'-এর মতো ঐহিক হলেও তার প্রয়োগের পরিবেশটা ইসলামি।

পক্ষান্তরে যে দ্বিতীয় গানে দুখানা ফারসি শব্দ 'তুফান, কিনারা' ছাড়া আর কিছু পাচ্ছি না, সেইটের বয়ান আমাদের নিয়ে যাচ্ছে গল্পের দ্বিতীয়ার্ধে : "এসো দয়াল, আমায় পার কর ভবের ঘাটে/ ভবনদীর তুফান দেখে/ ভয়ে প্রাণ কেঁদে ওঠে।। পাপ পুণ্য যতই করি/ ভরসা কেবল তোমারি/ তুমি যারে হও কাণ্ডারী/ ভব ভয় তার যায় ছুটে। সাধনার বল যাদের ছিল/ তারাই কূল কিনারা পেল/ আমার দিন অকাজেই গেল/ কি জানি হয় ললাটে।। পুরানে শুনেছি খবর/ পতিতপাবন নামটি তোর (তোমার)/ লালন কয় আজ আমি পামর/ তাইতে দোহাই দেই বটে।" তৃতীয় গানও তথৈবচ।

সংস্কৃত আর সংস্কৃতজ শব্দের ছড়াছড়ি আর আরবি-ফারসি গায়েব হয়ে যাওয়া কোথায় লক্ষণীয়? সেই সেই ভজনে যেখানে সাধনার আবহকে জাগিয়ে তোলার কাজটা করা হচ্ছে হিন্দু ঐতিহ্যের উপকরণ সাজিয়ে।

দূর পাল্লার পরিপ্রেক্ষায় লালন জাতিনিরপেক্ষ কোনো আবহ তৈরির স্বপ্ন দেখতেন একথা তো সবারই জানা, ওই যে "এমন মানব সমাজ কবে গো সৃজন হবে; যেদিন হিন্দু মুসলমান বৌদ্ধ খৃষ্টান/ জাতি গোত্র নাহি রবে" অথবা "ভবে মানুষগুরু নিষ্ঠা যার/ সর্ব সাধন সিদ্ধ হয় তার"-এর নিখিলমানববাদ। কিন্তু আপাতত নিজের স্থানকালের মানুষের সঙ্গে কী ভাষায় কথা বলছিলেন তিনি? কোথাও হিন্দু, কোথাও ইসলামি সাধকদের চেনা উপাদান চলে আসছিল তাঁর আলাপে, আসতে তো বাধ্য, তাই না? সেইসব উপাদান গেঁথে যেসব কাহিনী রচিত হয়েছিল একেকটা আচ্ছাদনের আশ্রয়ে এবং লোকসমাজে প্রচলন পেয়েছিল, হিন্দু ধারায় আর মুসলিম ধারায় প্রবহমান কিন্তু পৃথক সে গল্পগুলোই তো ভক্তের মনঃসংযোগের উপকরণ — গল্প বাদ দিলে লালনের গানের হাঁড়ি চড়বে কী করে? এদিকে একেকটা গল্পে তো একেকরকম আবহ আর তার প্রতিসঙ্গী শব্দচয়নও অনিবার্যভাবে এসে পড়বে।

আমাদের প্রকল্পের দিক থেকে দেখলে এসব কথার পিঠে আরেকটা কথা না বলে পারছি না অবশ্য। কিছু হিন্দু ঐতিহ্যের আর কিছু মুসলিম ঐতিহ্যের উপাদান পাশাপাশি যে যার নিজস্ব লালনসংগীতে স্থির হয়ে বসে আছে — কিছু হিন্দু পরম্পরার ধারাবাহিক গান আর কিছু ইসলামের সিলসিলা ঘেঁষা গান — এই ছবিটা মেনে নিতে অসুবিধে হতেই পারে বয়ানের কোনো কোনো সতর্ক পাঠকের। উপাদান মিশিয়ে নিজস্ব কোনো পাকে রান্না করে লালন নতুন এক খিচুড়ি সাধনমার্গ তৈরি করেছিলেন, এই মতের সপক্ষে কি আঠারো বা উনিশ সংখ্যক গানের এজাহার দাখিল করতে পারি না?

১৮ : "না ছিল আসমানজমিন পবনপানি/ সাঁই তখন নিরাকারে। ইলাহী আলমীন, সাদরাতুল একিন/ কুদরতি গাছ পয়দা করে। গাছের ছিল চার ডাল/ হল হাজার সাল/ এক এক ডাল, কি হাল/ ছিল তার কতই দূরে। সত্তর হাজার সাল ধরে/ গাছের পরে সাধন করে/ বারিতালায় হুকুম হল, নূর ঝরিল/ ঝরিয়া দোনেয় সৃষ্টি করে। একদিন ডিম্ব ভরে,/ ভেসেছিল নৈরাকারে/ লালন বলে হায় কি খেলা, কাদের মওলা/ করেছে নিলা অপার পারে।"

তারই জের টেনে ১৯ : "একাকারে হুহুংকার মেরে/ আপনি সাঁই রব্বানা।

অন্ধকার, ধন্দকার, কুওকার, নৈরেকার/ সব লীনা। কুন বলে এক শব্দ করে/ সেই শব্দে নূর ঝরে/ ছটি গুটি হল তাতে/ শোন গো তার বর্ণনা। সেই ছয় গুটি হতে/ ছয়টি জিনিষ পয়দা তাতে/ আসমানজমিন সৃজনিতে/ মনে তার হয় বাসনা। ছয়েতে তসবী হল/ সেই তসবী জপ করিল/ কোরানেতে প্রমাণ রল/ লালন কয় শোন ঠিকানা।''

এখানে সাধনার দুই সিলসিলার মধ্যে মোকাবিলার মালমশলা খুঁজতে ইচ্ছে করতে পারে ১৮ আর ১৯-এ বিবৃত আখ্যানের সূত্রে। সৃষ্টির এই ভাষ্যে কি আমরা হিন্দু আর ইসলামি ঐতিহ্য থেকে আকলন করা উপাদানের বিশেষ কোনো সমাকলনের ধর্মতাত্ত্বিক হিসেবের কয়েক আঁচড় পেয়ে যাচ্ছি যা আমাদের ভাষাভাবনার পাশ দিয়ে কাজ করতে পারে?

ওই অন্বেষণে বাদ সাধেন অবশ্য লালন নিজেই। দুরকম পন্থা মিশিয়ে সাধনা করতে গেলে সমস্ত পণ্ড হবে বলে মনে যে করেন সেই আভাসই রয়েছে ৩৭ সংখ্যক গানের তৃতীয় স্তবকে : ''ভুল না মন কারো ভোলে/ রাছুলের দিন সত্য মান/ ডাক সদায় আল্লা বলে। খোদা প্রাপ্ত মূল সাধনা/ রাছুল বিনে আর কেউ জানে না/ জাহের বাতুন উপাসনা/ রাছুল দ্বারা প্রকাশিলে।। দেখাদেখি সাধিলে যোগ/ বিপদ ঘটবে বাড়িবে রোগ/ যেজন হয় শুদ্ধ সাধক/ নবীর ফরমানে সে চলে।।''

এই ইঙ্গিতের প্রামাণিকতা কাটবার নানারকম পাণ্ডিত্যবিদ্ধ উপায় নিশ্চয়ই আছে; এ গানটার দলিলি ভিত্তি হয়তো সংশয়কণ্টকিত; ৩৪-এর শেষে যে শুনছি ''খলিফা আউলিয়া রইলে/ যে যা বোঝে দিও বলে/ লালন বলে রাছুলের যে/ নছিহত জারি'' সেই জায়গাটাতে হয়তো 'যে যা বোঝে' কথাটা বয়ানপাঠের পদ্ধতি বিষয়ক নির্দেশ হিসেবেই গ্রহণীয়; কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন পন্থার বিশিষ্টতা রক্ষা যে জরুরি এই ইঙ্গিতটা লালনের সামগ্রিক বয়ানের নানা জায়গায় প্রতিধ্বনিত হতে থাকে।

যেমন ৪৬-এ দেখছি বাউলদের ট্রেডমার্ক 'সহজ মানুষ'-এর ভজনায় প্রযোজ্য উপাসনারীতিকেও কোনো পন্থানিরপেক্ষ চেহারা দেওয়ার চেষ্টা নেই; কোরানের ঐতিহ্যের জের টেনে 'নামাজ' বলা হচ্ছে; ''সহজ মানুষ ভজে দেখনা রে মন দিব্যজ্ঞানে/ পাবিরে অমূল্য নিধি বর্তমানে।। ভজ মানুষের চরণ দুটি/ নিত্য বস্তু পাবি খাঁটি/ মরিলে সকল মাটি/ এই ভেদ ত্বরায় নেও জেনে।। মলে পাবে বেহেস্তখানা/ তা শুনে ত মন মানেনা/ বাকির লোভে নগদ পাওনা/

কে ছাড়ে এই ভুবনে। আচ্ছালাতুল মেরাজুল মোমেনীনা/ জানো সেই নামাজের বেনা/ বিশ্বাসীদের দেখাশুনা/ লালন কয় এই জীবনে।''

এই দৃগভঙ্গীর সঙ্গে সংগতিপূর্ণ ভাষ্য পেয়ে যাচ্ছি ৪৯ সংখ্যক গানেও : ''কি কালাম পাঠালেন আমার সাঁই দয়াময়/ এক এক দেশের এক এক ভাষা/ কয় খোদা পাঠায়।। এক যুগে পাঠায় কালাম/ অন্য যুগে হয় কেন হারাম/ এমনি দেখি ভিন্ন তামাম/ ভিন্ন দেখা যায়। যদি একই খোদার হয় রচনা/ তাতে তো ভিন্ন থাকে না/ মানুষের সকল রচনা/ তাইতে ভিন্ন হয়। এক এক দেশের এক এক বাণী/ পাঠান কি সাঁই গুণমনি/ মানুষের রচিত জানি/ লালন ফকির কয়।।''

তবে কি ৩৩ সংখ্যক গানে 'দয়াল, বন্ধু, সত্য, লক্ষ্য'-র মতো সংস্কৃত শব্দের ছড়াছড়ির মধ্যে 'রাছুল' আর 'খোদা'-র উল্লেখ দেখে ভাবব, এই যে, আসল ঐতিহ্যসংশ্লেষের নমুনা পাওয়া যাবে এখানে? তা কিন্তু নয়, গোটা বয়ানটা পড়ে দেখলেই বুঝবেন : ''তোমার মতো দয়াল বন্ধু আর পাব না/ দেখা দিয়ে ওহে রাছুল/ ছেড়ে যেয়ো না।। তুমি তো খোদার দোস্ত/ অপারের কান্ডারী সত্য/ তোমা বিনে পারের লক্ষ্য/ আর দেখা যায় না।। আছমানী এক আইন দিয়ে/ আমাদের সব আনলেন রাহে/ এখন মোদের ফাঁকি দিয়ে/ ছেড়ে যেয়ো না। আমরা সব মদিনাবাসী/ ছিলাম যেমন বনবাসী/ তোমা হতে জ্ঞান পেয়েছি/ আছি সান্ত্বনা।। তুমি বিনে এরূপ শাসন/ কে করবে আর দীনের কারণ/ লালন বলে আর তো এমন/ বাতি জ্বলবে না।'' ইসলামি ঐতিহ্যেই বিধৃত এই গান, দু-চারটে নিরপেক্ষ সংস্কৃত শব্দের প্রয়োগ আছে কেবল, 'দয়াল'-এর কোনো গূঢ় ধর্মতাত্ত্বিক আধেয় নেই বলে এখানে 'দয়াল' শব্দটার আমদানি সম্ভব, পরিবেশ অনুযায়ী শব্দ প্রয়োগের রীতি থেকে সরে না গিয়ে।

নির্বিচারে, পরিবেশ না দেখে, শব্দের মানে করতে গেলে বেশ বড় বিপত্তি হতে পারে; সেই ধরনের একটা ঝুঁকির জায়গা চোখে পড়ে ৩০ সংখ্যক গানটাতে। গানের আরম্ভে মৌল উপাদানের উল্লেখ — ''নীরে শুনি নিরঞ্জন হল/ নূর ছিল কি পাঁজা পাঁজা/ এরা কোন নূরে এল।। কোন নূরে হয় আসমান জমি/ কোন নূরে হয় পবন পানি/ কোন নূরে ভাসিলেন গনি/ সে নূরে কোন নূর আসিল।।'' এই প্রস্তাবনার পর পাঠকের হয়তো ভাবতে ইচ্ছে করবে গানটাতে 'হাওয়া'-র উল্লেখ থাকলে সেই শব্দটা নিশ্চয়ই 'পবন'-এর সমার্থক শব্দ। ভাগ্যিস তখনই ভুল ভেঙে যায়। নইলে কী কাণ্ডটাই হত। বয়ানের ওই অংশে

দেখতে পাই "আদম বল কোন নূরে হয়/ মা হাওয়া কি সে নূরে নাই/ কয় রতি নূর ঝরে কোথায়/ ইহার ভেদ খুলে বল।।" এখানে 'হাওয়া'-র অর্থ বুঝতে 'মা' কথাটা আমাদের বিশেষ সাহায্য করে।

এমনিতে তো বাংলায় 'হাওয়া' দেখলেই আমরা ধরে নিই বায়ু বা পবন অর্থটাই অভিপ্রেত। কিন্তু পবনকে তো কোনো ঐতিহ্যেই মা বলা যায় না। আমাদের আশু আলোচ্য যে বয়ান সেখানে সেমিটিক ঐতিহ্যের আদি পুরুষ আদম আর আদি নারী 'ইভ'-এর কথা হচ্ছে। ইংরিজি থেকে আমরা এই আদিজননীর নামের যে চেহারা ধার নিয়েছি, 'ইভ', তার সঙ্গে আরবি নামের মিল এত কম যে লালনের বয়ানে 'হাওয়া' দেখে সহজে 'ইভ' বলে চিনতে পারি না। 'অ্যাডাম'-এর সঙ্গে 'আদম'-এর সাদৃশ্য তার চেয়ে অনেক দ্রুত ধরতে পারি। আদমের আদলে গড়া পুরুষরা যেমন 'আদমি', 'ইভ' ওরফে 'হাওয়া'-র ধাঁচে সৃষ্ট মহিলারা যে তেমনি 'অওরত', এই সূত্রটা কেউ ধরিয়ে না দিলে আজকের দিনের কোনো অমুসলিম বাঙালি পাঠকের পক্ষে খেয়াল করে কথাটা নিজে নিজে অনুধাবন করা শক্ত হতে পারে।

পবন-বাচক 'হাওয়া' বিশেষ্য এখনকার সব বাঙালির কানেই নিরপেক্ষ শব্দ। কিন্তু ইভ-বাচক এই 'হাওয়া' ব্যক্তিনামটা শুধু যে বিশেষ ঐতিহ্যে বিধৃত তাই নয়, আমাদের স্থানে-কালে অনেককেই আলাদা চেষ্টা করে শিখে নিতে হবে লালনের বয়ান ঠিকমতো পড়তে পারার জন্যে।

কোন গানে কী ঐতিহ্যের আবাহন রয়েছে তাই দেখে পরিবেশের সঙ্গে শব্দচয়নের সম্পর্ক খুঁজলে লালনের শব্দ বাছাইয়ের অনেকগুলো উদাহরণ অনুধাবন করতে সুবিধে হয়, এর মানে নিশ্চয়ই এ নয় যে একেবারে কোথাওই দুই ঐতিহ্যের ধর্মতত্ত্বের কোনো মোকাবিলার দৃষ্টান্ত নেই। গায়ের জোরে ওরকম কথা কেউ যদি ঘোষণা করতে চান, তাহলে স্পষ্টতই তাঁর বক্তব্যটা ৫৩ সংখ্যক গানে পৌঁছে ফুটো হয়ে যাবে : "ও মন বল রে সদায় লাইলাহা ইল্লাল্লা/ আইন ভেজিলেন রাছুল উল্লা।। নামের সহিত রূপ/ ধিয়ানে রাখিয়া জপ/ বেনিশানায় যদি ডাক/ চিনবি কিরূপ কে আল্লা।। লা-শরীক জানিয়া তাকে/ পড় কালাম দেলে মুখে/ মুক্তি পাবি থাকবি সুখে/ দেখবি রে নুর তাজেল্লা।। লাইলাহা নফি সে হয়/ ইল্লাল্লা সেই দীন দয়াময়/ নফ এজবাত যাহারে কয়/ সেহি তো এবাদত উল্লা।। বলেছে সাঁই আল্লা নুরী/ এই জেকেরের দরজা ভারি/ সিরাজ সাঁই তাই কয় পুকারি/ শোন রে লালন বেলিল্লা।।"

সাধনার পদ্ধতিতে নির্মীয়মাণ মরমিয়া ঐক্যের কথা নিশ্চয়ই আছে এখানে, আমাদের মতো অদীক্ষিত পাঠকের কাছেও সেটুকু পরিষ্কার। কিন্তু আমরা এও দেখতে পাচ্ছি, বেনিশানায় ডাকাডাকি করতে বারণ করছেন কবি, বলেছেন নাম ধরে জপতে। নাম জপের এই ধরনটা হিন্দু এবং মুসলিমদের ঐতিহ্যে পাশাপাশি চর্চিত হতে হতে একটা অভিন্ন জায়গায় পৌঁছেছিল। সেখানে আমরা দুই ঐতিহ্যের অবিবাদের সূত্র পাচ্ছি বইকি। কিন্তু জপের লজিকটাও তো মাথায় রাখতে হবে; বন্ধুত্ব আর ঐক্য এক জিনিস নয়। নামের জপ করতে গেলে সেই নামকে ঘিরে যেসব গল্প সেগুলোর অনুষঙ্গ চলে আসে। হিন্দুদের আর মুসলিমদের প্রিয় ধর্মীয় কাহিনীর সিলসিলা তো আলাদা ছিল। আজও আছে। নাম জপতে বসবার সময় কোন নাম বেছে নেওয়া হল তার ওপর নির্ভর করবে মন দিয়ে সে-নাম জপ করতে করতে সাধকের মনে প্রধানত সংস্কৃত শব্দ আসবে, না, প্রধানত আরবি-ফারসি শব্দ। মানে, জপের মনোযোগের লজিকটাও একদিকে যেমন ঐক্যের সূত্র গেঁথে দেয়, তেমনি শব্দগুলোর পরিবেশঘটিত বিশিষ্টতাকেও আলাদা রাখার বন্দোবস্ত করে দেয়।

তাহলে ৫৩-র বয়ান ধরে যদি আমরা বিশেষ করে জানতে চাই, "এই জেকেরের দারজা ভারি"-র চাবি-শব্দগুলো হিন্দুদের বাংলায় কী করে হারিয়ে গেল, কই হিন্দিতে তো এখনও হিন্দু-মুসলিম নির্বিশেষে ভাবনা বা চর্চা অর্থে 'জিক্র' ব্যবহৃত হয়, পর্যায় বা কোঠা বা বিদ্যার্থী বয়সমাফিক যে শ্রেণীতে পড়ে সেই শ্রেণী বোঝাতে 'দর্জা' ব্যবহার হয় — তখন আমাদের অনুসন্ধান এগিয়ে নিয়ে যাবার জন্যে ভাষার ওপর অতটা জোর না দিয়ে সাধকদের মুখে মুখে যে গল্পের প্রবাহ সেইটার দিকে বেশি মনোযোগ সহকারে তাকানো দরকার। ৫৩-র বয়ানেই দেখুন না, "লা-শরীক জানিয়া তাকে/ পড় কালাম দেলে মুখে" এই অংশে 'মন' বা 'হৃদয়' না বলে লালন যে 'দেল' বলেছেন, এখানে 'কালাম' আর 'লা-শরীক'-এর মতো কথার সাহচর্যের একটা ভূমিকা তো দেখাই যাচ্ছে।

এই চাপানের ওতোর দিতে যাঁর ইচ্ছে করবে তিনি স্বভাবতই বলবেন, ভাষার শিক্ষিত প্রয়োগের স্তরেও আজকের হিন্দিভাষীরা যে হৃদয় না বলে 'দিল' বলে, মস্তিষ্ক না বলে 'দিমাগ' বলে, এই প্রচলনের অনুরূপ দুই ভাণ্ডার মেলানো শব্দৈশ্বর্য আজকের বাংলা ভাষার কপালে কেন জুটল না? ওই বিশেষ দৈন্যের গল্পটা তো ধরতে পারা দরকার।

প্রশ্নটার গুরুত্ব অনস্বীকার্য। কিন্তু ধর্মীয় সাহিত্যের মরমিয়া ধারার আলোচনা

হয়তো এ ধরনের প্রশ্ন উত্থাপনের সবচেয়ে উপযুক্ত জায়গা নয়। একটু সরে গিয়ে প্রশ্নটার পিছনে খানিকটা বাক্যব্যয় করে আসা দরকার — তারপর ফিরতে পারব লালনের কথায়।

উত্তর ভারতের গল্পটা যে আলাদা তার একটা কারণ, হিন্দি-উর্দু ভাষার বৃত্তে হিন্দু উচ্চবর্গ বা এলিটের সঙ্গে মুসলিম উচ্চবর্গের সামাজিক যোগাযোগ আধুনিক ইতিহাসের কোনো পর্বেই পুরো ছিঁড়ে যায়নি। সেই ফারসি-ভাষা-সংস্পৃষ্ট উচ্চকোটির আবহের বেশ বড় ভূমিকা ছিল বাংলা মুল্লুকের আশরফ মুসলিমদের সংস্কৃতিতেও। তাই শেষ পর্যন্ত মুসলিম বাঙালি উচ্চবর্গের আত্মপ্রতিষ্ঠা যখন ঘটল তখন কিছু কিছু আরবি-ফারসি শব্দের মুদ্রায় উত্তর ভারতের সঙ্গে ধারাবাহিক আত্মীয়তার দস্তখত দেখানোর দরকার বোধ করলেন তাঁরা।

পক্ষান্তরে, হিন্দু বাঙালি উচ্চবর্গের বুদ্ধিজীবীরা নব্যন্যায় ইত্যাদির ইতিহাসের দৌলতে একটা আঞ্চলিক প্রতিপত্তি পেয়েছিলেন বলে তাঁরা সেভাবে উত্তর ভারতের মুখাপেক্ষী আগেও ছিলেন না। বাংলা মুল্লুকে যখন উনিশ শতকে ইংরিজি রাজভাষা হিসেবে ফারসির স্থলাভিষিক্ত হল তার আগে পর্যন্ত শিক্ষিত হিন্দুরাও প্রশাসনিক জগতের সঙ্গে মানিয়ে চলবার খাতিরে ফারসি শিখতেন ঠিকই, কিন্তু নিজেদের বিদ্যাচর্চার সে দিকটাকে পাত্তা দিতেন কম। ইংরিজি যখন চালু হচ্ছে সেই সময়টাই আবার সংস্কৃত-ভিত্তিক নবজাগরণের জোয়ারের সময়।

সংস্কৃতের প্লাবন তখন বাংলা ভাষাকে কেন ভাসিয়ে দিচ্ছিল তার বিভিন্ন কারণের উনিশ-বিশ আলাদা করা বেশ কঠিন কাজ; কাজটাতে আমরা হাত দিই নি আজও। এক তো পরাজিত দেশের সমাজে নিজেদের ন্যূনতম প্রতিপত্তি রক্ষা করার জন্যে হৃত গৌরব পুনরুদ্ধারের কর্মসূচির চাপ। তাছাড়া ইংরিজি পাঠ্যবইয়ের পরিভাষা-সযত্ন অনুবাদের সূত্রে সংস্কৃত শব্দের বিকল্পও ছিল না। আরও ব্যাপার স্যাপার ছিল। বি.বি.কে (ব্রাহ্মণ বৈদ্য কায়স্থ) কোয়ালিশনের সঙ্গে ইংরেজদের ঐহিক রফা-বন্দোবস্তে তখন অনেক সুফল ফলছিল বলে বি.বি.কে.-দের কৌল স্মৃতি আজও সাক্ষ্য দেয়। ওই কোয়ালিশন নিজের 'ভদ্র' সমাজের ভাষাগত ট্রেডমার্ক হিসেবে সংস্কৃত শব্দ চয়নকে তুলে ধরেছিল দু কূল রাখবার জন্যে। তাদের তো দু মুখে দুটো কথা বলতে পারা দরকার ছিল। একদিকে তারা বলছিল, "দায়ে পড়ে ইংরাজভক্ত সেজে থাকতে বাধ্য হলেও আসলে আমরা আলাদা, আমাদের নিজস্ব পরম্পরার প্রতি শ্রদ্ধাশীল।" আবার এও না বলে পারছিল না, "আধুনিকতার যে মালিকদের সঙ্গে আমাদের লড়াই

তাদের সামনে দাঁড়াতে পারার জন্যে আধুনিক চিন্তার জটিলতা আয়ত্ত করার উপায় হিসেবে আমরা গৌরবময় ভারত-মণীষার সঙ্গে সেই চিন্তার মিল আর তফাত অনুধাবন করতে করতে এগোব বলে বিশেষ করে সংস্কৃতের বাণ রেখে দিয়েছি আমাদের তূণে"।

তাহলে দাঁড়াচ্ছে, আধুনিক লড়াই লড়বার উপযোগী জ্ঞানমঞ্চ বা এপিস্তেমে সাজিয়ে নেবার জরুরত সংস্কৃতের সঙ্গেই ইংরিজির গাঁটছড়া বাঁধার দিকে ঠেলা দিয়েছিল উনিশ শতকের গোড়ার দিকে ভাষার বিবেচনায় 'শিষ্ট' আর আচার-বিচারের নিরিখে 'ভদ্র' বাংলার নৌকাকে। 'ভদ্র' যে বি.বি.কে. কোয়ালিশনের সিগনিফায়ার একথা বিবিধ গবেষকের কাছে আপনারা নিশ্চয়ই শুনেছেন; কথা যে বাড়াচ্ছি না তার জন্যে তাই ক্ষমা চেয়ে কাউকে বিড়ম্বনায় ফেলতে চাই না; আপনি বাউল-ভাবাপন্ন পাঠক, হয়তো ঠাউরে বসবেন আমি আপনাকেও ওই 'ভদ্র' রঙে রাঙা ভাবছি, সেক্ষেত্রে আপনি গোটাবেন আস্তিন, আমি দেব চম্পট, কিংবা পড়ে পড়ে মার খেতে খেতে ছেঁড়া ডিকশনারি ঘেঁটে দেখে নেবার চেষ্টা করব 'আস্তিন' আর 'চম্পট' শব্দের বংশপরিচয়। ওটা অন্য বহরের কথা। আমি আপাতত চিন্তিত 'ভদ্র'-র পর্যায়ভুক্ত সমার্থক শব্দ 'শিষ্ট' নিয়ে, যে 'শিষ্ট'-দের ভাষাপ্রয়োগকে বেদাগ বা ডিফল্ট বলে ভাবতে ভাষাবিজ্ঞানীরা শিখেছিলেন খোদ পতঞ্জলি মুনির কাছে।

পাণিনির সেই মহাভাষ্যকারেরই চিন্তাধারা থেকে উদ্ভূত ভর্তৃহরির বাক্যপদীয় গ্রন্থের অনুপ্রেরণায় নির্মিত এক আধুনিক সঞ্জননী অঙ্ক কষা ভাষ্য 'কায়াবাদ'; সেই ভাষ্যই যে বর্তমান রচনার নেপথ্যে সক্রিয়, একথা দীক্ষিত পাঠক নিজগুণেই বুঝতে পারবেন; কথাটা অদীক্ষিতদের ডেকে ডেকে বলে দিচ্ছি, যাতে অনুধাবনের ভুল না হয়। 'ভদ্র' সমাজের ক্রমবিকাশ আর ভাগ্য-দুর্ভাগ্য নিয়ে ভাববার দায়িত্ব অম্লান বদনে ঐতিহাসিকদের আর অন্যান্য সামাজিক বিজ্ঞানীদের উপর ছেড়ে দিচ্ছি; ছেড়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত হতে কোনো বাধা যে নেই তার প্রমাণ তো চোখের সামনেই। 'ম্যানারস মেক দ্য মিডল ক্লাস : হাউ ইউ ইনটার‍্যাক্ট উইথ পিপল্ অ্যারাউন্ড আস রিভীলস এ লট অ্যাবাউট আওয়ার সোসিও-ইকনমিক প্রগ্রেস' নিবন্ধে দীপংকর গুপ্ত (দ্য টাইমস অফ ইন্ডিয়া, ১১.১০.২০১০, পৃ. ১৬) ভাবনার আর কর্মসূচীর যেসব দিকে কথা উসকে দিচ্ছেন তার সমস্তটাই খাস সমাজতত্ত্বের উপজীব্য। ভারতের আধুনিকমন্য মধ্যবিত্তদের কায়ে মনে বাক্যে দীপংকর গুপ্ত যে 'ভদ্র'তার অভাব নিয়ে ভাবিত তার সঙ্গে আমার অন্বিষ্টের, মানে 'শিষ্ট'-দের ভাষার জায়গাটার, সম্পর্ক

নিশ্চয়ই আছে, চূড়ান্ত বিচারে। কিন্তু আপাতত অচূড়ান্ত আলোচনা যাতে অহেতুক গুলিয়ে না যায় সেজন্যে এখানে 'শিষ্ট' ভাষাপ্রয়োগের দিকেই নজর দিচ্ছি। কায়াবাদী নজরে 'শিষ্ট' বাচনভঙ্গিকে কীরকম দেখায়?

শিষ্ট বাচনরীতির প্রধান বৈশিষ্ট্য বেদাগের বা ডিফল্টের আরাধনা। তার মানে, ভাষার কোনো কোনো জায়গাকে 'এটা নিছক দস্তুর নয়, এটাই কথার সবচেয়ে সরল চেহারা' বলে, বেদাগ বলে, দাঁড় করানো হয়। 'নৌকো' বা 'রাস্তা'-র মতো কিছু কিছু কথাকে সাদামাটা আর 'তরী' কিংবা 'সড়ক'-এর মতো বিকল্পকে নানা রঙে রঙীন 'রীতি'-রুচির বিশেষ প্রকাশ বলে ভাববার একটা ব্যবস্থা হয়ে যায় এভাবে। বেদাগ রুচিটা তাই রুচি বলে মনেই হয় না, সেটাই যেন স্বাভাবিক। এই কম স্বাভাবিক আর বেশি স্বাভাবিকের খেলা নিয়ে প্রশ্ন তোলে কায়াবাদী ভাষাতত্ত্ব — এর চেয়ে বেশি বিদ্যার বোঝা আজকের আলোচনার উপর চাপানোর অবকাশ নেই।

বাংলা ভাষার উপর সংস্কৃতভিত্তিক শব্দসম্ভার যে আধিপত্য বিস্তার করেছিল, সেই প্রক্রিয়াটার একটা দিক ছিল সংস্কৃতজ শব্দের 'বেদাগ' হয়ে যাওয়া। আরেকটা অক্ষ ছিল ইংরিজির বিভিন্ন টেকনিকাল টার্মের প্রতিশব্দ হিসেবে সংস্কৃত পারিভাষিকের উপস্থিতির প্রেক্ষাপট। আমরা আধুনিকতার সঙ্গে প্রাচীন ভারতের সংস্কৃতবিদ্ধ বিদ্যার ইতিহাসের একটা চুক্তির উপর বেঁচে আছি; ইংরেজ আমলের কোন পর্বে, স্বাধীনতা সংগ্রামের কোনো পর্বে এই চুক্তির কোনো বিকল্প গড়ে ওঠেনি। শিষ্ট বাংলার শব্দকোষের বেদাগ জায়গাগুলোতে সংস্কৃতের প্রতিপত্তির গল্পটা পালটাতে চাইলে ওই চুক্তিটার রদবদল লাগবে। কারণ ছাড়া কার্য হয় না; ওরকম বহরের রদবদল চাইলে তার পক্ষে জোরালো যুক্তির দরকার হবে, যে যুক্তি খালি কথায় নয়, কাজের অক্ষেও চাপ দিতে পারে।

এইখানে লালন আমাদের সঙ্গে কথা বলে ওঠেন — আমরা যারা হয়তো বাউল সংস্কৃতি নিয়ে বিশেষ কোনো চিন্তার চিন্তিত নই, যারা হয়তো বিষয়টা নিয়ে অর্ধসাক্ষর বা নিরক্ষর, সেই আমাদেরও তিনি সম্বোধন করেন যুক্তিবিন্যাসের এই লহমায়। লালন যে বলে গেছেন মানুষের দ্ব্যর্থহীন ভজনার একাধিক মার্গ আছে ঠিকই কিন্তু সেগুলো তুল্যমূল্য, ভজনায় খাঁটি থাকতে পারছ কিনা সেটাই আসল, তাঁর সেই বার্তা খালি ধর্মের বেলাতেই খাটে এমন কথা বলার তো কোনো মানে হয় না। যেমন ধরো তোমরা এই যে আধুনিক সুসমাচারের পেছনে বিশেষ করে বিজ্ঞানের একরকম কর্তৃত্ব আপনমনে, আগুপিছু না ভেবেই, মেনে নিয়েছ, সেই সূত্রেই তো বাংলার ঘাড়ে চেপে

বসেছে ইংরিজিতে-সংস্কৃতে মেশানো কর্তার ভূত। ওই মার্গটাকেও বৈকল্পিক বলে ভাবতে শেখো, সেটাও একরকম মুক্তি। সে-মুক্তির স্বাদ একবার যদি পাও তাহলে সেই নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গের পর তোমার আটপৌরে কথাবার্তার সুখদুঃখের ভাবনাচিন্তার জবানটাকে কোনো বৈজ্ঞানিক অসলিয়তের বহিরঙ্গ খোলসমাত্র বলে তুচ্ছতাচ্ছিল্য করবে না আর। তখন আর তুমি সাক্ষরতা প্রকল্প চালিয়ে জনসাধারণকে দানখয়রাত পূর্বক বদান্যতা দেখাচ্ছ বলে ভাবতেও পারবে না। তার বদলে দেখতে পারে যে সকলের সাক্ষরতার ঢালাও বন্দোবস্ত করার ইউনেস্কো-বিদ্ধ জায়গাটা একটা দরকষাকষির প্রাঙ্গণ। সেই প্রাঙ্গণে যদি নিছক লোকদেখানো কুচকাওয়াজের বদলে সত্যিই ঠিকমতো কাজ চলতে থাকে তাহলে সেখানে দাঁড়িয়ে চটজলদি সাক্ষরতায় যে প্রাপ্তবয়স্করা প্রবেশ করছে তাদের কাছে (এবং যে বাচ্চারা প্রবেশ করছে তারা যে অভিভাবকবর্গের বৃত্তে মাইক্রোএথনিক পরিচিতির বন্ধনে বাঁধা সেই গোষ্ঠীর জ্ঞানমঞ্চ আর আখ্যানমঞ্চের কাছে) কিছু শিখতে চাইবার কথা দায়িত্বসচেতন শিক্ষাদাতাদের — নিদেন পক্ষে পাঠক্রমের স্থপতিদের। এই কর্তব্যটা খালি 'অপমানে হতে হবে তাহাদের সবার সমান'-এর মতো ক্ষমতার পুনর্বন্টনের প্রশ্ন নয়; সাক্ষরতা-লেনেওয়ালাদের আটপৌরে ভাষা আর দাতাকর্ণদের আটপৌরে ভাষার মধ্যে বোঝাপড়া নিতান্তই লেখাপড়ার এলাকাতেও জরুরি। জরুরি হয়ে যে ওঠে তার কারণ, বিজ্ঞানকে একমাত্র অসলিয়তের সিংহাসন থেকে নামানোর পর তোমার লেখাপড়া-জানা অহংকারের অন্বীক্ষাপুষ্ট ভিত্তি ধুলোয় মিশে যায়। যদি বা তোমার ইহবাদী প্রতিজ্ঞার বিশ্বে তুমি কোনো ঈশ্বরের কাছে 'মাথা নত করে দাও'-টাও বলার দিকে ঝুঁকতে রাজি না হতে পারো, তাহলেও হয়তো দেখতে পারে যে সাধারণের কাছে, বিশেষজ্ঞ বুদ্ধির বিভিন্ন মার্গের ছড়াছড়ি আর শুচিবায়ু-বিদ্ধ মিছে অহংকারের চেয়ে মানুষের যে অভিন্নতা অনেক বেশি খাঁটি আর দামি সেই সামান্যের কাছে, এই অহংকারমুক্তির প্রার্থনা করা তোমার কর্তব্য। (রমেশ, তুমি 'সামান্য'-শব্দের ধ্রুপদী সংজ্ঞার্থ শিখিয়াছ? নাকি খালি ধ্রুপদী-র সাবেক দীর্ঘ ঈ হইতে ইদানীন্তন হ্রস্ব ই-তে অভিযাত্রা করিয়াই জীবন অতিবাহিত করিলে?)

আগেই বলেছি, এই যুক্তি তখনই খাটবে যখন তার জোর খাটাবার মতো এলেম থাকবে, কথায় চিঁড়ে ভেজে না, কার্যক্ষেত্রে পেরে ওঠারও একটা ব্যাপার আছে। সংস্কৃতের ছদ্মবেশে ইংরিজি পরিভাষার আধিপত্যের শক্তি যে বিজ্ঞানের ওই কর্তার ভূতের দৌলতেই এত জোরালো একথা জেনেও কোনো লাভ হয় না

যদি আমরা ঘাড় থেকে ওই ভূতটাকে নামানোর কোনো জুতসই মন্ত্র পড়তে না শিখি। আচ্ছা বিজ্ঞানমার্গ ছাড়া, সিরিয়াসলি, অন্য কোনো পন্থা রয়েছে কি? এই লেখক কি সত্যের বিকল্প খুঁজছে, অতএব ছিটগ্রস্ত, অতএব আশু পরিত্যাজ্য?

যাঁরা পড়শোনা-প্রেমী, যাঁরা মনে করেন একটা লোকের কথা ধৈর্যের সঙ্গে শুনে নিয়ে তারপর ঠিক করা উচিত পাত্তা দেব কি দেব না, তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ আমার শীঘ্র প্রকাশিতব্য 'ছিন্ন কথায় সাজায়ে তরণী' (গাঙচিল, ২০১১) গ্রন্থভুক্ত 'জ্ঞানতন্ত্রে আখ্যানমঞ্চ' প্রবন্ধটা পড়ে নিতে চাইবেন। সেখানে আখ্যানের সঙ্গে বিশ্লেষণভিত্তিক জ্ঞানের সম্পর্ক নিয়ে দু-চার কথা বলেছি যা বর্তমান যুক্তিবিন্যাসের সঙ্গে জুড়ে খতিয়ে দেখা জরুরি। গদ্য, সমীকরণ, চিত্রাদি উপকরণের সাহায্যে যেভাবে বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ পেশ করা হয়, তার কেন্দ্রে রয়েছে আখ্যানক্রিয়া; সে-প্রক্রিয়ার সঙ্গে সাংবাদিকতার প্রাত্যহিক সাধারণ্যের সংযোগের দিকে মন দেওয়া বিজ্ঞানপথের পন্থীদের ততটাই কর্তব্য যতটা সাহিত্যমনস্ক মানুষের কর্তব্য বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণের বক্তব্য সম্যক প্রণিধান করা। এইসব দায়িত্বের পারস্পরিকতার দিকে এক পলক তাকালেই পাঠক দেখতে পাবেন যে বিজ্ঞানকে একমাত্র মার্গ ভাবলে বৈজ্ঞানিক ভাবের ঘরেও চুরি করার ঝোঁক এসে যায়।

বিজ্ঞানকে ত্যাগ করতে বর্তমান লেখক কিংবা তার সহকর্মীরা কেউই বলছে না। কথাটা হচ্ছে, বিজ্ঞানই সত্যসন্ধানের একমাত্র জরুরি উপায় বলে যে ভিত্তিহীন অভ্যাস-পুষ্ট বা আবেগ-পুষ্ট দাবি অনেকে আজও করেন — করতে গিয়ে বৈজ্ঞানিক বয়ানের গতিবিধি নিয়ে বিশ্লেষকদের দ্বিতীয় পর্যায়ের গবেষণা যে খুবই কম বিকাশপ্রাপ্ত হয়েছে এই ঘাটতির দিকে দৃষ্টিপাত নিজেও করেন না, অন্যেরা করলেও চোখ রাঙান — সেই অযৌক্তিক দাবিটাকে সিংহাসনে বসিয়ে রাখতে আমরা সম্মত থাকব কিনা।

কথাটা চুপি চুপি কখন এসে রবীন্দ্রনাথে পৌঁছেছে, একেবারে তাঁর সঙ্গে আইনষ্টাইনের বিখ্যাত কথোপকথনের দোরগোড়ায়, টেরই পাইনি, এমন জায়গা ধরে টান দিয়েছে যে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে গান্ধীর দুয়েকটা বিতর্কের কথাও অনিবার্যভাবে মনে পড়ে যায়। লেখার গোড়ার দিকে একবার বলেছিলাম বটে, লালনের কাছ থেকে রবীন্দ্রনাথ কী নিয়েছেন বা নেননি সেই কণ্টকিত প্রশ্নটারও বুড়ি ছুঁয়ে আসতে চেষ্টা করব। কিন্তু পাঠক হয়তো দেখতে পাচ্ছেন আলাদা করে গীতাধ্য পর্বের রচনাবলীর উপর বেশি জোর না দিয়ে বরঞ্চ রবীন্দ্রনাথেব

কাছেই গিয়ে দাঁড়ানো জরুরি হয়ে উঠেছে আমাদের যুক্তিবিন্যাস যে মোড় নিয়েছে সেটা হজম করে নিয়ে এগোতে পারার জন্যে।

বিজ্ঞানের পরিভাষা নিয়ে রবীন্দ্রনাথ মোটের উপর ঝোঁকটা যে সাধারণ মানুষের মুখের কথার ক্ষমতায়নের দিকে, সেটা অনেক পাঠকেরই চোখে পড়ে থাকবে। পজিটিভ আর নেগেটিভকে বলতেন হ্যাঁ-ধর্মী আর না-ধর্মী। ওঁর পছন্দে গলা মেলাতে চাওয়া মানেই কি ধনাত্মক আর ঋণাত্মকের মতো শব্দকে উড়িয়ে দেওয়া? অত ব্যস্ত হবার কারণ দেখতে পাচ্ছি না। শিক্ষার্থীর দরকার আর পেশাদার কর্মীদের দরকার একরকম না হতেই পারে; দুরকম শব্দেরই হয়তো দরকার আছে, বিজ্ঞানচর্চার বিভিন্ন মহলে; শিক্ষানবিশিও যে চর্চার অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ একথার উপর রিচার্ড ফাইনম্যান স্মরণীয় রকমের জোর দিয়ে গেছেন।

সাধক মানুষের সাধনার প্রয়োজনের সঙ্গে কেজো গৃহীদের আটপৌরে তাগিদের কোথায় কোথায় মিলবে, কীভাবে সেই মেলানোর কাজটা নিয়মিত করতে থাকা যায়, শিক্ষাজগতের এবং সাহিত্যচর্চার এই চিরায়ত প্রশ্নের সামনে দাঁড়াতে রবীন্দ্রনাথ যতটা রাজি ছিলেন ততটা রাজি আর কাউকে আমরা পেয়েছি কিনা সন্দেহ। তাঁর কাছে দাঁড়িয়ে দুদণ্ড কাটালেও আমরা ক্রমশ খেয়াল করতে শিখি যে সাধকরাও একরকম শিক্ষক।

আমরা যাকে আনুষ্ঠানিক ব্যবস্থায় শিক্ষা বলে গণ্য করতে শিখেছি, সেই সিস্টেমের সঙ্গে গেরুয়া সবুজ নানা রঙের নৈষ্ঠিক আচারমার্গের এবং আচারত্যাগী মরমিয়াদের হাতে তৈরি লোকায়ত সব-মার্গই-বরণীয়-বলা-মার্গ-মধ্যবর্তীতারও নানাবিধ মোকাবিলা করতে করতে সবাইকে এগিয়ে যে চলতে হবে, এই স্বীকৃতিটুকু দিতে যদি কোনো কোনো পাঠক রাজি হন, তাহলেই অনেকটা পেলাম বলে ভাবব। আজকের এই 'অদ্ভুত আঁধার'-এর দৈন্যদশায় যেটুকু যা প্রাপ্তি হাতে আসে তাতেই কৃতজ্ঞ হয়ে ওঠে চিত্ত — চিত্ত বলছি ইচ্ছে করে, কত শব্দের সঙ্গে সংযোগ হারিয়েছি তার ছোট্ট স্মারকচিহ্ন হিসেবে। শেষ করছি "আচ্ছা উঠি, আড্ডা মেরে ভাল লাগল" এই মিতবাক্যে; বন্ধুদের কাছে বলে কয়ে কৃতজ্ঞতা প্রকাশের কথা তুলতে নেই; তুললে তখন অপমানের কাছাকাঠি পৌঁছে যাবার আশঙ্কা; একবার কেউ যদি সত্যিসত্যিই মর্যাদাহানির মতো পীড়া বোধ করে তাহলে তো রক্ষে নেই; কী কী জিনিস হেসে উড়িয়ে দিলে সত্যিই উড়ে যায় তার সীমা আছে, কঠিন সে সীমা, বিশ্বাস না হলে খতিয়ান সহ জেনে নিন কী কী বিষয় সুকুমার রায় হেসে উড়িয়ে দেবার আপ্রাণ

চেষ্টা করেও পারেননি। ইংরিজি বাচকতার অনেক রীতিনীতি আমরা ধার নিয়েছি ঠিকই; কিন্তু কথায় কথায় সরি আর থ্যাঙ্কিউ বলাটা আমাদের এখনও গায়ে বসেনি বলে লজ্জিত বোধ করতে পারছি না; তাই দেখে কোনো দীপংকর গুপ্ত যদি উদীয়মান মিডল ক্লাস থেকে বের করে দেন, তাহলে হাসিমুখে বেরিয়ে যাব, যেভাবে এক প্রজন্ম আগে অশীন দাশগুপ্ত হাসিমুখে বেরিয়ে যেতেন ত্রিপুরারিবাবুর ক্লাস থেকে; এরকম প্রাইভেট অ্যানেকডোটবাজি করছি বলে কেউ কেউ হয়তো বিরক্ত হচ্ছেন; মনে হয়তো নেই যে লালন থেকে রবীন্দ্রনাথ সবাই গল্পকেই গরিষ্ঠ মর্যাদা দিয়েছিলেন, অকারণে দেন নি?

মায়ে বলে করলা বন্দি
খুশির মাঝারে
লালে ধলায় হইলাম বন্দি
পিঞ্জিরার ভিতরে

হরি তোমার সর্বরূপ
মাতৃরূপ সার

স্বপ্নরাজ্যের সন্ধানে : প্রান্তিক সমাজের ব্রাত্য ধর্ম ও রাজনীতি

সুমন্ত বন্দ্যোপাধ্যায়

আমার বন্ধু নিত্য সেন নদীয়া জেলার দাদুপুর গ্রামের বাসিন্দা। ছোট কৃষক পরিবারের সন্তান। ওর সঙ্গে আমার পরিচয় হয় ১৯৭৫ সালে, বর্ধমান জেলে। আমরা দু'জনাই একই 'সেলে' বন্দী ছিলাম 'নকশাল' আসামী রূপে। নিত্য বয়সে আমার থেকে ছোট হলেও রাজনীতির দীক্ষায় ও শিক্ষায় আমার থেকে অনেক বয়োজ্যেষ্ঠ ছিল। ও আমার বহু আগে থেকেই কারাবন্দী, যাবজ্জীবন কারাদন্ডের কয়েদি হয়ে। চব্বিশ ঘন্টা ডান্ডাবেড়ির শেকলে শৃঙ্খলিত হয়েও ও গান গাইত দরাজ গলায় — আমাদের বিপ্লবী গান থেকে শুরু করে বাউল-ভাটিয়ালি — হাতে বাঁধা লোহার বেড়ি বাজাতে বাজাতে।

নিত্য প্রায়ই বলত — "সুমন্ত -দা, আমাদের মতো মানুষেরা আসলে আউল-বাউল। আমরা নকশালরা রাজনৈতিক বাউল।"

এখন ভেবে দেখি কথাটার মধ্যে একটা অন্তর্নিহিত সত্য আছে। বাউল, ফকির, কর্তাভজা, সাহেবধনী — এই যে বিভিন্ন সম্প্রদায় বাঙলার গ্রামীণ কৃষিজীবী ও অন্যান্য মেহনতি মানুষদের লৌকিক ধর্ম ও সংস্কৃতিতে আজও জনপ্রিয়, এদেরই রাজনৈতিক প্রতিরূপ যেন দেখতে পাই নকশালবাদী গোষ্ঠীগুলিতে। ইতিবাচক ও নেতিবাচক — উভয় অর্থেই এই দুই আপাত ভিন্ন ভাবাদর্শ ও জীবনধারায় একটা মিল আছে। আমার এই বক্তব্য শুনে অনেকেই ঘোরতর আপত্তি করে বলতে পারেন — "কি করে সম্ভব? বাউল-ফকিরেরা অহিংস লোকাচার ও ক্রিয়াকর্মে ব্রতী, আর নকশালরা তো সহিংস রাজনীতিতে বিশ্বাসী ও সক্রিয়!"

আচার-আচরণ ও পন্থা-নির্বাচনে অবশ্যই আকাশ-পাতাল ফারাক। কিন্তু একটু তলিয়ে বিচার করলে দেখা যাবে যে বাংলার এই লোকধর্ম ও তার সংস্কৃতির ঐতিহ্যাশ্রয়ী ভাবাদর্শের উৎস থেকেই জন্ম নিয়েছে পরবর্তী যুগের নকশাল রাজনীতি ও তার গণসঙ্গীত। অতীতের ইতিহাস ঘাঁটলে দেখা যায় যে, এই লৌকিক ধর্মীয় গোষ্ঠীগুলি তৈরি হয়েছিল বাঙলার নিম্নশ্রেণীর হিন্দু ও

গরীব মুসলমান খেটে-খাওয়া মানুষদের মধ্যে, যাঁরা সমাজের প্রান্তিক অংশে বাস করতেন। আর্থ-সামাজিক শোষণ ও বৈষম্যমূলক অবিচারের বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া স্বরূপ এঁরা ঐ সমাজের প্রতিষ্ঠিত রীতি-নীতি বর্জন করে, তার আওতা থেকে বার হন, নিজেদের স্বতন্ত্র তল্লাট তৈরি করেছিলেন গ্রামীণ সংস্কৃতিতে। প্রচলিত বিধি বহির্ভূত ধর্মবিশ্বাস ও জীবনধারনের জন্য এঁরা চিরকাল গোঁড়া হিন্দু কর্তৃত্ব ও মুসলমান মোল্লাতন্ত্র দ্বারা ধিক্কৃত হয়ে এসেছেন। এই সব দূরীকৃত প্রতিবাদী সম্প্রদায়গুলি কিন্তু আজও সাধারণ গ্রামবাসীর কাছে আদরনীয়। ভবঘুরে বাউল বা ফকির গ্রামে এলে ছেলে-মেয়ে-বুড়ো-বুড়ি জড়ো হয় গান শোনার জন্য। ওঁদের ঐ গানে একটা স্বপ্নরাজ্যের আকুতি আছে, একটা চিরকালীন Rural Utopia-র কল্পনা ভেসে বেড়ায়।

আমার মনে আছে ১৯৭৮ সাল বা ওর কিছু পরে হবে। 'এমার্জেন্সি' অর্থাৎ আপৎকালীন অবস্থার অবসানের পর, আমি আর নিত্য, আমরা দুজনেই আরও অন্যান্য সঙ্গী-সাথীদের সঙ্গে জেল থেকে ছাড়া পেয়েছি। আমি নিত্যর দাদুপুর গ্রামে গেছি ওর সঙ্গে কয়েকদিন কাটানোর জন্য। একদিন সকালে ঘুম ভেঙে গেল একটা গান শুনে। গানের কথাগুলো মনে আছে —

এখনো সেই বৃন্দাবনে বাঁশি বাজে রে, বাঁশি বাজে।
বাঁশির সুরে, তালে তালে, মন নাচে রে।
এখনো সেই ব্রজবালা বাঁশির সুরে হয় উতলা ...
এখনো সেই গাভীগুলি গোচরণে উড়ায় ধূলি, ...
সেই সখ-সখীর কোলাকুলি ... আছে রে, আছে রে!

এ যেন কৃষক আত্মার স্বপ্ন, এক কাল্পনিক সুখের দেশে বাস করার সম্ভাবনাময় প্রত্যয়, সবাইকে আশ্বাস প্রদান যে সে জগৎ আছে এবং একদিন সেখানে সবাই পৌঁছুবে। কৃষিজীবী সমাজের আবহমান এই Millenarian dream বা আগামী এক স্বর্ণ যুগের প্রত্যাশার সঙ্গে সঙ্গে তার নাগাল পেতে গিয়ে যে ভাবে এরা আকুল হয়ে ওঠে, তার হতাশাব্যঞ্জক আক্ষেপ শুনলাম গানটির শেষ চরণে —

বড় আশা ছিল মনে, যাব মধুর বৃন্দাবনে
ভবা পাগলা কহে মনের কথা মায়ের কাছে রে!

গানটা গাইছিল ঐ গ্রামেরই একটি ছেলে। হয়তো রোজকার মতো নিজের মনেই গাইছিল, একটা স্বপ্নরাজ্যে ডুবে যেতে। কিন্তু হঠাৎ আমার কানে ঐ

কথাগুলো একটা অতিপরিচিত কল্পনাবিলাসের কথা মনে করিয়ে দিল। সেদিন সকালে দাদুপুর গ্রামে আমি — এক পরাজিত আন্দোলনের ক্লান্ত কর্মী কিন্তু অক্লান্ত স্বপ্নান্বেষী — ভবা পাগলার ঐ কল্পিত বৃন্দাবনের সঙ্গে আমাদের নিজেদের বিপ্লবের স্বপ্নরাজ্যের অদ্ভুত একটা সাযুজ্য খুঁজে পেয়েছিলাম। মনে পড়ল — নকশাল আন্দোলনের শরিকেরা তো এই গ্রামের গরীব কৃষক ও ভূমিহীন চাষীদের প্রান্তিক সমাজ থেকেই বার হয়ে এসেছিলেন। স্বপ্ন দেখেছিলেন এক 'মধুর বৃন্দাবনের' — এক শোষণমুক্ত স্বদেশভূমি। মনে হচ্ছিল — গায়ক যেন আমাদের স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে আমাদের স্বপ্ন ও আশাভঙ্গের কথা। আমরা যখন নকশাল আন্দোলন করেছি, তখন এইভাবেই গাইতাম —

মুক্ত হবে প্রিয় মাতৃভূমি
সেদিন সুদূর নয় আর ...
লাল সূর্যের আলোক ধারায়
করবে মাতৃভূমি মুক্তিস্নান,
উঠবে গেয়ে মুক্তির গান
যুগ যুগ নিপীড়িত মজুর কিষাণ।

দেহতত্ত্বের শ্রেণী উৎস

একটা ব্যাপার লক্ষণীয় এ প্রসঙ্গে। লৌকিক ধর্মে (বাউল, ফকির, কর্তাভজা, সাহেবধনী প্রভৃতি গোষ্ঠী) ও নকশাল রাজনীতি ও সংস্কৃতিতে যেমন যথাক্রমে এই ভবিষ্যৎ আনন্দকানন (বৃন্দাবন) ও স্বপ্নরাজ্য (সমাজতন্ত্র)-র কথা বার বার উচ্চারিত হয়, সঙ্গে সঙ্গে বর্তমান বাস্তবের রূঢ় অস্তিত্ব ও তার কঠিন সমস্যার সঙ্গে মোকাবিলার জন্য প্রয়োজনীয় কর্মপদ্ধতিও নির্দেশিত হয়। আদর্শবাদী হয়েও উভয় চিন্তাধারাই বাস্তবধর্মী ও অনুশীলনকারীরা ব্যবহারিক জগতের কার্যকারণের ব্যাখ্যায় সদা-সজাগ।

প্রথমে, লৌকিক ধর্মের তত্ত্ব ও অনুশীলনের কয়েকটা দিক নিয়ে আলোচনা করা যেতে পারে। বাউল গানই হোক, বা ফকির অথবা কর্তাভজাদের গানই হোক — দেহতত্ত্ব এদের একটা মূল বৈশিষ্ট্য। মানব দেহ, তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ, তার স্বাভাবিক ক্রিয়া — এগুলি রূপক হিসেবে বারংবার ব্যবহৃত হয় এঁদের গানে। এই সব গানের আড়ালে যে গভীর দার্শনিক তত্ত্ব ও বিভিন্ন ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করা হয়, তার জটিল আলোচনায় যাবার মতো আমাব বিদ্যা নেই এবং বর্তমান প্রবন্ধে তার অবকাশও নেই। আমি কেবল কিছু প্রাসঙ্গিক বৈশিষ্ট্য ছুঁয়ে

যাচ্ছি। দেহের উপর এই যে গুরুত্ব আরোপ, এর কারণ অনুসন্ধান করতে গিয়ে আমার বন্ধুবর, লৌকিক ধর্মের বিখ্যাত গবেষক সুধীর চক্রবর্তী যা বলেছেন, আমার মনে হয় সেটা বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ — "দেহতত্ত্বের গান যাঁরা লিখেছেন সেই অত্যন্ত দরিদ্র শোষিত মানুষের (শোষণ দ্বিস্তরের — উচ্চবর্ণের ও সামাজিক অর্থনীতির) দেহ ছাড়া আর কীই বা নিজের ছিল? তাঁদের জীবন ছিল অনিশ্চিত, শস্য সম্ভাবনায় অনিশ্চিত, জমি ও বাস্তুও অনিশ্চিত। দেহই ছিল তাঁদের নিজের একতম সম্পদ। তাই দেহের উপমাতেই তাঁরা জীবনকে বুঝেছেন এবং অন্যকে বুঝিয়েছেন।" ('বাংলা দেহতত্ত্বের গান' , ১৯৯০, পুস্তক বিপণি)

এই দেহকেন্দ্রিক চিন্তার অনুরূপ প্রতিধ্বনি শুনতে পেতাম নকশাল রাজনীতির আলোচনাতে যখন নেতা ও কর্মীরা জোর দিতেন মেহনতি ভূমিহীন ও গরীব কৃষকদের কায়িক শ্রমের অভিজ্ঞতার উপর। যুক্তিটা ছিল এইরকম — যে হেতু এই দরিদ্রতম কৃষক শ্রেণীই নিজেদের দৈহিক শ্রম দিয়ে উৎপাদন করছেন (ধনী ও মধ্যকৃষকেরা সচরাচর নিজেরা জমিতে প্রত্যক্ষভাবে চাষ-আবাদ করেন না; ক্ষেতমজুর, ভূমিহীন ও ছোটকৃষক বা বর্গাদার দিয়ে করান) — সেই জন্য এই শ্রেণীই বিপ্লবের কর্ণধার হবার উপযুক্ত। (সিপিআই-এমএল-এর রাজনৈতিক প্রস্তাব, ১৯৬৯)। এই গতর খাটা মানুষেরা (যাদের 'দেহ ছাড়া কিই বা নিজেদের' আছে?) — চিরকাল বঞ্চিত হয়ে এসেছেন তাঁদের মালিকদের দ্বারা। আজ তাঁদের জেগে উঠে নিজেদের ক্ষমতা প্রতিষ্ঠার দিন এসেছে।

গরীব শ্রমজীবী কৃষকের মানসিকতায় যে আর্থ-সামাজিক বঞ্চনাবোধ সদা জাগ্রত ও দেহতত্ত্বের mystic বা মরমী কবিদের (বাউল, ফকির প্রভৃতি) গানে যে দেহভিত্তিক রূপক ও উপমা সদা-ব্যবহৃত হয়, এই উভয়ের মধ্যে একটা আশ্চর্য সাযুজ্য খুঁজে পেয়েছিলাম একজনার সাথে। ১৯৭৬-এ বর্ধমান জেলে রয়েছি। মাঝে মধ্যে পুলিশে বিনা-টিকিটে রেলযাত্রীদের ধরে এনে পুরে দিত হাজতে দু-একদিনের সাজা হিসেবে। হঠাৎ এইরকম একজনা এসে হাজির হল একদিন। এক বাউল। বর্ধমান লাইনে ট্রেনে গান গেয়ে ভিক্ষা করে বেড়ায়। আপৎকালীন অবস্থার কড়াকড়ির ফলে, বিনা টিকিটে ভ্রমণের অপরাধে এতদিনের সুপ্ত আইনের শিকার হয়েছে। সেদিন সন্ধ্যাবেলা আমাদের একটা গান গেয়ে শোনালো —

আমি সেই ঘরের মালিক নই।
পরের জমিন পরের জায়গা

ঘর বানাইয়া আমি রই
আমি সেই ঘরের মালিক নই
ঘরখানা কার জমিদারি
আমি পাই না জমিদারের দেখা
মনের দুঃখ কারে কই
জমিদারের ইচ্ছামত দেও না জমি চাষ
তাইতে ফসল ফলে না রে
দুঃখ বারোমাস।
আমি খাজনাপাতি সবই দিলেম, ভোলামন
তবু আমার জমি হয়গো নিলেম
আমি চলি যে তার মন জুগাইয়া
দেখিলে মেলে না ...

গানটা শুনে, আমরা শহুরে মধ্যবিত্ত নকশাল বন্দীরা লাফিয়ে উঠলাম — 'আরে! এতো একটা রাজনৈতিক গান! আমাদের রাজনীতির কথা বলছে!'

পিছন থেকে বন্ধু নিত্য সেন আমার হাত টেনে আমাকে স্মরণ করিয়ে দিল — "সুমন্তদা, এটা আসলে দেহতত্ত্বের গান।"

আমি জিজ্ঞেস করলাম — "তার মানে?"

ও ব্যাখ্যা করে বলল — "ঘর, জমিন — এ সবের মানে আপনার দেহ, তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ। এ সবের মালিক তো আপনি নন। কবে হাতছাড়া হয়ে যাবে তা কি আপনি জানেন? এই দেহের জমিদার তো সেই ওপরওয়ালা — যার হুকুম মাফিক আপনি এ দেহ পেয়েছেন; তাঁরই ইচ্ছামত দেহ পাওয়া যায়। কোন দেহ ভাল ফসল দেয়, কোন দেহ দেয় না। আর সেই ওপরওয়ালা মালিকের ইচ্ছামত একদিন আপনার দেহ নিলেম হ'য়ে যাবে।"

আমার মনে পড়ল রামপ্রসাদের গানের কথাগুলো —

মন রে কৃষিকাজ জানো না।
এমন মানবজমিন রৈলো পতিত, আবাদ করলে ফলতো সোনা।

আসলে দেহতত্ত্ব মানে নিছক দৈহিক আকর্ষণ-বিকর্ষণ, ইন্দ্রিয়ানুভূতি নয়। এর পিছনে মনের বা অন্তরিন্দ্রিয়ের নিগূঢ় প্রেরণা রয়েছে। দেহকে নির্বাচন করা হয়েছে উপমা হিসেবে এক সুদূরপ্রসারী জীবনাদর্শকে তুলে ধরার জন্য। মনে রাখা দরকার,

আপাতদৃষ্টিতে এই মতবাদকে মরমী বা অতীন্দ্রয়বাদী বলে মনে হলেও এর আড়ালে শুনতে পাই জ্ঞানমার্গের তীক্ষ্ণ বিশ্লেষণাত্মক সংশয়বাদের প্রশ্ন। গোঁড়া ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের আরোপিত চিন্তা-ভাবনা, নিয়ম-কানুনকে 'চ্যালেঞ্জ' করার সাহস। যে সাহসে লালন সাঁই হাসতে হাসতে গাইতে পারেন —

ছুন্নৎ দিলে হয় মুসলমান
নারীর তবে কি হয় বিধান?
বামন চিনি পৈতেয় প্রমাণ
বামনী চিনি কি প্রকারে?

নিম্নবর্গের এই সব ধর্মীয় গোষ্ঠীগুলির এই সদাজিজ্ঞাসু মনোভাব ও প্রচলিত রীতিবহির্ভূত জীবনধারা পালন আসলে সেই অতীতের জ্ঞানযোগের ঐতিহ্যের লৌকিক প্রতিরূপ। চার্বাক দর্শনের উত্তরাধিকারী এঁরা। জ্ঞানমার্গ ও ভক্তিমার্গের চৌমাথাতে এঁদের জন্ম। দুই পথের টানা-পোড়েন এঁদের গানে এক আশ্চর্য অস্থিরতার জগৎ সৃষ্টি করেছে।

আউল-বাউল-ফকিরের উৎপত্তি

জ্ঞান মার্গ-ভক্তি মার্গের এই দ্বন্দ্বের আলোচনা করার আগে, বাউল ধর্ম (ও অনুরূপ লৌকিক ধর্মীয় গোষ্ঠীগুলি)-এর উৎপত্তির একটা লৌকিক ব্যাখ্যার উল্লেখ করা যেতে পারে এ প্রসঙ্গে। এটা মোটামুটি সর্ববিদিত যে শ্রীচৈতন্য যে বর্ণাশ্রমবিরোধী ধর্মীয় সংস্কার আন্দোলন শুরু করেছিলেন নবদ্বীপে ষোড়শ শতাব্দীতে, তাঁর মৃত্যুর পর তার নেতৃত্ব তাঁর ব্রাহ্মণ ও উচ্চজাতের শিষ্যদের হাতে গিয়ে পড়ে। গৌড়ীয় বৈষ্ণব নামে পরিচিত এই নেতৃত্বর নানাবিধ বৈষম্যমূলক আচরণের জন্য, চৈতন্যের নিম্নবর্গীয় (হিন্দু জাতের শ্রেণীবিভাগে অধস্তন সম্প্রদায়ভুক্ত — হাড়ি, ডোম প্রভৃতি) শিষ্যেরা, প্রতিষ্ঠিত বৈষ্ণবীপ্রধান ধারা (mainstream) থেকে বার হ'য়ে স্বতন্ত্র গোষ্ঠীতে বিভক্ত হয়ে যান। এইভাবেই তৈরী হয়েছিল বলরাম হড়ি সম্প্রদায়, সাহেবধনী, কর্তাভজা প্রভৃতি ব্যক্তি-গুরু-কেন্দ্রিক গোষ্ঠীগুলি। (এ বিষয়ে বিস্তারিত, সুলিখিত এবং সুগবেষিত আলোচনার জন্য দ্রষ্টব্য — রমাকান্ত চক্রবর্তীর 'চৈতন্যের ধর্মান্দোলন' ('বারোমাস' পত্রিকা, এপ্রিল, ১৯৮৬), অক্ষয় কুমার দত্ত'র 'ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়' (১৮৭০)।

এর পাশাপাশি এক ধরনের যাযাবর দল বার হয়ে এসেছিল বৈষ্ণব প্রতিষ্ঠানের থেকে। এঁরা প্রশ্ন করেছিলেন উচ্চবর্ণের গোস্বামী নেতৃত্বের

ভক্তিমার্গের বিরুদ্ধে। এই বিতর্কের একটা চমৎকার বিবরণী পাই 'শ্রীপ্রেমবিলাস'এ, যেটি রচনা করেছিলেন নিত্যানন্দ দাস ১৬০০ সালে। শ্রীচৈতন্যের শিষ্য অদ্বৈত তাঁর বাণী প্রচার করতে গিয়ে ভক্তিবাদের উপরেই জোর দেন —

সর্বশিষ্যে অদ্বৈত ভক্তিবাদ প্রচারিল
জ্ঞানবাদ ছাড়ি সবে ভক্তি আচরিল।।
কামদেব নাগর আর আগল পাগল
না ছাড়িল জ্ঞানবাদ, আর শঙ্কর।।
শঙ্কর বোলে — মোরা হই জ্ঞানবাদী।
জ্ঞানবাদ বিনে কেহ না পাইবে সিদ্ধি।
অদ্বৈত বোলে — তোমরা জ্ঞানবাদ ছাড়।
শঙ্কর বোলে — বিচারে পরাজিত কর।
অদ্বৈত বোলে — শঙ্কর তুমি হইলে বাউল।
তোর মতে লোক সব হইবে আউল।
ক্রোধ করি অদ্বৈত তাদের ত্যাগ কৈল
ত্যাগী হয়া তারা দেশান্তরে গেল।।

বাউল ও অন্যান্য অনুরূপ উপদলের মতো, ঐস্লামিক মূল দারা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে ফকির সম্প্রদায় ও মোল্লাতন্ত্রের গোঁড়া বিশ্বাস ও আচার-আচরণের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেন। সুফী চিন্তাধারায় অনুপ্রাণিত হয়ে এঁরা শরিয়ৎকে খোলাখুলি 'চ্যালেঞ্জ' করেন এঁদের গানে ও দৈনিক জীবন-যাপন ধারায়। লক্ষণীয় বাউল, কর্তাভজা, ফকির, লালনশাহী, বলরামী — এই সব সম্প্রদায়ের মানুষেরাও প্রধান ধর্মগুলিকে চ্যালেঞ্জ করেছে।

এর থেকে অনুমান করা যায় যে 'জ্ঞানবাদী'রা অদ্বৈত-দ্বারা আরোপিত 'ভক্তিবাদ' (অর্থাৎ বিনা প্রশ্নে, বিনা 'বিচার' ও বিতর্কে, কর্তৃত্বর আদেশ পালন করা)-এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেন। যুক্তি দ্বারা তাঁরা সব কিছুই যাচাই করতে চেয়েছিলেন। তাই যখন 'জ্ঞানবাদ ছাড়ি সবে ভক্তি আচরিল', মুষ্টিমেয় কিছু যুক্তিবাদী ('কামদেব, নাগর ... আর শঙ্কর) জ্ঞানবাদের পথে অবিচল থেকেছিলেন এবং ফলস্বরূপ বৈষ্ণব mainstream থেকে বহিষ্কৃত হয়েছিলেন। ভক্তিবাদী প্রাধান্যের স্তববাণী ছিল — "বিশ্বাসে মিলায়ে কৃষ্ণ, তর্কে বহুদূর!"

বৈষ্ণব মূলধারা থেকে বহিষ্কৃত হওয়া সত্ত্বেও জ্ঞানবাদী ধারা টিকে রইল। টিকে রইল চৈতন্যর ধর্মান্দোলনের নিম্নবর্গীয় অনুগামীদের মধ্যে। এঁদের নেতারা কর্তৃত্ব আরোপিত বিধি-নিষেধ ইত্যাদিকে প্রশ্ন করতে শুরু করেন সহজ সাদামাটা ভঙ্গীতে। বিবদমান ধর্মীয় তত্ত্বকথার থেকেও বড় মনুষ্যসমাজের সাধারণ্য — এই মূল কথাটা প্রতিধ্বনিত হয় তাঁদের গানে —

করিম-রহিম রাধা-কালী এ বুল সে বুল যতই বলি
শব্দভেদে ঠেলাঠেলি হইতেছে সংসারে
মানবদেহে থেকে স্বয়ং একই শক্তি ধরে।

বা

শিয়াল কুকুর পশু যারা একজাতি এক গোত্র তারা
মানুষ শুধু জাতির ভারা মরে বইয়ে।

বৈষ্ণব মোহান্ত অধ্যুষিত প্রতিষ্ঠান থেকে ছিটকে বার হয়ে আসা বাউল ও অন্যান্য অনুরূপ উপদলের মতো, ঐস্লামিক মূল ধারা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে ফকির সম্প্রদায় ও মোল্লাতন্ত্রের গোঁড়া বিশ্বাস ও আচার-আচরণের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেন। সুফী চিন্তাধারায় অনুপ্রাণিত হয়ে এঁরা শরিয়ৎকে খোলাখুলি 'চ্যালেঞ্জ' করেন এঁদের গানে ও দৈনিক জীবন-যাপন ধারায়। লক্ষণীয় বাউল, কর্তাভজা, ফকির, লালনশাহী ও বলরামী — এই সবকটি লোকধার্মিক গোষ্ঠীগুলি বর্ণাশ্রমপ্রথা বিরোধী, লিঙ্গ-বৈষম্য বিরোধী, ধর্মীয় সাম্প্রদায়িক বিভেদের বিরোধী। দেখা যাচ্ছে, উচ্চবর্গের কর্তৃত্ব আরোপিত সামাজিক বাধা-নিষেধ ও ধর্মীয় বিবাদ — এ সবের প্রতিবাদে এঁরা সরব ও আপোষ করতে নারাজ। আজও পশ্চিমবাংলার গ্রামাঞ্চলে এঁরা এঁদের এই বিদ্রোহী ভূমিকা পালন করে যাচ্ছেন ও তার জন্য মূল্য দিতে হচ্ছে। হিন্দু ও মুসলমান — উভয় সম্প্রদায়ের গোঁড়া মৌলবাদী ধর্মীয় হর্তা-কর্তা (ও রাজনৈতিক নেতা) এঁদের একঘরে করে রেখেছে, জমি থেকে উচ্ছেদ করেছে ও নানারকম অত্যাচারে জর্জরিত করেছে। এই হয়রানি থেকে আত্মরক্ষার তাগিদে নদীয়া-মুর্শিদাবাদের বাউল-ফকিরেরা স্বনামধন্য শক্তিনাথ ঝা-এর নের্তৃত্বে ১৯৮৩ সালে গড়ে তোলেন বাউল-ফকির সঙ্ঘ। নিয়মিত সম্মেলনে মিলিত হয়ে এঁরা নিজেদের নির্যাতনের অভিজ্ঞতার কথা বলেন এবং কি ভাবে তার মোকাবিলা করা যায় তা নিয়ে আলোচনা করেন। (দ্রষ্টব্য, সুরজিৎসেন, 'ফকিরনামা', গাঙচিল, কলকাতা, ২০০৯)

বলা যেতে পারে ইতিহাসের পরিহাস — যে বামপন্থীরা জাতিভেদ, লিঙ্গ বৈষম্য ও ধর্মীয় সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে বরাবর লড়াই করে এসেছে, আজ তাদেরই শাসিত রাজ্যে ঐ লড়াই যারা করছে প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চলে, তাদের রক্ষা করা তো দূরের কথা, বরং অনেক স্থানীয় বামপন্থী নেতা প্রশাসনের সাহায্যে তাদের অবদমিত করতে ব্যস্ত। পশ্চিমবঙ্গে বামপন্থী নের্তৃত্বের এই অধঃপতন আশ্চর্যজনক নয়। আদর্শকে জলাঞ্জলি দেওয়ার স্বভাব বাঙালি উচ্চবর্ণ ও উচ্চবর্গের স্বভাবজাত।

স্মরণীয়, প্রায় পাঁচশো বছর আগে, চৈতন্যের ব্রাহ্মণ শিষ্য ও সহযোগীতা তাদের গুরুর প্রারম্ভিক সার্বজনীন আদর্শ ও পরিকল্পনাকে ভেঙেচুরে, নিজেদের শ্রেণীস্বার্থে গৌড়িয় বৈষ্ণববাদের পত্তন করেন। নিম্নবর্গের মানুষ — যাঁরা চৈতন্যের ধর্মান্দোলনের মূল ভিত্তি ছিলেন — তাঁরা ক্রমে ক্রমে প্রান্তস্থিত ও শেষে বিতাড়িত হলেন 'আউল-বাউল' নামে।

আশ্চর্য! এক অনুরূপ marginalization বা দরিদ্রতম মানুষের প্রতিবাদী ভূমিকাকে দূরে ঠেলে ফেলে দেওয়ার প্রবণতা, পশ্চিমবঙ্গের বামপন্থী নেতৃত্বের (যাঁরা মূলতঃ বাঙালি উচ্চবর্গ ও উচ্চবর্ণ বংশ-উদ্ভূত) ভাবধারা ও কর্মপন্থাতে প্রকট। ১৯৬০ সালের শুরুতে, ষোড়শ শতকের চৈতন্যের মতো, সিপিআই (এম)-এর নেতারা পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতিতে একটা বৈপ্লবিক পরিবর্তন আনার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। কিন্তু চৈতন্যের ব্রাহ্মণ শিষ্য ও সহযোগীরা অচিরেই যেমন তাঁদের আদি ভিত্তি, দরিদ্র নিম্নবর্গকে ভুলে গিয়ে ব্রাহ্মণ্যর পুনপ্রবর্তন করেছিলেন, সিপিআই (এম)ও কয়েক বছরের মধ্যেই বুর্জোয়া রাষ্ট্র কাঠামোর মধ্যে থেকে সরকার পরিচালনার তাগিদে সেই অতীতের শাসন ব্যবস্থাই ফিরিয়ে আনলো। ১৯৬৭ সালে নকশালবাড়ির কৃষক বিদ্রোহ দমন থেকেই প্রতীপ গতির সূত্রপাত এবং আজ তা চূড়ান্ত অধঃপতনে পৌঁছেছে সিঙ্গুর-নন্দীগ্রামে।

বিপরীত দিকে, চৈতন্যপরবর্তী যুগে যেমন নিম্নবর্গের বাউল, প্রভৃতি গোষ্ঠীরা বৈষ্ণব গোঁসাইদের কর্তৃত্বের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়ে, অতীত ধর্মান্দোলনের সার্বজনিক মূল্যবোধের পুনঃপ্রতিষ্ঠা করেন, ষাটের দশকে নকশাল আন্দোলনের আওতায় গরীব ও ভূমিহীন কৃষক, সিপিআই (এম)-এর নেতাদের প্রতারণার বিরুদ্ধে সংঘবদ্ধ হয়ে অতীতের বৈপ্লবিক ভাবাদর্শের পুনরাধিষ্ঠান করেন। লক্ষণীয় যে, লৌকিক ধর্মাবলম্বী গোষ্ঠীরা আজও যেমন গ্রামীণ বাঙলার নিম্নসমাজের সাংস্কৃতিক প্রতিমূর্তি, রাজনীতির ক্ষেত্রে নকশাল গোষ্ঠীরা আজ

এই শ্রেণীর মানুষের দাবি আদায়ের আন্দোলনের প্রতিভূ রূপে বিরাজমান — সে পশ্চিমবাঙলার লালগড়ই হোক, বা ছত্তিশগড়ের বঞ্চিত আদিবাসীদের মধ্যেই হোক। উভয় গোষ্ঠীর এই ঐতিহাসিক প্রবহমানতার মূল সূত্র একই — প্রান্তিক সমাজের দরিদ্র মানুষের সুখ-দুঃখের অংশভাগী হওয়া। বাউল-ফকিরেরা যেমন উচ্চবর্গ ও বর্ণের সমাজকর্তাদের দৌরাত্মের শিকার, নকশালবাদীরাও ঠিক একই ভাবে রাষ্ট্রশক্তির হিংস্র নির্যাতনের বলি হয়েছে। বাউল-ফকিরদের ধর্ম যেমন এক সার্বজনীন মানবতাবাদের উৎস থেকে জন্ম নিয়েছে, নকশাল রাজনীতিও অনুরূপ সর্বজনহিতকর সমাজতন্ত্রের আদর্শ দ্বারা অনুপ্রাণিত।

প্রান্তিক সমাজের এই প্রতিবাদের (ধর্মীয় ও রাজনৈতিক উভয়বিধ) কিছু রীতিনীতি কিন্তু মাঝে মধ্যে উভয় গোষ্ঠীকে ব্যাপক জনসাধারণের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন করে রাখে। বাউলদের গুহ্য সাধনা, জটিল তত্ত্বানুশীলন ও গানে দুর্বোধ্য সংকেতের ব্যবহার প্রায়শঃই এঁদের ক্ষুদ্র উপদলে পরিণত করেছে, বৃহত্তর জনআন্দোলনে উন্নীত হতে দেয়নি। ফকির বা অন্যান্য সম্প্রদায়গুলি সম্বন্ধেও একই কথা বলা যায়। এর কারণ অনুসন্ধান করতে গিয়ে আবার সুধীর চক্রবর্তীর গবেষণায় ফিরে যেতে হয়। সুধীর অনুমান করেছেন — "এরা যুগে যুগে উচ্চবর্ণের দ্বার ঘৃণিত ও দলিত। আলেম মুসলমান আর নৈষ্ঠিক হিন্দু বারে বারে দেহাত্মবাদীদের নিপীড়ন করেছে, ভেঙে দিয়েছে তাদের একতারা, পুড়িয়ে দিয়েছে আখড়া। মানুষগুলি তাই গভীর অভিমানেই কি তাঁদের গানে আনলেন রহস্যের ধূসরতা আর শব্দের আবরণ? ... তবে সবচেয়ে বড় কারণ সম্ভবত গুহ্য গোপন তত্ত্ব সরাসরি বলা যায় না বলেই এই রূপক-প্রতীক-শব্দ ঘটিত গূঢ় প্রয়োগ এ সব গানকে আচ্ছন্ন করে আছে। তাতে একটা মস্ত বড় ক্ষতি এই হয়েছে যে, সাধারণ শ্রোতারা দেহতত্ত্বের গানকে বহু সময় কৌতুকের বা রঙ্গের গান বলে গ্রহণ করেছে।" ('বাংলা দেহতত্ত্বের গান')

ঠিক একইভাবে দেখতে পাই, নকশাল আন্দোলনের বিভিন্ন দল-উপদলগুলি বিশাল জনসমুদ্র থেকে বিযুক্ত হয়ে, গোপন রণনীতি ও কৌশলের মধ্যে ডুবে যাচ্ছে। যেন একধরনের গুহ্য সাধনায় নিমগ্ন পাহাড়-জঙ্গলের গুপ্ত আস্তানায়। অবশ্য এর কারণ অনুসন্ধান করতে গেলে দেখা যাবে যে রাষ্ট্রশক্তির নিপীড়নই এদের ঠেলে দিয়েছে এই আত্মগোপনীয় রাজনীতির গিরিকন্দরে। সমাজের উচ্চবর্ণের উৎপীড়নের প্রতিবাদে যেমন বাউল-ফকিরেরা অহিংস গুহ্য সাধনায় নিভৃত আশ্রয় নিয়েছে, উচ্চশ্রেণী ও তাদের প্রশাসনের অত্যাচারের প্রতিরোধে

নকশালরা সশস্ত্র গুপ্ত আন্দোলনের আড়ালে নির্বাসিত। এটা খুব দুঃখজনক যে মানবতাবাদের ও জনহিতকর আদর্শে ব্রতী হওয়া সত্ত্বেও এই উভয় গোষ্ঠীই ব্যাপক কোন জন আন্দোলন গড়ে তুলতে পারেনি। ধর্মের ক্ষেত্রে, ভক্তি আন্দোলনের সংস্কারের প্রয়াসের ঐতিহ্যেরই উত্তরাধিকারী আজকের বাউল ফকিরেরা। আর রাজনীতির ক্ষেত্রে অতীতের সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনের উত্তরপুরুষ নকশালরা। ভাবাদর্শে প্রসারতা, অথচ কর্মপদ্ধতিতে সংকীর্ণতা — এই পরস্পরবিরোধী প্রবণতা উভয়কেই কিছুটা পঙ্গু করে রেখেছে। ভারতবর্ষ পৃথিবীর সর্ববৃহৎ গণতন্ত্র বলে আমরা বড়াই করি। কিন্তু দরিদ্র ও বঞ্চিত মানুষের আশা-আকাঙ্খা ও প্রতিবাদস্পৃহার প্রকাশ ও বিকল্প জনকল্যাণমূলক সমাজব্যবস্থা প্রতিষ্ঠায় তাদের প্রচেষ্টাকে অবদমন করে, বর্তমান সমাজের মাতব্বরেরা ও রাষ্ট্রযন্ত্রের অধিকর্তারা কি গণতন্ত্রের মূল্যবোধকেই জলাঞ্জলি দিচ্ছেন না?

মন চল যাই ভ্রমণে
কৃষ্ণ অনুরাগের বাগানে

রূপান্তরিত হতে হতেও বাউল বেঁচে আছে — আবুল আহসান

আবুল আহসান চৌধুরীর সঙ্গে এই সাক্ষাৎকারটি নিয়েছেন পার্থ মজুমদার ও সুরজিৎ সেন

পত্রিকা : আপনার বাউলচর্চার ইতিহাস প্রথমে জানতে চাইব।

আহসান : আমার জন্ম তো লালনের দেশেই, ছেঁউরিয়া থেকে খুব কাছেই। সেই ছেলেবেলা থেকেই বাউলের গান শুনে আসছি, একটু বড় হলে ছেঁউরিয়ায় মাঝে মধ্যে খাওয়া হত। বাউলদের গান শুনতাম আর কিছু বাউল, ওদের সঙ্গে আমার একটা অন্তরঙ্গ সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল ...

পত্রিকা : কত বছর বয়স তখন আপনার?

আহসান : সেটা আমি যখন স্কুলে পড়ি এইট-নাইন এই রকম অবস্থায় ... তা ওরা আমার বাড়িতে আসতেন এবং ওদের কাছ থেকে আমি গান টুকে নিতাম। এবং কোন কোন বাউলকে আমি অনুরোধ করতাম যে তাদের নিজের অঞ্চল থেকে গান সংগ্রাহ করে দিতে ... একজনের কথা আমার খুব মনে পড়ছে, আজিম শাহ। কুষ্ঠিয়ার একটি থানা ভেরামারা, তার একটি গ্রামে ওর বাড়ি ছিল। এরপর হারামণির সংগ্রাহক অধ্যাপক মনসুরউদ্দীন-এর সঙ্গে আমার পরিচয় হয়, ছেঁউরিয়ার আখড়াতেই। তখন আমার বয়স এতই অল্প যে উনি প্রথমে আমাকে পাত্তা দিতে চাননি, তা আমি খুব কাছাকাছি থাকতাম উনি আমায় ফাই-ফরমাস খাটাতেন। যেমন জেলখানায় ফালতু বলে কিছু ছোকরা থাকে, কিছু কয়েদী থাকে যাদের অন্য সম্ভ্রান্ত কয়েদীরা কাজে লাগায়। তা আমি মনসুরউদ্দীনের ফালতু হিসাবে কাজ করতাম, কখনও উনি বলতেন গন্ধভাঁজালের গাছ নিয়ে এসো, কখনও বলতেন কালাচাঁদ ফকিরের গান সংগ্রহ কর, গোঁসাই গোপালের গান আমাকে এনে দাও ...

পত্রিকা : সে সময় কি আপনি স্কুল ছাড়িয়ে কলেজে ঢুকেছেন?

আহসান : না, না, তখন স্কুলে, প্রবেশিকা পরীক্ষার দু-বছর আগে, তো এইভাবে করতে করতে উনি আমাকে বললেন তুমি গান সংগ্রহ কর। তারপরে উনি আমার একটি পরিচয় পেয়ে যথেষ্ট প্রশ্রয় দেওয়া শুরু করলেন। আমার মাতুল ওর বন্ধু ছিলেন। ডঃ কাজী মোতাহার হোসেন, উনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ছিলেন। এখানে যেমন প্রশান্তচন্দ্র মহালনবিস, পরিসংখ্যান বিদ্যার জনক তেমনি আমাদের অঞ্চলে কাজী মোতাহার হোসেনকে পরিসংখ্যানের জনক বলা হয়। শুধু তাই নয়, তাঁর আরো অনেক পরিচয় আছে, নজরুলের ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলেন, বিজ্ঞানী, দাবাড়ু, লেখক। ...

ওখানে বুদ্ধির মুক্তি আন্দোলন হয়েছিল, কাজী আবদুল ওদুদ আবুল হোসেন এবং কাজী মোতাহার হোসেনের নেতৃত্বে ১৯২৬ সালে। ... তা যখন উনি জানলেন, যে উনি আমার মামা হন, তখন উনি আমাকে আরো বেশী কাছে টেনে নিলেন এবং আমি তাকে মামা সম্বোধন করতাম।

বাউলেরা হচ্ছেন আমার এ-বিষয়ে প্রথম গুরু, গান সংগ্রহের দ্বিতীয় পর্যায়ে গুরু হচ্ছেন মনসুরউদ্দীন। তারপর গান সংগ্রহ করতে করতে আমার মনে হল যে শুধু গান সংগ্রহ না করে এই গান যারা বেঁধেছেন তাঁদের পরিচয় সংগ্রহ করাটাও জরুরী। তা আমি ওই সময়ে গানের পাশাপাশি বাউলদের জীবনী সংগ্রহও শুরু করি। তাতেও বাউলরা আমার সহায় হন। আমি প্রায় ৬০-৭০ জন পদকর্তা বাউলের জীবনী সংগ্রহ করি। হঠাৎ আমার একটা দুর্বুদ্ধি খেলল মাথায়। একটা বই করে বের করলে কেমন হয়। তা সেটা আপনারা জানেন যে ১৯৭১ সালে, মুক্তিযুদ্ধের মধ্যে দিয়ে বাংলাদেশ স্বাধীন হয়। আমি মুক্তিযুদ্ধে সম্পৃক্ত ছিলাম এবং পশ্চিমবঙ্গে, ভারতবর্ষেই আমরা মুক্তিযুদ্ধের কাজে অংশ নিয়েছি এবং এর সংগঠন কিম্বা অন্যান্য কাজে আমি সম্পৃক্ত ছিলাম। এখানে স্বাধীন বাংলা বলে পত্রিকা কৃষ্ণনগর থেকে বের করতাম, তার সঙ্গে আমার যোগ ছিল। ফিরে গিয়ে আমি তখন ভাবলাম যে একটা বই বের করলে ভাল হয়, তো সেই বইটি যেহেতু আমি মূলত কুষ্ঠিয়া অঞ্চলের বাউলদের গান সংগ্রহ করেছি, জীবনী সংগ্রহ করেছি ...

"কুষ্ঠিয়ার বাউল সাধক" নামে একটি বই বের করা হয়, বেশ বড় বই হয়ে গেল, প্রায় ৪০০ পৃষ্ঠার বই এবং সেই বইয়ে ৫৫ জন বাউলের জীবনী এবং গান আছে, পাশাপাশি কুষ্ঠিয়া অঞ্চলের এই বাউলগানের প্রেরণায় বাউল পদকর্তাদের প্রভাবে শিক্ষিত লোকজনেরাও গান বাঁধতে শুরু করেছিলেন। কাঙ্গাল হরিনাথ থেকে শুরু করে মীর মোসারফ হোসেন, সখের বাউল বলে আমি ওই বইতে আর একটি অধ্যায় সংযোজন করি, সেখানে এঁদের কথা আছে, গান ও জীবনী আছে। বইটির একটি ছোট আশীর্বাণী লিখে দেন অন্নদাশঙ্কর রায়, আর একটি দীর্ঘ ভূমিকা লিখে দেন আমার শিক্ষক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড: আহমদ শরীফ, আমি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র, ওঁরই ছাত্র।

অন্নদাশঙ্করের সঙ্গে আমার সম্পর্কের পূর্ব সূত্র হচ্ছে উনি ১৯৩৫ সালে যখন কুষ্ঠিয়া মহকুমার হাকিম ছিলেন তখন আমার বাবা ওখানে honourable Magistrate ছিলেন এবং তিনিও লেখালেখি করতেন। সেই সুবাদে অন্নদাশঙ্করের সাথে তার একটা গভীর বন্ধুত্ব ও সৌহার্দ্য গড়ে ওঠে এবং অন্নদাশঙ্কর তাঁর অনেক বইয়ে বাবার কথা লিখেছেন। তাঁর 'জীবন যৌবন' কিম্বা 'যুক্ত বঙ্গের স্মৃতি' — এসব বইয়ে বাবার কথা লিখেছেন, আরো অনেক জায়গায় লিখেছেন। তা অন্নদাশঙ্করের এই আশীর্বাণী, আহমদ শরীফের এই ভূমিকাটি নিয়ে বইটি যখন বের হল, সে অভাবনীয় ব্যাপার। আমি তখন বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র এবং গোঁফের রেখাও খুব ভাল করে দেখা দেয়নি ... এই বইটি জানুয়ারী ১৯৭৪-এ বের হল। তার আগে অবশ্য সব বাঙ্গালী কিশোর-তরুণের ভেতরে যে আবেগ থাকে এবং সেটি পদ্যে প্রকাশ পায়, সেই রকম আমার প্রথম বই কিন্তু কবিতার বই। এবং তা এই কলকাতা থেকেই বেরিয়েছিল কবি বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের আনুকূল্যে। বীরেনদা আমাকে অসম্ভব স্নেহ করতেন, ভালোবাসতেন। তিনিই বইটি বের করে দেন 'স্বদেশ আমার বাংলা'। বুঝতে পারছেন যে মুক্তিযুদ্ধের সেই সময়ের প্রেক্ষাপটে লেখা।

"কুষ্ঠিয়ার বাউল সাধক" নামে এই বইটির সাথে সাথে দুই বাংলাতেই এক ধরনের মনোযোগ আমি পেয়ে গেলাম। যেমন

বলি যে, পশ্চিমবঙ্গ থেকে ড: আশুতোষ ভট্টাচার্য। উনি এই বই সম্পর্কে লিখলেন যে এটি বাউলদের একটি কোষগ্রন্থ, এতবড় স্বীকৃতি আশুতোষ ভট্টাচার্যের কাছ থেকে পাওয়া, বলা চলে অভাবনীয়ই। এছাড়া যাঁরা ওই সময়ে folklore নিয়ে কাজ করতেন, যাঁরা বিখ্যাত ব্যক্তি পশ্চিমবঙ্গে, তাদের অনেকেই বইটির প্রশংসা করেছেন, অনেকে হয়তো আমাকে উৎসাহিত করতেই প্রশংসা করেছেন, গুণের কারণে নয়। শঙ্কর সেনগুপ্তের নাম এখন সবাই ভুলে গেছে, পশ্চিমবঙ্গে কেউ জানেনা যে শঙ্কর সেনগুপ্ত কত বড় folklorist ছিলেন। "Folklore" বলে একটি ইংরাজি পত্রিকা বের করতেন এবং উনি অনেক বই বাংলা, ইংরাজিতে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ folklore সম্পর্কিত বই বের করেছেন। উনি folklore পত্রিকায় এ বইটির একটি আলোচনা করলেন। আরো অনেকে করেছেন এবং আরো একজনের কথা অত্যন্ত শ্রদ্ধার সাথে বলি। একটি দীর্ঘ review করলেন ড: পশুপতি শাসমল। পশুপতি শাসমল তখন শান্তিনিকেতনের রবীন্দ্র ভবনের ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক ছিলেন এবং অধ্যাপকও ছিলেন। আমাকে উনি অনেক সহায়তা করেছেন রবীন্দ্র ভবনের সমস্ত দুর্লভ, দুষ্প্রাপ্য সব জিনিস উনি আমাকে প ়য়েছেন। এমন আনুকুল্য পাওয়া সত্যিই ভাগ্যের কথা।

পত্রিকা : কিন্তু আমার যেটা প্রশ্ন যে আপনার ওই লালনের উপর Focusটা কিভাবে set করলেন?

আহসান : কুষ্ঠিয়ার বাউল সাধক মূলত লালনকে কেন্দ্র করে অন্য সাধকদের গান ও পরিচিতি প্রকাশ। এখানে প্রধান কেন্দ্রবিন্দুতেই আছেন লালন। তা ওই সালেই লালনের জন্মের দু'শো বছর পূর্ণ হল ১৯৭৪, তখন আমার মাথায় খেলল একটা স্মারক গ্রন্থ প্রকাশ করা যায় কিনা। সেই সময় লালন স্মারক গ্রন্থ নামে বইটি বের হল, বাংলাদেশ জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র একটি সরকারি প্রতিষ্ঠান। গ্রন্থ উন্নয়ন, গ্রন্থ প্রসারই এদের মূল কাজ, তা এই বইটি দিয়ে তাদের প্রকাশনা শুরু হল, পরে ৪-৫টি বই বের হয়েছে, আর বেশি হয়নি ...

লালন স্মারক গ্রন্থ, বইটি ১৯৭৪-এর মার্চ মাসে বেরোয়। তা এই বইটির জন্য আমাকে একটি বড় আশীর্বাণী লিখে দিলেন বসন্তকুমার

পাল, লালনের প্রথম জীবনীকার বসন্ত পালের সঙ্গে আমার যোগাযোগ ছিল এবং আমাকে উনি একেবারে পুত্রস্নেহে আপ্লুত করেছিলেন। "এই বইটি লালন চর্চার ক্ষেত্রে" ... (এটি আমার কথা নয়, অন্যদের কথা) একটা মাইল ফলক, এই বই বেরোনোতে যা প্রতিক্রিয়া হল, অবশ্যই ইতিবাচক প্রতিক্রিয়া, তার প্রথম প্রতিক্রিয়া, অন্নদাশঙ্কর রায় এই বইটিকে নিয়ে একটি দীর্ঘ প্রবন্ধ লিখলেন শারদীয়া আনন্দবাজারে এবং বিভিন্ন জায়গায় পশ্চিমবঙ্গে এবং বাংলাদেশে লালনের দুই শত জন্মোৎসবের উদ্‌যাপনের বলা চলে, একটা হিড়িক পড়ে গেল। পশ্চিমবঙ্গে আমার আসার কথা ছিল বাউল দল নিয়ে কিন্তু রাজনৈতিক কারনে তখন হয়নি। এখানে অনুষ্ঠান হয়েছে, আমার আসা হয়নি। ড: অরুণকুমার বসু বাংলা আকাদেমিতে এখন আছেন, রবীন্দ্রভারতীর অধ্যাপক ছিলেন। তা আমার পঞ্চাশ পূর্তি উপলক্ষ্যে সুবর্ণরেখার আলপনা নামে একটি বই বের হয় তো, তাতে অরুন বসু আমার লালন চর্চা নিয়ে একটি প্রবন্ধ লিখেছিলেন, তাতে বইটির কথা উনি উল্লেখ করেছেন। এই বইটির সমাদর আমাকে উৎসাহিত করে এবং আমি তখন লালন নিয়ে মগ্ন হয়ে গেছি, বাউলদের সঙ্গে কাজ করছি, আমার বাড়িতে বাউলদের একেবারে ঘন ঘন যাতায়াত ... এরকম হচ্ছে আমার মা এদেরকে খুব ভালবাসতেন এবং আশ্রয় প্রশ্রয় দিতেন কোন ধরনের বিরক্তি তাঁর মধ্যে ছিল না, যদিও তখন তাঁর যথেষ্ট বয়স হয়ে গেছে। তিনি এদের সেবা শান্তির ব্যবস্থা করতেন। এরপর বলা চলে যে লালন সম্পর্কে দুই দেশেই আমার সম্পর্কে অনেকে জানেন এবং অনেকের সঙ্গে পরিচয় হয়। কারোর সঙ্গে সরাসরি, কারো সঙ্গে চিঠিপত্রে। যেমন এই বইটি সম্পর্কে যারা খুব উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছিলেন তারা সবাই আউল-বাউল সম্পর্কে অভিজ্ঞ তা নন বা এই বিষয় নিয়ে কাজ করছেন, তা নন, অন্য জগৎ-এর মানুষ। যেমন আমি বলি নটসূর্য অহীন্দ্র চৌধুরী কিম্বা শিশু সাহিত্যিক খগেন্দ্রনাথ মিত্র, কুমারেশ ঘোষ (যষ্ঠিমধুর সম্পাদক ছিলেন)। আরো অনেকে এরা আমাকে খুব উৎসাহিত করেন। আশুতোষ ভট্টাচার্যও ছিলেন আর আমাদের দেশে মনসুউদ্দীন, কবি জসীমুদ্দীন, ড: আহমদ শরীফ আর যাঁরা এই বিষয়ে কাজ করেছেন বা উৎসাহী তারাও আমাকে খুব প্রেরণা দেন।

পত্রিকা : এখানে একটা প্রশ্ন করি। এই বইটার অব্যবহিত পূর্বে যে বইটা বেরিয়েছে, সেটা মূলত আপনার কথা। আমি বইটা দেখিনি, কাজেই আমার পক্ষে বলা মুশকিল। কিন্তু তার আগে যা আপনার অভিজ্ঞতা শুনলাম ... সেটা হচ্ছে আপনি মূলত মৌখিক জীবনীগুলো বা ওদের বাউলদের কাছেই যে চটি বইগুলো আপনি সংগ্রহ করেছেন, জীবনীকার হিসাবে ... লালনের এই বইটিই হচ্ছে — আমরা মনে করি এটাই প্রথম authentic লালনের জীবনী, তা আপনি পরবর্তীকালে আবার যখন তিন volume ছেঁউরিয়া থেকে যেটা বেরিয়েছে, মৌখিক জীবনী শুদ্ধ সেটারও আপনি সম্পাদনায় সাহায্য করেছেন ... এই যে মৌখিক জীবনী থেকে আপনি যে actual ইতিহাস, সত্যনিষ্ঠ ইতিহাস রচনা করলেন এই যাত্রাটা কি রকম হয়েছে?

আহসান : এই বইয়ের বিষয় সম্পর্কে আমি একটু বলে নিই। লালন স্মারক গ্রন্থ আসলে একটি লালন সম্পর্কিত দুষ্প্রাপ্য প্রবন্ধের সংকলন। সেই সঙ্গে এমনি পরিচিত কিছু প্রবন্ধ আছে, যেমন আমিই প্রথম সকলকে জানালাম যে সরলা দেবী লালন এবং গগনকে নিয়ে একটি প্রবন্ধ লিখেছিলেন, তার গান সংগ্রহ করেছিলেন। সেটি ভারতী পত্রিকায় বেরিয়েছিল, তার আগে আর কেউ জানতেন না। আমিই প্রথম রবীন্দ্রনাথের সংগৃহীত লালনের গানের খাতার প্রতিলিপি ছাপি এই বইতে। তার আগে সেই খাতার চেহারা কেমন স্বচক্ষে যারা দেখেছেন তাঁরা ছাড়া কেউ জানতেন না। এই বইটির গুরুত্ব হয়তো এইভাবে ... যে লালন সম্পর্কে নতুন করে এক ধরনের উৎসাহ জাগল, ঔৎসুক্য জাগল। কেননা লালন সম্পর্কে আমাদের যারা শিক্ষিত সুধীজন, তাদের খুব বেশী একটা ভাল (বলা চলে) স্পষ্ট ধারণা ছিল না। লালনের গানও তখন যে খুব বেশী একটা বাইরে গাওয়া যাকে বলা হয় Media কিম্বা stage performance করা হত না, সীমিত সুযোগ ছিল। তা এই বইটি হয়তো লালন সম্পর্কে আমাদের আরো বেশী মনোযোগী করে তোলার পেছনে একটা ভূমিকা পালন করেছিল।

এর পর লালনের মৃত্যুশতবর্ষ ১৯৯০-এ হল, তখন আমাদের ঢাকার বাংলা আকাদেমী মূল প্রবন্ধটি পড়ার জন্য আমাকে আমন্ত্রণ

জানালেন। তখন সেই উপলক্ষ্যে লালন সম্পর্কে একটি বই লেখার জন্য ওরা বললেন, তা আমি লিখলাম এবং সেই বইয়ের বেশ কয়েকটি সংস্করণ প্রকাশ হয়েছে ...

পত্রিকা : সেই বইটির নাম কি ছিল?

আহসান : "লালন শাহ" সেই বই ... তখন আমাদের দেশে সামরিক শাসন চলছে, তো এই বই বেরোনোর সঙ্গে সঙ্গে একজন লালন গবেষক যিনি লালনকে একেবারে মুসলিম শরীয়ত পন্থী, সুফি দরবেশ বানাতে চান এবং তার অনেক গান বিকৃত করে ছেপেছেন, সেই প্রসঙ্গে পরে আসব ... তিনি বাংলা আকাদেমীতে চিঠি দিলেন যে অবিলম্বে এই বই প্রত্যাহার করা হোক আর তা যদি না হয় তা হলে প্রধান সামরিক প্রশাসকের কাছে তিনি অভিযোগ করবেন।

পত্রিকা : ইনিই কি তথাকথিত দুদ্দুশাহর লেখা দলিলটি উপস্থাপনা করেছিলেন?

আহসান : এটি অধ্যাপক মহম্মদ আবু তালিব এবং ওখানকার যে মৌলবাদীদের কাগজ তাতে, উপসম্পাদকীয়তে 'কাজীর দরবার' নামে ... (মানে) আমাকে একেবারে অকথ্য ভাষায় গালমন্দ করা হোল, আমি একটি ভিন্ন রাষ্ট্রের এবং ভিন্ন ধর্মের দালাল, এ সমস্ত বলা হল। তো যাই হোক, বাংলা আকাদেমী এই ব্যাপারটায় একটু চিন্তিত হয়ে পড়ল, যেহেতু তখন সামরিক শাসন চলছে। কিন্তু আমি আশ্বস্ত করলাম তাদের যে ওকে বলুন যে কোথায় কোথায় বইয়ের অসংগতি আছে এবং তথ্যের কোন সূত্র নেই বা সত্যের অপলাপ হয়েছে। আমি তাহলে সেই জায়গাগুলো সংশোধন করব অথবা তার সঙ্গে আলাপ করব। বাংলা আকাদেমী পরে খুব সাহসী ভূমিকা নিয়ে তাকে চিঠি দিয়েছিল এবং বলেছিল যে বাংলা আকাদেমী আপনার বইও ছাপতে অনিচ্ছুক নয়, আপনি পাণ্ডুলিপি পাঠালেই আকাদেমী যথারীতি পরীক্ষা করার পর মনোনীত হলে আপনার পাণ্ডুলিপিও ছাপাবে। আপনি আপনার পাণ্ডুলিপি পাঠাতে পারেন, আর এই বিষয়ে বাংলা আকাদেমী কোন লেখকের মতের স্বাধীনতার উপরে হস্তক্ষেপ করে না। সেই চিঠিগুলোর কপি পরে আমি সংগ্রহ করি ... এইটি একটি গুরুত্বপূর্ণ সময়ে লালন চর্চার দলিল হিসাবেও আমরা গণ্য করতে পারব।

পত্রিকা : এই বইটিতেই কি প্রথম অনুমান করা হল যে লালন কায়স্থ সন্তান হয়ে থাকতে পারেন?

আহসান : না, আমি নতুন কিছু আবিষ্কার করিনি, আমি লালনের জীবন সম্পর্কে নতুন তথ্য আবিষ্কার করিনি, করার কথাও নয়। আমি শুধু করেছি লালন সম্পর্কে প্রাচীন যে তথ্য, মুদ্রিত তথ্য সেগুলোকে আমি আবিষ্কার করেছি, সেগুলোকে আমি তুলে ধরেছি যেমন হিতকারী পত্রিকা ১৮৯০ সালে ৩১ অক্টোবর যে সংখ্যাটি বেরোল, ১৭ অক্টোবর লালন মারা যাওয়ার পর। সংখ্যাটিতে মহাত্মা লালন ফকির শিরোনামে একটি অস্বাক্ষরিত নিবন্ধ বের হয়। সেখানে বলা হচ্ছে যে লালন কায়স্থ সন্তান। তারও আগে, না, তার পরে মৌলবী আব্দুল ওয়ালি একজন sub-register ছিলেন কিন্তু পণ্ডিত মানুষ ছিলেন। তিনি Asiatic Society, Bombay-র Anthropological Society-র সঙ্গে যুক্ত ছিলেন এবং অনেক প্রবন্ধ তার বেরিয়েছে। তিনি তার প্রবন্ধে লিখলেন লালন সম্পর্কে যে "Known as kayastho"। এটা যতদূর আমি স্মরণ করতে পারি ১৮৯৮ সালে।

পত্রিকা : মানে লালনের মৃত্যুর পরে?

আহসান : মৃত্যুর পরে। লালনের মৃত্যুর পরে এই দুটি খুব গুরুত্বপূর্ণ, আর বিশেষ করে হিতকারী পত্রিকায়, মীর মোসারেফ হোসেন যার স্বত্তাধিকারী ও সম্পাদক ছিলেন, তার আগে লালন সম্পর্কে উল্লেখ পাওয়া যায়। আচ্ছা ... রবীন্দ্রনাথ কিন্তু বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের ছাত্রদের উদ্দেশ্যে যে ভাষণ দেন প্রসঙ্গক্রমে তিনি বাউল এবং লালনের কথা বলেন, সেই অনুলিপিটি প্রকাশিত হয় নবপর্যায়ের বঙ্গদর্শন পত্রিকায় সেখানে (তিনি) ... বলেছেন যে, তিনি শুনেছেন বা জেনেছেন যে লালন কায়স্থ সন্তান, কুষ্ঠিয়ার কাছে কোন এক গ্রামে তাঁর জন্ম ... তা আমি এই তথ্যগুলিই নতুন করে উপস্থাপন করেছি। যেগুলো অনেকে জানতেন না বা জানলেও এগুলিকে চাপা দিয়ে রেখেছিলেন। লালন সম্পর্কে একটি বিশেষ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য একটু আমাদের পিছিয়ে যেতে হয়। যে ৪৭-এর দেশভাগের পর আপনারা জানেন যে বাঙালি মুসলমানের মধ্যে দুটি ধারার সৃষ্টি হয়েছিল। একটি ছিল মৌলবাদী পাকিস্তানপন্থী

রক্ষণশীল ধারা আর পাশাপাশি ছিল আধুনিকতার অসাম্প্রদায়িক ধারা। তো যারা ওই রক্ষণশীল ধারার প্রবর্তক ও পৃষ্ঠপোষক, তারা কিন্তু লালনকে একটু নতুন করে, রবীন্দ্রনাথের প্রতিপক্ষ হিসাবে দাঁড় করাবার চেষ্টা করলেন।

পত্রিকা : কারা করলেন এটা?

আহসান : এটা করলেন যার কথা বললাম, আবু তালিব এবং পরবর্তী সময়ে তার অনুসারীরা। এমন কি সরকারি পর্যায়েও (আপনারা নাম শুনে থাকবেন) তখন আব্দুল মোলায়েম খান, আয়ুব খান যখন পাকিস্তানের রাষ্ট্রপতি তখন উনি পূর্ব পাকিস্তানের রাজ্যপাল ছিলেন। তারও উৎসাহ দেখা দিল লালন সম্পর্কে এবং ব্যাপারটা দাঁড়াল এমন যে, লালনের ওখানে একটি বড় ধরণের সমাধি সৌধ তৈরী করে ... আমাদের ওখানে লালন চর্চার আধিপত্য ছিল এই রক্ষণশীল ধারার যারা সমর্থক তাদের হাতে, সেজন্য এই বইটা বেরোতে ...

পত্রিকা : এই বইটা বেরোতে পালে বাঘ পড়লো?

আহসান : হ্যাঁ, এই বইটা এত প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে ... যে আমি আগেই বলেছি, লালনকে নিয়ে আমাদের ওখানে যারা কাজ করেছেন, বিশেষ করে মহম্মদ আবু তালিব, এস.এম. লুৎফর রহমান, খোন্দাকার বিয়াজুল হক, আনোয়ারুল করীম — এই এক ঘরানার মানুষ এবং এরা ...

পত্রিকা : আচ্ছা, খোন্দকার রিয়াজুল হক, যিনি পাঞ্জুশাহের জীবনী ...

আহসান : হ্যাঁ এবং এদের গ্রন্থ নামটি ... ওর একটি গ্রন্থ আছে "লালন শাহের পূণ্যভূমি হরিশপুর" বইয়ের নামটাতেই উনি প্রতিষ্ঠা করতে চাইছেন যে হরিশপুরই হচ্ছে লালনের জন্মস্থান। আমি হরিশপুরে পাঞ্জুশাহের অনুষ্ঠানে গিয়েছি, কিন্তু কোথাও এমন কোন নিদর্শন খুঁজে পাইনি যে লালন দেওয়ান বংশের সন্তান এবং যদি আপনারা মুসলমানদের কৌলিক পদবী বা উপাধি সম্পর্কে ধারণা রাখেন, তাহলে জানবেন যে দেওয়ান খুব সম্ভ্রান্ত এবং অর্থশালী পরিবারের উপাধি। তা সেই দেওয়ান বংশের একজন এত বড় বিখ্যাত মানুষ হয়ে যাওয়ার পর তার সম্পর্কে লোকের কোন ধারণা থাকবে না,

দেওয়ান বাড়ির কোন চিহ্ন থাকবে না, দেওয়ান বাড়ির কোন শারিক কিম্বা কোন বংশধর থাকবে না, এটি একটি অকল্পনীয় ব্যাপার। আর এরা এর সমর্থনে দুদ্দুশাহের একটা পুঁথি রচনা করেছেন। ওর সঙ্গে যারা যুক্ত ছিলেন, তার মধ্যে একজন এখনো বেঁচে আছেন এবং আমার খুব ঘনিষ্ঠ ফকির মনরঞ্জন গোঁসাই। উনি মাগুরাতে থাকেন এবং কবিরাজি চিকিৎসা করেন। তো মনোরঞ্জন গোঁসাইয়ের আমি একবার সাক্ষাৎকার নিই, তো তাতে উনি এই গোপন কথাগুলো ফাঁস করে দিয়েছেন। এটি আমি আহমদ শরীফকে চিঠি লিখে জানতে চেয়েছিলাম যে দুদ্দুশাহের পুঁথি সম্পর্কে আপনার কি মত, তো উনি পুঁথি বিশেষজ্ঞ, তাই কেন এই পুঁথি জাল এবং গ্রহণযোগ্য নয়, উনি আমাকে একেবারে এক, দুই, তিন, চার করে জানিয়েছিলেন। আমি আমার বইতে সেটা দিয়েছি। এর পরে আমার আরো অনেকগুলো বই বের হয়, যেমন পশ্চিমবঙ্গ থেকে সমাজ, সমকাল ও লালন নামে একটি বই বের হয়, ঢাকা থেকে সাঁই, প্রসঙ্গ ও অনুসঙ্গ, লালন সাঁই-এর সন্ধানে, লালন সাঁই তারপর ...

পত্রিকা : এগুলো সব নব্বই-এর দশকে ...

আহসান : নব্বই-এর দশকে এবং তার পরে, মনের মানুষের সন্ধানে তারপর লালন সমগ্র, যার কথা আপনি বলছিলেন ...

পত্রিকা : যে বইটা সাম্প্রতিকতম?

আহসান : এটা বেরিয়েছে রবীন্দ্রনাথ সংগৃহীত লালনের গানের পাণ্ডুলিপির পরে ...

পত্রিকা : না আমার প্রশ্নটা এই যে লালন সমগ্র, এই বইটির কাজ করতে আপনার কতদিন লেগেছে?

আহসান : এই কাজটি করতে আমার বহুদিন সময় লেগেছে ... বরুন এটি প্রকাশকের কাছে, মানে compose হওয়া এই বিষয়টিই দশ বছর লেগেছে। সেখানে আমি ধীরে ধীরে কাজ করেছি, যেহেতু আমি কুষ্টিয়ায় থাকি, আর ঢাকায় গিয়ে কাজ করতে হয়েছে। আমার সামনে একটা বড় challenge ছিল, যে লালনের প্রামাণ্য গানের সঙ্কলন করা। কেউ কেউ লালনের এক হাজার গান, কেউ ন-শো গান বের করে ফেলেছে ...

পত্রিকা : ছেঁউরিয়া আশ্রম থেকে যেটা বেরিয়েছে তিন খন্ডে, তাতে প্রায় আট-শো গান আছে।

আহসান : তার পরবর্তী সংস্করণে আরো বেশী। তা মন্টু শাহের সেই বই সম্পর্কে বলি যে উনি আমার খুব ঘনিষ্ঠ। তা আমাকে দিয়ে উনি তার ভূমিকা লিখিয়েছেন, সে ভূমিকাতে আমি কিন্তু বলেছি এবং আমি তার অন্তত দু-শো গান তাকে বাদ দিতে বলেছি যে এগুলো লালনের গান নয়। দুই একটা উদাহরণও আমি দেব তার মধ্যে। উনি সব বাদ দেননি, হয়তো একশো, সোয়াশো গান উনি বাদ দিয়েছেন। ওর ধারণা লালনের ভনিতা থাকলেই সেটি লালনের গান এখন তার প্রামাণিকতা নির্ণয়ের সূত্র কি হতে পারে? প্রথম কথা হচ্ছে যে লালনের আদি গানের খাতাগুলো, সেগুলো হচ্ছে প্রামাণ্য গানের সন্ধান। দ্বিতীয়ত, লালনের একটা নিজস্ব ভাব, ভাষা ও ছন্দ ছিল। তৃতীয়ত, লালনের কালে প্রচলিত নয় এমন বস্তুর বিবরণ যদি থাকে তবে বুঝতে হবে সেগুলো লালনের সময় রচিত নয়, উত্তরকালে রচিত। তারপরে আর একটি ঘটনা হচ্ছে যে বাউলদের ভিতরে একটা ধারণা প্রচলিত আছে, এটি গুরুবাদী ধর্ম তো, তাই নিজে গান রচনা করে অনেক সময় ভনিতায় গুরুর নাম দেওয়া হয় তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা নিদর্শনের জন্য। এরকম অনেক গান চলে এসেছে। আর কিছু গান আমাদের গবেষকরা তৈরি করেছেন।

পত্রিকা : যেমন, "এমন মানব সমাজ কবে গো সৃজন হবে ...'?

আহসান : এস.এম লুৎফর রাহমান এই গানটির প্রচার করেন এবং আমি তাকে সরাসরি ধরেছিলাম, তাকে বল্লাম, তো উনি আমাকে বল্লেন — হ্যাঁ, আমি তো বহু জায়গা থেকে গান সংগ্রহ করেছি, কার কাছ থেকে কোন ফকিরের কাছ থেকে সংগ্রহ করেছি তা তো আমি আর স্মরণ করতে পারছি না। আমি বল্লাম যে স্মরণ তো আপনাকে করতেই হবে, কারণ এই গানটি কোনো প্রাচীন সংগ্রহে নেই এবং এই গানটি নতুন ও অভিনব এবং আপনার মনে রাখা ও থাকা উচিৎ এমন একটি অনবদ্য মনোহর গান কার কাছ থেকে সংগ্রহ করেছেন। তা উনি তখন আমাকে বললেন যে সুকুর সাঁইয়ের আখড়ায় যে খাতা আছে, সেই খাতা থেকে সংগ্রহ করেছি। তা

আমি বল্লাম খাতাগুলো কোথায়? বল্লে যে, "আমি নিয়ে এসেছিলাম, আবার ফিরিয়ে দিয়েছি।" চড়চড়িয়া বলে একটি গ্রাম আছে, গ্রামীণ ডাকনাম হলো চড়ুই গ্রাম, এটি আমার বিশ্ববিদ্যালয়ের খুব কাছাকাছি...

পত্রিকা : এখানে কি লালনের একটি আখড়াবাড়ি ছিল?

আহসান : আখড়াবাড়ি ছিল। লালনের শিষ্য প্রশিষ্যরাও ওখানে ছিলেন। তো আমি সেই সুকুর সাঁইয়ের আখড়ায় গেলাম, আমার সঙ্গে ফকির আনোয়ার হোসেন মন্টু শাহ ছিলেন, যিনি লালন সঙ্গীত সংকলন করেছেন। তো গিয়ে দেখি ভাগ্যক্রমে, ওখানে যার সঙ্গে দেখা হল আব্দুল মান্নান ওনার নাম, শিক্ষক। সে পরিচয় দিল যে সে আমার প্রাক্তন ছাত্র এবং আমাকে দেখে খুব খুশী, আমাকে অত্যন্ত আদর-আপ্যায়ন করলেন। ওকে জিজ্ঞাসা করলাম যে লুৎফর রাহমান কি খাতা নিয়ে গিয়েছিলেন? বল্ল হ্যাঁ। ফেরত দিয়েছেন? বল্ল হ্যাঁ। আমি বল্লাম তুমি কি খাতাগুলো আমাকে দেখতে দেবে? তো সে এতই আপ্লুত ছিল যে বল্ল, স্যার, দেখতে দেবকি — আপনি নিয়ে যান। আমাদের কাছে এই সব লোকজন হামলা করে, ইয়ে করে ... আপনি নিয়ে যান। যখন প্রয়োজন হয়, যদ্দিন আপনার কাজে লাগে রেখে ... ইয়ে করুন ... তো সেই দুটি খাতা আমি নিয়ে এসে কোথাও এই গান পাইনি।

তো যাই হোক এইভাবে গান তৈরী হচ্ছে। লালনের গানের আসল নকল নির্ণয় করার সূত্রগুলো আমি বল্লাম এবং গান তৈরী হচ্ছে। যেমন লালনকে মুসলমান বানানোর জন্য তার একটি গান বিকৃত করা হয়েছে। যাদের কথা বল্লাম ওদেরই হাতে। "সব লোকে কয় লালন ফকির হিন্দু কি যবন, লালন বলে আমার আমি না জানি সন্ধান"। ওই একই ধরনের কথা উনি বলেছেন যে জাতপাতের বিরুদ্ধে নিজেকে মানুষ হিসাবে তিনি ওখানে উপস্থাপিত করেছেন। কিন্তু ভনিতার পংক্তিতে গিয়ে দেখা যাচ্ছে যে এদের সংগ্রহে আছে "লালন তেমনি খাতনার জাত একখানি"। খাতনা মানে হচ্ছে মুসলমানদের পুরুষাঙ্গের অগ্রচ্ছেদ করাকে খাতনা বলে।

পত্রিকা : সুন্নত?

আহসান : শুধু মুসলমানদের মধ্যে নয়, এটা ইহুদীদের মধ্যেও আছে, এমনকি জৈনদের মধ্যে একটা অংশের আছে ...

পত্রিকা : খ্রীষ্টানদের মধ্যেও একটা অংশের আছে ...

আহসান : আছে। এমনকি হিন্দুদের মধ্যেও এখন অনেকের খাতনা দিচ্ছে, এটা ইয়ের কারণে, মানে তাদের চিকিৎসকদের পরামর্শে এরকম হচ্ছে। এর সঙ্গে মুসলমানদের ধর্মের সম্পর্ক আছে, ইহুদীদের ধর্মের সম্পর্ক আছে, অন্যদের স্বাস্থ্যগত সম্পর্ক আছে। যে মানুষ জাত অস্বীকার করছে, ধর্ম অস্বীকার করছে, সে আবার কি করে বলতে পারে যে, আমি খাতনার জাত একখান। অথচ এই পাঞ্জু শাহ'র পুত্র খোন্দকার রফীউদ্দীন, উনি ভাবসংগীত বলে একখানা সংকলন করেছিলেন, সেখানে কিন্তু "লালন তেমনি জাত একখান" সেখানে খাতনা নেই, সবচেয়ে মজার কথা যে ফকির মহিন শাহ্ লালন ঘরানার একজন ফকির, লালনের চতুর্থ সিঁড়ির ফকির। ওর গানের একটা সংকলনও আমি করেছি, বাংলা আকাদেমী বের করেছে "মহিম শাহের পদাবলী"। তো তাকে আমি জিজ্ঞেস করলাম একদিন তখন আমার সঙ্গে ছিলেন এখন যিনি বাংলা আকাদেমীর মহাপরিচালক শামসুজামান খান, উনিও বিজ্ঞানী, বিশিষ্ট গবেষক। সারিন্দা বাজিয়ে মহিন শাহ গান করতেন। তো আমাদের বল্লেন, "দাঁড়ান বাবারা দাঁড়ান, আমি দেখি আমার সারিন্দা খাতনা নেয় কিনা।" বলে উনি সারিন্দা বাজিয়ে গানটি ধরলেন, গানটি ধরে শেষ অন্তরা দু-তিন বার করে গাইলেন তারপর গান থামিয়ে বল্লেন যে, "বাবারা আমার সারিন্দা তো খাতনা নেয়না।" সে অদ্ভুত অভিজ্ঞতা ... এটি যে আরোপিত ...।

লালনের আর একটি গান জাল গান। কিন্তু জনপ্রিয় গান — "গুনে পড়ে সারলি দফা করলি রফা গোলেমালে" — এই গানটির অন্তরায় আছে "বাবার হোটেল ভাঙবে যখন "হোটেলের ধারণাটি খাওয়ার কিস্বা থাকার। অত্যন্ত আধুনিক কালের। লালনের কালের নয় এবং আপনারা তা জানেনই তখন কলকাতার বাইরে থাকা, খাওয়ার হোটেল এর কোন সুযোগই ছিল না। লালনের সময় তো আরো আগে। জলধর সেন যখন Entrance পরীক্ষা দেন, মানে

প্রবেশিকা পরীক্ষা দেন। কুমারখালি M.N. High School-এর ছাত্র কিন্তু তাদের কেন্দ্র হল কৃষ্ণনগর, সেই বছর আবার D.L. Roy-ও পরীক্ষা দিলেন তা উনি খুব কষ্টে কখনো নৌকায় কখনো হেঁটে কখনো ঘোড়ার গাড়িতে, গরুর গাড়িতে করে কৃষ্ণনগরে এলেন। তখন রেল লাইন হয়নি, রেল যোগাযোগ স্থাপিত হয়নি এবং কৃষ্ণনগরে এসে উনি থাকার জায়গা পান না। তা একজন বল্লেন ভারী তো বিপদ তোমার, তা তুমি থাকবে কোথায় হে? আচ্ছা, ওই মোড়ে নদীতে বেশ্যাদের পল্লী আছে। ওখানে একজন বৃদ্ধা বেশ্যা আছে, তো ওর একটা ঘর খালি আছে, তুমি ওখানে থাকতে পার। পরীক্ষার সময়টুকু জলধর সেন সেই বেশ্যালয়ে থেকে Entrance পরীক্ষা দেন এবং পরে ওর আত্মজীবনীতে ভারী সুন্দর করে লিখেছেন ...

একেবারে পুরোপুরি না মিললেও কথাটা এরকম "যে বিদ্যা অর্জন করিতে আসিয়া অবিদ্যার ঘরে আশ্রয় গ্রহণ করিলাম।"

কৃষ্ণনগর তো বড় জায়গা, সেখানে তো আবাসিক হোটেল থাকার কথা ছিল? না থাকার কথা নয়। এই গানটায় বাস্তবজ্ঞান প্রয়োগ করলেই বুঝতে পারব যে গানটা আরোপিত। আর একটি গান আছে তার মাঝখান থেকে আমি বলছি। "ভুগেছিলাম পক্সো জ্বরে মলম শাহ উদ্ধার করে"। তো এই যে 'Pox' আমাদের ছেলেবেলায়, আপনাদের ছেলেবেলাতেও বসন্ত ছাড়া Pox কথাটি আসেনি, লালনের সময় Pox কথাটি কি করে এলো। এইভাবে আমি অনেকগুলি গান ইয়ে করেছি ... এবং আমাকে আমার বন্ধু, খুব ঘনিষ্ঠ বন্ধু ক্যারোল সলমন, নাম শুনে থাকবেন, আমি এবং ক্যারোল একসাথে কাজ করেছি এবং আমদের দুজনের যৌথ সম্পাদনায় লালনের গানের দ্বিভাষিক প্রামাণিক সংকলন করার কথাও ছিল। ও আমার বাড়িতে অনেকদিন ছিল, তো ১৩ই মার্চ সিয়াটলে সাইকেল চালিয়ে যাচ্ছে আর পিছন দিক থেকে একটি গাড়ি ওকে চাপা দেয়। দু-দিন হাসপাতালে ছিল, ১৫ই মার্চ ও মারা যায়।

পত্রিকা : বইটার কাজ কি তৈরী হয়ে গেছে?

আহসান : না, না, দুর্ভাগ্য যে সেটা হয়নি। ওর হাতের লেখা সব। সেই আমরা কিভাবে কাজ করবো এবং নামও দিয়েছিলাম। নামটা ওরই দেওয়া, 'আয়না মহল' কিন্তু হোল না, অসমাপ্ত থেকে গেল।

পত্রিকা : ক্যারোল দীর্ঘদিন সনাতনদার উপরেও কাজ করেছে।

আহসান : হ্যাঁ, ... তার কাছে দীক্ষাও নিয়েছিল, তো ক্যারোল পশ্চিমবঙ্গে বহুবার এসেছে, বহুকাল এখানে ওর যাতায়াত ছিল। বলা চলে লালন চর্চার খুব ক্ষতি হল, আমার ব্যক্তিগত ক্ষতি তো হলই। তো যাই হোক, ওর সঙ্গে আমি কথা বলেছি, ও এইভাবে আমাকে বলেছে যে এই গানগুলো সঠিক নয়।

পত্রিকা : সুরের দিক থেকে কি বিচার করেন কখনো?

আহসান : সুরের দিক থেকে তো অবশ্যই, যেমন অন্নদাশঙ্কর রায় যখন "লালন ও তার গান" লিখলেন, ওর ভূমিকাতেই দেখবেন যে আমার ওই 'লালন স্মারক গ্রন্থ' বইটি লেখার প্রেরণায় উনি একটি গান অন্তর্ভুক্ত করেছেন — "চাঁদের গায়ে চাঁদ লেগেছে, আমরা ভেবে করব কি"। তা আমি ওনাকে বল্লাম যে এই গানটি আপনি পরবর্তী সংস্করণে বাদ দেবেন। এটি লালনের গান নয়, আর সুরের তো অবশ্যই পার্থক্য আছে। যেমন বাউল গান প্রথম বিকৃত করার কৃতিত্ব মনে হয় পূর্ণদাস বাউলের। যখনই এই বিদেশে যাওয়ার ব্যাপারটা এল, আবার বাউলের পোশাক পূর্ণদাস যখন বিদেশে যাচ্ছে, তখন বাউলের কোন পোশাক পরে যাবে ... তাকে শিকাগোতে স্বামী বিবেকানন্দ যে পোশাক পরে গেলেন সেই পোশাক ... তাকে ধরিয়ে দেওয়া হল এবং উনি ওই পোশাক পরে ... এবং সেটি বাউলের পোশাক হল ... কিন্তু এটি বাউলের পোশাক না।

পত্রিকা : বাউলের পোশাক কিরকম ছিল?

আহসান : বাউলের পোশাক হচ্ছে সফেদ সাদা, খিড়কা একটা আজানুলম্বিত আলখাল্লা, এই হাতা কাটা এবং সাদা তহবন্দ মানে লুঙ্গি বা ধুতি এবং সেটা সাদা হতে হবে। কিন্তু এরা তো গেরুয়া পরে, এটা হতে পারে যে বাউলের স্কুল তো, আলাদা বাউলের স্কুল আলাদা। বীরভূম, বাঁকুড়ার আচার-আচরণ, কারণ মনে রাখতে হবে এই বীরভূম, বাঁকুড়া, বর্ধমানে বাউলদের উপর বৈষ্ণব প্রভাবটা খুব

বেশী পড়েছে। আবার পূর্ব বঙ্গের বাউলদের উপর সুফি প্রভাবটা বেশী পড়েছে, বৈষ্ণব প্রভাবও আছে। যেমন ওদের ভেক খেলাফতে দুটি গান গাওয়া হয় লালনপন্থীদের, একটি হচ্ছে যখন দীক্ষা নিয়ে প্রদক্ষিণ করে লালনের সমাধি সৌধ, তখন গাওয়া হয় — ''কে তোমারে এ বেশ ভূষণ পরাইল বল শুনি, জিন্দা দেহে মরার পোশাক খেলকা তাজ আর ডোর কৌপনী''। ভারি সুন্দর গান, আমি তো গাইতে পারিনা। তা না হলে গেয়ে শোনাতাম ... এরপর যখন ভেক খেলাফত দীক্ষা হয়ে, তারা ভিক্ষার জন্য গায় সেটা বৈষ্ণব ভাষাশ্রিত, ''আজ আমাকে কোপনী দে গো ভারতী গোঁসাই'' — এই গানটি এখানে অদ্ভুত সুফি প্রভাব এবং বৈষ্ণব প্রভাবটা যমজ ভ্রাতার মতন এখানে পাশাপাশি এসে মিশেছে। তো সেইজন্যে লালন সমগ্রের সঙ্গে একটি C.D দেওয়া আছে ... এই C.D.টি যখন আপনি শুনবেন আধুনিক কালের যারা mediaতে গান করেন, যারা C.D., Cassette বের করেছেন, তাদের গান শুনবেন, তখন বুঝতে পারবেন আদি সুরের সঙ্গে পার্থক্যটি কোথায় এবং পার্থক্য থাকতেই হবে, একাধিক কারণে। প্রথমত, mediaতে যখন গান করে তখন সময় একটা সীমিত থাকে যে তিন মিনিট, বা চার মিনিট, এর মধ্যে গানটি শেষ করতে হবে। আর বাউলের গানতো দ্রুত লয়ের নয়। একটা বিলম্বিত লয়ের গান, একটা গান দশ-বারো মিনিট ধরে চলে। সে জন্য সুরের পার্থক্য আছেই আর সেটি বোঝানোর জন্যই আমরা এই C.D.টি দিয়েছি। রবীন্দ্রনাথ ভারি চমৎকার কথা বলেছেন যে খাঁটি জিনিস প্রচুর হয় না, খাঁটির জন্য ধৈর্য্য ধরতে হয়, অপেক্ষা করতে হয়। তো খাঁটি বাউলও বেশি হয় না। খাঁটি বাউলের সুরও বেশী পাওয়া যায় না। এখন তো একটা প্রভাব গ্রামীন মানুষের উপরেও পড়েছে, সেটা Radio, Television-এর প্রভাব, ভদ্রলোকদের অনুষ্ঠানে বাউল এসে গান করছে তাদের একটা প্রভাব। সেই জন্য এই প্রভাবটা বাউলদের মধ্যে, বাউল শিল্পীদের মধ্যে আসছে। আর মনে রাখতে হবে বাউল শিল্পী এবং বাউল সাধক কিন্তু সমার্থক না।

পত্রিকা : বাংলাদেশের সাধক ফকিরদের কি অবস্থা, তারা কোথায় কিভাবে বেঁচে আছে?

আহসান : খুব প্রাসঙ্গিক এবং জটিল প্রশ্ন। বাংলাদেশে বাউলদের উপরে নিগ্রহ, নির্যাতন দীর্ঘকাল ধরে চলে আসছে এবং বাউলদের বলা চলে যে নানাভাবে সামাজিকভাবে ওদেরকে একঘরে করে রাখা হয় বা বাধ্য করা হয়। কিছু ধর্মীয় আচারকরণ পালন করতে হয়, যেমন বাউলের যখন দীক্ষা হয়, সে যদি মুসলিম সম্প্রদায়ের হয়, তার কিন্তু জানাজার আর কোন প্রয়োজন হয় না, কেননা যখন তার দীক্ষা হল তখনই ওই জানাজা হয়ে গেল, পরে আর কখনোই ধর্মীয় মতে তার শেষকৃত্য হবে না।

পত্রিকা : হিন্দু সন্ন্যাসীরাও নিজেদের শ্রাদ্ধ করে সন্ন্যাস নেয়।

আহসান : বাউলেরা মোটামুটিভাবে সাধক সম্প্রদায় এবং সঙ্গীত সম্প্রদায় হিসাবে ভাগ হয়ে গেছে। সঙ্গীত সম্প্রদায়, তারা সাধনার সঙ্গে যুক্ত নাও থাকতে পারে। সাধকদের মধ্যে এখনও সাধনার ধারাটি আছে এবং অদ্ভুত ব্যাপার। এটা একটা হুজুগও বলা যায়, আবেগও বলা যে যে ৬০-এর দশকে যেমন Hippie-রা সব ছেঁড়া কাপড় ময়লা দেহ নিয়ে সব বেরিয়ে এল শান্তির খোঁজে, আশ্রয়ের খোঁজে, তেমনি এখন ভদ্রলোকের সন্তানরা এই বাউলদের সঙ্গে মিশছে। কেউ কেউ দীক্ষা নিচ্ছে। এই উদাহরণটা অত্যন্ত বেশী আমাদের ওখানে। যেমন আমি কবীর হুসেন নামে একটি ছেলেকে জানি, আমাদের ওখানে সবচেয়ে প্রচারিত যে দৈনিক পত্রিকা, 'প্রথম আলো', সে তাতে কাজ করে এবং সে মুন্সীগঞ্জে একটা বাউল আশ্রম করেছে এবং প্রতি বছর দোল পূর্ণিমায় সেখানে সে অনুষ্ঠান করে। তো এইরকম অনেকে যাচ্ছে। কেন যাচ্ছে সে প্রশ্ন ব্যাখ্যা পরে, কিন্তু এইভাবে বাউলের সাধনা, বাউলের দর্শন, ধর্মমত এদেরকে আকৃষ্ট করছে। রূপান্তর হয়ে আমার ধারণা যে বাউল বেঁচে থাকবে। কিন্তু যথেষ্ট পরিমাণে তারা রূপান্তরিত হতে বাধ্য, সময়ের কারণে, প্রযুক্তির কারণে, জীবন যাপনের ধরণ-ধারণ পাল্টে যাওয়ার কারণে। তারা রূপান্তরিত হচ্ছে। কিন্তু মূল ধারাটি একটা চোরাবালির ভিতর দিয়েও যেমন একটা ক্ষীণ স্রোত বয়ে যায়, তেমনি বাউল সাধনার ধারাটি সেইভাবে বয়ে চলেছে এবং আমার ধারণা যে চলবে আর মানুষ যত জাগতিক কষ্টের মধ্যে পড়বে যতো ধর্মীয় বিভাজন শাস্ত্রকারের এই পীড়ন এবং উচ্চবর্ণ,

নিম্নবর্ণের ভেদাভেদ এবং ধনবৈষম্য এসব কিছুও মানুষকে একটা একটা বিকল্প জীবন-যাপনের পন্থা খুঁজে বের করার ব্যাপারে আগ্রহী করে তোলে এবং মানুষ যে কেবল গান শোনার জন্যই যায় তা না, তখন কিন্তু একজন শিক্ষিত তরুণও, গানের মর্ম খোঁজার ব্যাপারে আগ্রহী হচ্ছে। তো সে জন্য আপনি যে প্রশ্নটি করলেন, তারা এক অর্থে ক্ষয়িষ্ণু বটে কিন্তু রূপান্তরিত হয়ে তারা বেঁচে আছে এবং থাকবে।

পত্রিকা : বাংলাদেশের নতুন প্রজন্মের কাছে লালন কতটা গ্রাহ্য?

আহসান : এই সূত্রে আমি বলি বাংলাদেশ এখন লালনময়। উদাহরন হিসাবে, পদ্মার উপরে একটা বড় লোহার পুল ১৯১৩-তে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, তার পাশেই নতুন আরেকটি সেতু তৈরি হয়েছে, সেই সেতুর নাম দেওয়া হয়েছে লালন সেতু। লালনের নামে বিভিন্ন পণ্য চলছে, যেমন, লালন ছাতা, লালন হোটেল, এমনকি কিছুদিন আগে একটা চিত্র শিল্পের প্রদর্শনী হয়ে গেল এবং সেই প্রদর্শনীর থিম্ ছিল লালন। এবারে আমাদের নির্বাচনের আগে খুব বড় সম্মেলন করল তার থিম ছিল লালন, আমাকে ওরা আমন্ত্রণ জানিয়েছিল মূল বক্তব্য পেশ-এর জন্য। লালন এতটাই তরুণ প্রজন্মকে প্রভাবিত করেছে যে লালন চর্চা ছড়িয়ে পড়েছে। লালনের গান শেখার জন্য নানা জায়গায় প্রতিষ্ঠান তৈরি হচ্ছে। আমাদের দেশে ফরিদা পারভিনও একটি প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছেন 'অচিন পাখি' এই নামে। তো একমাত্র বাউল ঘরানার বাইরে ফরিদার গানকেই আমি গুরুত্ব দিয়ে থাকি, যেহেতু ফরিদা গান শিখেছে মক্সুদ আলি সাঁই-এর কাছে, আব্দুল করীম শাহের কাছে। তাই ওর আখড়াতেই ঘরানার সুরটা ওর কণ্ঠে আছে, ওই যে আধুনিকতার একটা ছাপ বা mediaতে গাইতে গেলে যে সীমাবদ্ধতা সেটি তাকে মানতে হচ্ছে। ও গানের স্কুল করেছে, আমার ধারণা যে তাতে অন্তত তরুণ প্রজন্মের যারা গান শিখতে চায়, তারা কথা ও সুরের মূলের কাছে ফিরতে পারবে।

পত্রিকা : কিন্তু একটা কথা বলুন, লালনের ভাবধারা মানে দর্শনটাও কি অতটা জনপ্রিয় হচ্ছে?

আহসান : এই প্রশ্নের জবাব অনেক দীর্ঘ কিন্তু আমি সংক্ষেপে বল্লে লালনের দর্শন দীক্ষিত জনের বাইরে প্রচারিত বা প্রসারিত হওয়ার সুযোগ নেই। লালন দু-ধরনের গান লিখেছে। একটা হলো সাধনার গান। আরেকটি হচ্ছে সাময়িক প্রসঙ্গে সাধনা করতে গিয়ে যে সমস্যার সম্মুখীন হয়েছে সেই প্রসঙ্গের গান। সামাজিক প্রসঙ্গের গান তরুণ প্রজন্ম কিম্বা সুধীজনকে আকৃষ্ট করেছে, এই জাত-পাতের বিরুদ্ধে কিম্বা সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে কিম্বা মহৎ জীবনের পক্ষে লালনের যে বক্তব্য সেগুলোকে গ্রহণ করেছে, যেমন আমি একটি গানের কথা বল্লে মনে হয় প্রাসঙ্গিক হয় — লালনের তো অনেক ব্যক্তিগত দুঃখ ছিল, অপূর্ণতা ছিল। কালবিরোধী ছিল বলে তিনি বিকশিত হতে পারেননি, এই যন্ত্রণা ছিল বুকের মধ্যে। তার একটি গানে আছে "পেয়েছি এক ভাঙ্গা নৌকা জনম গেল ছেঁচতে পানি, এদেশেতে এই সুখ হল আবার কোথায় যাইরে জানি" — এটা আক্ষেপের গান, খেদের গান। একেবারে নৈরাশ্যবাদী নন, তার সামনে একটি উজ্জ্বল আশা আছে। তার আরেকটি গান — "আমারে রাখিলেন সাঁই কূপজল করে আন্ধেলা পুকুরে, বসে আছি সেই ভরসা কবে হবে সজল বরষা" — যার নদী হওয়ার কথা ছিল বেগবান তরঙ্গে সুখের স্রোতে সাথী হওয়ার কথা ছিল, সে কিনা হয়ে রইল একটা কূপজল, কিন্তু লালন আশায় আছে কবে হবে সজল বরষা, বসে আছি সেই ভরসা, এই আশাবাদ নতুন প্রজন্মকে দিশা দিচ্ছে। কিম্বা ইহজাগতিকতা "এমন মানব জনম আর কি হবে, মন যা কর ত্বরায় করো এই ভবে ..." এই যে কথাগুলো এগুলো বুকের মধ্যে এসে ধাক্কা দেয় এবং দিচ্ছে, লালন প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠছেন এই কারণে, আর লালনের গানের সুর সম্পর্কে বা আবেদন সম্পর্কে আরো বেশী বলতে পারবেন যারা গানের সঙ্গে সরাসরিভাবে সম্পৃক্ত। বাউল গানের ভিতরে একটা একঘেয়েমিপনা আছে, দেখবেন যে সব গানেরই এক সুর, এক কথা, এক বাণী। ওই যে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন যে বৈরাগী দলের প্রচারক গিরি দলভুক্ত করার জন্য আহ্বান এই, লালনের গানের মধ্যে আমরা দেখব সুরের একটা বৈচিত্র আছে, আমার কানটা বলে দিচ্ছে। আমি বিশ্লেষণ করতে পারব না, যেমন দুই একটি গানের

কথা যদি সুরে উল্লেখ করি তা হলে বুঝব, যেমন — ''মিলন হবে কতদিনে, আমার মনের মানুষের সনে'', আর একটি গান পাশাপাশি যদি আমরা স্মরণ করি, ''যেখানে সাঁইয়ের বারামখানা, শুনিলে মন চমকে ওঠে দেখতে যেমন ভূজঙ্গনা'', আরেকটি জিনিস আমাকে বিস্মিত করে। আমিও সাহিত্যের ছাত্র, সেই দিক থেকে, বা কবিতার অনুরাগী, গানের অনুরাগী। আপনাদেরকেও নিশ্চয় বিস্মিত করবে যে লালন গানের শব্দ ব্যবহার আর ছন্দের যে একটা নতুন বাঁধুনি, সেই নিটোল বাঁধুনির কথা রবীন্দ্রনাথ স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছেন এবং তার শব্দ ''বাড়ির কাছে আরশিনগর, সেথা এক পড়শী বসত করে'' — এই গানের শেষ কলিতে আছে, ''সে আর লালন একখানে রয়, তবু লক্ষ যোজন ফাঁক রে''। এখানে দূরত্বজ্ঞাপক যোজন শব্দটি, মাইল বলুন, ক্রোশ বলুন দূরত্ব জ্ঞাপক কোন শব্দ আর ওখানে কিছুই খাটবে না। লালনের আর একটি ব্যাপার — জীবনানন্দের বনলতা সেন-এর ওই বিখ্যাত পংক্তির কথা স্মরণ করুন — 'পাখির নীড়ের মতো চোখ তুলে নাটোরের বনলতা সেন''

পত্রিকা : লালন বলেছেন ''আঁখির কোনে পাখির বাসা''

আহসান : এই যে আপনার অন্তরে এই সাদৃশ্যটা এসে গেছে। ১০০-১৫০ বছর আগে লালন বলেছেন ''আঁখির কোনে পাখির বাসা'', তা হলে জীবনানন্দ যদি আধুনিক হন, কালের বিচারে লালনও আধুনিক।

আর একটি গানে আছে — ''পাপ পূণ্যের কথা আমি কারে বা শুধাই''। পাপ পূণ্য যে সামাজিক অবস্থার কারণেই এক এক দেশের এক এক আচার-আচরণ প্রচলিত ধর্মের কোন সম্পর্ক নেই, যে হিন্দু গরু খেতে নারাজ, মুসলমান শুকর খেতে নারাজ, আবার যীশুর চেলা সে দুটোতেই আগ্রহী। ''শুকর গরু দুইটি পশু খাইতে বলেছেন যীশু'' তা এই ব্যাপারগুলো যুক্তিবাদী লালনের গানে এসেছে। মুসলমানদের ধর্মীয় বিশ্বাস আসমানি কেতাব চারটি, তো লালন তার গানে কি বলেছেন, ''একেক দেশে একেক বাণী পাঠায় কি সাঁই গুণমনি, এসব মানুষের রচনা জানি লালন ভেবে কয়''। আজকের দিনে কোন মানুষ সমাজে দাঁড়িয়ে এই কথা বল্লে কি

অবস্থা দাঁড়াবে তার ... কিন্তু লালন বলেছে , লালন প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মকে এত অগ্রাহ্য করেছেন, কি হিন্দু কি মুসলমান — উভয় সম্প্রদায়ের তুলনা দিয়ে তিনি বলেছেন। নামাজ সম্পর্কে বলেছেন যে নামাজ পড়া হল না লালনের। কেন হল না বলছেন, ''মুর্শিদ বর্জক সামনে খাড়া, সেজদার সময় থুই কোথায়'' নামাজ পড়ার সময় সামনে যদি কোন বস্তু বা কোন মানুষ থাকে তাহলে নামাজ পড়া হয় না, কিন্তু নামাজ পড়তে গিয়ে দেখে তার মুর্শিদ, গুরু সামনে দাড়িয়ে। আর হজ করা সম্পর্কে বলছেন — ''দিল কাবাতে হজ কর''। এইরকম তার আরো গানের মধ্যে পাওয়া যাচ্ছে মেহ্‌রাজ, যেখানে আমাদের রসুলাল্লাহ, সাল্লেল্লাহু ইসলাম যিনি ... মেহরাজ হচ্ছে যখন তিনি আল্লার সাথে মিলিত হন, তো সেখানে লালন প্রশ্ন তুলছেন যে — নিরাকার নিরূপ খোদার সঙ্গে সাকার মানুষের মিলন হয় কি করে! তারপরে বেহেস্তের (স্বর্গের) কথা বলছেন ''শুনি মনে পাব বেহেস্থখানা'' — সেখানেও তিনি সংশয় প্রকাশ করছেন, আবার রোজ কেয়ামত, মহাপ্রলয় লালন বলছেন যে রোজ কেয়ামত হচ্ছে হবে, সবাই বলছে কিন্তু তারিখ নির্ণয় করে তো কেউ বলেনা। মনে রাখতে হবে আমাদের এই কথাগুলো যিনি বলছেন, তিনি কিন্তু আজ থেকে আড়াই শো বছর আগে বলছেন। আজকে আমাদের মতন লেখাপড়া শিখে আলোকিত মানুষ তিনি হননি। তিনি স্বশিক্ষিত ছিলেন, আমাদের শিক্ষিত মানুষ কত কপট এবং কত নির্লিপ্ত নিম্নবর্গের মানুষের প্রতি এবং তার একটা প্রধান দৃষ্টান্ত হচ্ছে লালন। রামমোহনের সঙ্গে তার বয়সের হেরফের দু-বছরের, রামমোহন ১৭৭২ মতান্তরে ১৭৭৪, হলে একই হয়ে যায়। তো রামমোহনের ভেতরে আমরা দেখলাম, কলকাতা মহানগরীকে কেন্দ্র করে একটা সামাজিক আন্দোলন গড়ে তুললেন এবং যে বাঙালি হিন্দু সমাজের এবং তার যে সংস্কার এবং তার যে প্রথার দাসত্ব থেকে মুক্ত করার চেষ্টা করলেন। আলোকিত একটা বিচ্ছিন্ন দ্বীপের মতো। ইয়োরোপীয় শিক্ষায় শিক্ষিত ব্রাহ্ম সমাজের পরবর্তীকালে ব্রাহ্ম সমাজের অনুসারী যারা হয়, তাদেরকে নিয়ে একটা আলাদা সম্প্রদায় গড়ে তুললেন। তার সামাজিক অভিমত নিঃসন্দেহে হয়েছিল, কিন্তু পাশাপাশি যে মানুষটি

একেবারে অজ্ঞানতা পীড়িত গ্রামীন মানুষের ভিতরে চেতনা জাগালেন, যেখানে অমতটা আরো বেশী তার বিরুদ্ধে এসেছিল, তার কোন মূল্যায়ন হল না। ওনার সঙ্গে রামমোহনের তুলনা করা হল না, তুলনামূলক আলোচনা হল না। শুধু লালন ভোলা-বাউল ছিল! আপনারা তো জানেন যে ঠাকুর জমিদারদের লাঠিয়ালদের বিরূদ্ধে কাঙাল হরিনাথকে রক্ষার জন্য একতারা ফেলে লাঠি নিয়ে দাঁড়িয়েছিলেন। সামাজিক ভূমিকা পালন করেছেন তো। আমাদের মূল কথা হচ্ছে যে আপনি যে মূল প্রশ্নটি করেছিলেন, তরুণ প্রজন্মের কাছে লালন কতটা প্রযোজ্য — সামাজিক ভূমিকার জন্য লালন কিন্তু বেশী মান্যতা পাচ্ছেন এবং পাশাপাশি লালনের গানের যে বৈচিত্র, যে আবেদন সেই কারণে সাধনার ব্যাপারটি এখানে খুব গৌণ হয়ে যাচ্ছে আর বিদেশ থেকে যাঁরা আসছেন তারাও, আপনারা জানেন যে 'UNESCO' বাউল গানকে আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি দিয়েছে, যেমন আমাদের ২১শে ফেব্রুয়ারি ভাষা আন্দোলনের ওই দিনটি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস। তো বাউল গানকে বলছে Intangible heritage of humanity — এই যে স্বীকৃতি এ তো লালনের গানকে সামনে রেখেই বলা।

পত্রিকা : মারফতি ধর্মের যে গুরু শিষ্যের সম্পর্ক, যে ভালোবাসা, সেটা সম্পর্কে আপনি একটু বলুন, মানে গুরু যে ঈশ্বরের সমান ...

আহসান : গুরু ঈশ্বরের সমান নয়। গুরুই ঈশ্বর এবং বাউলের কাছে গুরু শিষ্যের মানে বাউল ধর্মের মতবাদে এমন জিনিস আছে যে গুরু কিন্তু শিষ্যকে ভক্তি দেবে। শিষ্যও যেমন ভক্তি দেবে ...

"ভক্তের দ্বারে বাঁধা আছেন সাঁই"। আর একটি ব্যাপার যে এটি তো গুরুবাদী ধর্ম — যেমন সুফীদের মধ্যে আছে হাফিস পারস্যের কবি, হাফিস তার একটা দিওয়ান-এ বলেছেন ভারি চমৎকার কথা। ফারসী এবং উর্দূ জানি না বলে আমার মধ্যে ভারি বেদনা আছে। হাফিস বলছেন যে গুরু মুরশিদ যদি তোমাকে নির্দেশ করে তা হলে শরাব দিয়ে জায়নামাজ লাল করে দাও। তো এখানে শিষ্যদের সঙ্গে গুরুর যে সম্পর্ক তা আত্মিক সম্পর্ক। লালনের গানেই পাওয়া যায় — "গুরু তুমি তন্ত্রের তন্ত্রী, গুরু তুমি মন্ত্রের মন্ত্রী, গুরু তুমি যন্ত্রের

যন্ত্রী। না বাজালে বাজবে কেনে, গুরু সুভাব দাও আমার মনে।" গুরুই সব কিছু, গুরু ছাড়া আর কিছু নেই, গুরু ছাড়া পৃথিবী নেই, গুরু ছাড়া ঈশ্বর নেই, বাউলের গুরু ছাড়া ভজনা নেই। এখানে গুরু শিষ্যকে কিন্তু পরীক্ষাও করেন হঠাৎ করে দীক্ষা দেন না, ভেক খিলাফৎ দেন না, অনেকদিন ধরে তাকে গড়ে তোলেন এবং যখন সে যোগ্য হয়ে ওঠেন, তখনি তাকে খিলাফৎ দেয়।

পত্রিকা : "গুরু আমারে কি রাখবেন করে চরণ দাসী" — যদি এই গানটা একটু ব্যাখ্যা করেন। এই যে লিঙ্গের পরিবর্তন, নিজেকে দাসী হিসাবে দেখছেন দাস হিসাবে নয়।

আহসান : এখানে লালন নিজেকেই দাসী বলছেন, বাউল তত্ত্বের মধ্যে একটা ব্যাপার আছে রসুল গুপ্ত জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন, সেই গুপ্ত জ্ঞান দিয়ে যান তার কন্যা হজরৎ ফতেমাকে, তাই ফতেমা সেই গুপ্ত জ্ঞানের অধিকারী। এবং লালনের গানে দেখবেন যে নারীর একটা মাহাত্ম্য এবং নারীর গুরুত্ব "মায়েরে ভজিলে হয় তার বাপের ঠিকানা" — এই যে ব্যাপারটা কত বড়, যে সমাজ নারীকে স্বীকৃতি দেয়নি, নারী সংসারের প্রতিপালন, সন্তান উৎপাদন-এর বাইরে তার কোন ভূমিকা নেই ... সেই নারীকে কত বড় একটা স্বীকৃতি লালন দিচ্ছে। আমি আলাদাভাবে লিখেছি লালনের নারী ভাবনা নিয়ে।

পত্রিকা : এই যে যুগল সাধনার ব্যাপারটা, এটা তো আর কোন ধর্মে আছে বলে, আমার চোখে পড়েনি।

আহসান : মরমী সাধনায় যুগল সাধনা আছে।

পত্রিকা : 'আদম সফী' — এই শব্দ বন্ধটার ব্যাখ্যা আমি দুটো প্রসঙ্গে জানতে চাই। একটা গান আছে, "জানতে হয় আদম সফী আদ্য কথা" — এখানে কি আদম ও ঈভ-এর কথা বলা হচ্ছে? আর দ্বিতীয়তো, "আমার মুর্শিদ বিনে কি ধন আর আছে রে মোর এ জগৎ-এ"— এ গানটার শেষ অন্তরাটা হচ্ছে "আপনি আল্লা আপনি নবী আপনি হন আদম সফী" — এই দুটো প্রসঙ্গে "আদম সফী"-এর অর্থ কি আলাদা আলাদা।

আহসান : আচ্ছা আমি বলি ... তার আগে বলি, লালন তার গানে খুব স্পষ্টভাবে বলেছেন, "খুলবে কেন সে ধন ও তার গাহক বিনে ..."

আসলে গুরুবাদী ধর্মের রহস্যের কথা সব আমরা ভালোভাবে বুঝতে পারি না। আবার একটু চেষ্টা করলে অনায়াসে ভুল বুঝতে পারি। তো সেই জন্য আপনি যে প্রসঙ্গগুলো উত্থাপন করলেন তা এতটাই গভীর এবং এতটাই উচ্চাঙ্গের যে, এর জবাব আমি যা দেব সেটা খুব পোশাকি জবাব হবে। এবং তা আপনাকে তৃপ্ত নাও করতে পারে। যেমন ক্যারোল সলমন একদিন আমাকে জিজ্ঞেস করলো যে লালনের একটি গানে আছে যে, যিনি প্রকৃত ফকির হন তিনি 'আঁচির' করিবেন না। তো এই আঁচির কথার অর্থ কি? ও অনেককে জিজ্ঞেস করছেন, ফকিরদেরও জিজ্ঞেস করেছেন, তো কারোর জবাবে উনি তুষ্ট হননি। তো আমি বললাম, দেখ আমি এতটুকু বুঝি যে দীক্ষা লাভের পর বাউলের জন্মের দ্বার বন্ধ হয়ে যায়, সে আর সৃষ্টি করতে পারবে না। কিন্তু পাঞ্জু শাহ সৃষ্টি করেছিলেন বলে তাকে খারিজ করে দেওয়া হয়েছিল ফকিরের দল থেকে।

পত্রিকা : পাঞ্জু শাহ কি লালন পন্থী?

আহসান : না উনি লালন পন্থী নন, লালন অনুরাগী। লালন তাকে স্নেহ করতেন এবং লালনের ভাবধারা তার উপর একটি ছায়া ফেলেছিল। কিন্তু উনি লালনের শিষ্য নন। লালনের ভাবশিষ্য বলা যায়। তবে ফকিরের ঘর থেকে তাকে খারিজ করে দেওয়া হয়, তাকে একঘরে করে দেওয়া হল কেননা তার দীক্ষালাভের পর সন্তান জন্মগ্রহণ করল এবং এটি বাউলের জীবনে একটি অবাঞ্ছিত ঘটনা। বাউলের সাধন জীবন নিয়ে আমাদের অনেক কথা আছে, যা আমরা আন্দাজে বলি, যেমন আমি দু-একটি কথা গবেষকদের সম্বন্ধে বলতে পারি, কিন্তু এপারে, ওপারে যারা কাজ করেন তাঁরা আমার খুব ঘনিষ্ঠ তবুও তো সত্যের খাতিরে কিছু কথা বলতে হয়, যেমন সুধীর চক্রবর্তী, তিনি আমার খুব ঘনিষ্ঠ জন। তাঁর 'ব্রাত্য লোকায়ত' লালন আমাকেই উৎসর্গ করেছিলেন। ওই বইয়ের flap-এ লালন সম্পর্কে এমন আপত্তিকর এবং অশ্রদ্ধার কথা বলা হয়েছে যে লালন হিন্দু না মুসলমান, নাকি জারজ সন্তান। ভাবা যায় যে শিক্ষিত বিদগ্ধ জনের লালনের পরিচয় সম্পর্কে কি অশ্রদ্ধা এবং

হতে পারে সে হিন্দু, মুসলমান, বুদ্ধ না খ্রীষ্টান না কি অন্য কিছু ... কিন্তু জারজ শব্দটার ব্যবহার কেন আসবে? তা হলে আমরা কি কোন শিক্ষিত জন সম্পর্কে যার জীবনের সঠিক তথ্য পাওয়া যাচ্ছে না, তার সম্পর্কে আমি এই মত পোষণ করব যে সে জারজ?

পত্রিকা : আমরা যদি আদম সফীর প্রসঙ্গটায় ফিরে আসি ...

আহসান : আদম সফীর আদ্য কথা এখানে মানব জন্মের যে রহস্য সেই রহস্যের কথাই বলা হচ্ছে, আদম এখানে কোন ব্যক্তির নাম নয়, আদম একটি প্রতীক। একানে প্রকৃতি মানে রমনী নয়। এটা মানব জন্মের যে সূত্র, সেই সূত্রটি বাউল তার নিজের মতো করে বলতে যাচ্ছে, তারপর আপনি দেখবেন যে নানাভাবে মানব জন্মের যে কথাগুলো যে সাঁই ডিম্বুভরে ভেসেছিলেন ... তা না এই কথাগুলোর ভেদ ভাঙ্গার মতো জ্ঞান আমার নেই, এবং সেটা বাউলদের মতের সাথে মিলবে তা নাও হতে পারে।

আমি আগেও বলেছি এবং কখনো কখনো মনে প্রশ্ন জেগেছে যে লালনের উপরে তো বৌদ্ধ সহজিয়ার একটা প্রভাব বহমান। যে ধারা তার ভেতর থেকে এসেছে, লালন কোন কোন ক্ষেত্রে সংশয়বাদী ছিলেনই, এ ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই, কিন্তু আমার মতে লালন নাস্তিক্যবাদে বিশ্বাস করতেন, এরকম আমার কিন্তু মনে হয়েছে। যদি তা না হয়, তিনি কিন্তু সৃষ্টি কর্তাকে এ ভুবন সৃষ্টি করেছেন ... তাকে দেখা যায় না, যাকে স্পর্শ করা যায় না — তেমন একজনকে কিন্তু তিনি স্বীকার করছেন না। তিনি বলছেন যে তার গুরুই এগুলো করেছেন এবং তার গুরুকেই সেই সৃষ্টিকর্তা হিসাবে তিনি মান্য করছেন বা তার গুরুর ভিতর দিয়েই সে সৃষ্টিকর্তার অস্তিত্ব তিনি অনুভব করতে পারছেন, উপলব্ধি করছেন। এখানে মনরঞ্জন গোঁসাই আমাকে ভারি চমৎকার একটি ব্যাখ্যা দিয়েছিলেন, উনি বলছেন আসলে লালন যে রসুলের কথা বলছেন, যে নবীর কথা বলছেন, তিনিই ইসলামের নবী অথবা রসুল এ কথাটি কেন ভাবছেন আপনি, আমি একটু বিস্মিত হয়ে গেলাম। এটা ফকির নিজাম শাহের বাড়িতে বসে নানান প্রসঙ্গে কথা বলতে গিয়ে এই ব্যাপারটি উনি বললেন, এবং উনি বারবার বলার চেষ্টা করছেন, সব আপনারা আক্ষরিক অর্থে নিচ্ছেন কেন?

হ্যাঁ একটা inner meaning তো বাউলের গানে আছে, ব্যক্তি নামেও বা ব্যক্তি পরিচয়েও একটা inner meaning আছে, যেমন চৈতন্যের কথা আছে, নিমাইয়ের কথা আছে। বা এমনি তার কৃষ্ণতত্ত্বের গানগুলো। বা বৈষ্ণব ভাবের যে গানগুলো, সেখানে এমন কিছু গান আছে যেগুলো আসর মাতানো গান "কেন দেশান্তরী হলিরে নিমাই" — এগুলো খুব সাধারণ গান, আমি মনে করি, কিন্তু এর মধ্যে একটা মানবিক আবেদন আছে যে, "ঘরে রইল বিষ্ণুপ্রিয়া তারে তুমি রেখ বুঝাইয়া, নিতাই এসে দেবে জল ঢালিয়া হবে প্রশমন" — তা এই গানটি খুব সাধারণ একটা গান, যে কোন একটা পদাবলী কীর্তনে খুঁজে পাওয়া যাবে বহু মহাজনের পদে আছে ...

কিন্তু এর ভেতরে একটা প্রচ্ছন্ন অভিযোগ চৈতন্যের প্রতি আছে, সেখানে শচীমাতা বলছেন যে তাহলে তুমি পরের ঘরের মেয়েকে কেন আনলে, আমি তাকে কি বুঝ দেব, কি জবাব দেবো। এখানে তার নিজের সন্তান হারানোর বেদনা তো আছেই কিন্তু তার থেকে বেশী ছাপিয়ে উঠেছে বিষ্ণুপ্রিয়ার জন্য তার বেদনা। এখন যে বা যারা আপনাকে অভিযোগ করে যে বাউল গান, লালনের গান নারীবাদী চেতনার বিপক্ষের গান, তাদেরকে আপনি জিজ্ঞাসা করবেন যে শচীমাতার এই যে আক্ষেপ, অভিযোগ আকারে উত্থাপিত, সেটি কি? আসলে আপনার সব প্রশ্নের জবাব দেওয়া আমার পক্ষে অনুচিত এবং অসাধ্যও, এই কারণে যে আমার মতো করে আমি বলবো, সেটি বাউলের জবাব হবে না, আমার ধারণার জবাব হবে বা বাউলদের সঙ্গে মিশে যতটুকু জানতে পেরেছি ...

আমি দুই একটি মন্তব্য কয়েকজন সম্পর্কে করবো যারা লালন নিয়ে কথা বলেছেন। সুধীর চক্রবর্তী সম্পর্কে আমি বলেছি যে লালন সম্পর্কে বলতে গিয়ে লালন হিন্দু না মুসলিম সেই প্রশ্ন উঠতেই পারে, কিন্তু কেন এই কথাটি উঠালো যে লালন জারজ? নবীন কুমারের জন্ম নিয়ে ... "সেই সময়"-এ সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়কে অনেক জবাবদিহি করতে হয়েছিল। সেখানে নবীনকুমার যে কালীপ্রসন্ন সিংহ এটা বুঝতে বাকি থাকে না কারো। কিন্তু তার জন্মের যে ইতিহাস সেটি গ্রহণযোগ্য হয়নি।

কিন্তু এখানে লালনকে সরাসরি আঘাত করা হচ্ছে এবং আমি মনে করি এটি একটি প্রতিবাদযোগ্য বিষয়। আর একটি জিনিস হচ্ছে যে মানুষ যদি একটু বিবেচনা করে কথা বলেন তা হলে ভালো হয়। আমার খুব ঘনিষ্ঠজন সনৎকুমার মিত্র, লালনের উপর ওঁর একটি বই আছে, 'লালন ফকির — কবি ও কাব্য'। তাতে তিনি লালনের গানের খাতা ব্যবহার করেছেন। রবীন্দ্রনাথ যে খাতা সংগ্রহ করেছিলেন। এবং উনি মন্তব্য করছেন যে লালনের এই দুটি খাতার বাইরে আর যে সব গান আছে তাঁর দৃঢ় সিদ্ধান্ত হচ্ছে মানে উনি এরকমভাবে লিখেছেন যে সে সব গান হচ্ছে, সব জাল গান, নকল গান।

পত্রিকা : মানে ওই খাতার বাইরে যে গানগুলি আছে!

আহসান : কিন্তু রবীন্দ্রনাথ যে ২০টি গান হারামনি বিভাগে ছাপলেন, তার মাত্র আটটি গান এই খাতা থেকে নেওয়া, তাহলে ১২টি গান জাল, রবীন্দ্রনাথ জাল গানের কারবারি ছিলেন। বা যে গান নিয়ে আমাদের সন্দেহ আছে এবং আমি সংশয় প্রকাশ করেছি, সেটা ক্ষিতিমোহন সেনের সংগ্রহের গান ...

পত্রিকা : এটা উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্যও করেছেন।

আহসান : তো সেই গানগুলো, যেমন আপনারা আরেকটা সূত্র জানেন না, উপেন বাবুতো অনুমান করেছিলেন, আর কবি জসিমুদ্দীন রবীন্দ্রনাথকে সরাসরি এই অভিযোগটি করেছিলেন, তো সেখানে রবীন্দ্রনাথ স্বীকার করেছেন ...

পত্রিকা : হ্যাঁ, প্রশান্তচন্দ্র মহালনবিশের বাড়িতে বসে কথা হচ্ছিল জসিমুদ্দীনের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের, সেখানে জসিমুদ্দীন বলেছেন যে 'মানস-মুকুল' গ্রামীণ কবিরা লিখছেন, তাহলে আপনি কি করলেন, এরকম গোছের কিছু কথা বলেছেন, তখন উনি বললেন হ্যাঁ, ঠিকই তো ... জসিমুদ্দীন বললেন, তা আপনি কিছু বল্লেন না, এরকম গান সংগ্রহ হয়ে যাচ্ছে ... হ্যাঁ এটা তো করা উচিত কিন্তু আমার পক্ষে তো এটা করা সম্ভব নয়, এটা তোমাদেরই করতে হবে, কিন্তু এরকম ঘটনা তো বারে বারে ঘটছে। এই যে দীনেশবাবুর ময়মনসিংহ গীতিকা নিয়ে যেটা হয়েছে ... তখন প্রশান্তচন্দ্র মহালনবিশ বলেন আপনি ক্ষিতিমোহন সেন সম্বন্ধে লিখুন আর

জসিমুদ্দীন দীনেশ সেন সম্বন্ধে লিখবে এবং পরে সেটা প্রকাশিত হবে, কিন্তু সেটা আর লেখা হয়ে ওঠেনি।

আহসান : রবীন্দ্রনাথের সৌজন্যবোধ তো অপরিসীম ছিল আর ক্ষিতিমোহন সেনের প্রতি তাঁর একটা দুর্বলতা, নির্ভরতা ছিল আর ক্ষিতিমোহন কবীর, দাদূ — মানে একেবারে মধ্যযুগের সন্ত সাধকদের বাঙালি সমাজের সাথে পরিচয় তিনিই করিয়েছেন। তো সেই গান সম্পর্কে আমাদের ঘোরতর সন্দেহ সংশয় আছে। আর হ্যাঁ, জসিমুদ্দীন রবীন্দ্রনাথকে এই কথা বলায় রবীন্দ্রনাথ স্বীকার করেছিলেন যে, এই গানগুলো সম্পর্কে তিনিও নিঃসন্দেহ নন, তবে তিনি ক্ষিতিমোহন দুঃখ পাবেন বলে এ বিষয়ে কিছু বলতে চান নি।

পত্রিকা : শক্তিনাথ ঝা সম্পর্কে আপনি কি যেন বলছিলেন?

আহসান : শক্তিনাথ ঝা যে খাতা ছেপেছেন, লালন ফকিরের গান মনে হয় কবিতা পাক্ষিকে একটা সংখ্যায় বেরিয়েছিল। তাতে তিনি বলেছেন যে রবীন্দ্রনাথ এই খাতাটি ব্যবহার করেছিলেন। একটি জিনিস সহজে বুঝবেন যে উনি যে প্রতিচিত্র ছেপেছেন তার information-এ কিন্তু লেখা আছে songs of Lalan Fakir collected by Rabindranath Tagore, ব্র্যাকেটে জিজ্ঞাসা চিহ্ন সে তো ওই বইতেই আছে, যেখানে রবীন্দ্রভবনের মানুষই এটা রবীন্দ্রনাথ সংগৃহীত কিনা সে বিষয়ে সংশয় প্রকাশ করেন। সেখানে শক্তিনাথ ঝা কি করে নিঃসন্দেহ হন!

পত্রিকা : আসলে শক্তিনাথবাবু যেটা বলছেন যে উনি রবীন্দ্রভবনে যে খাতাটা রাখা আছে, প্রতিলিপি করিয়ে রেখেছিলেন রবীন্দ্রনাথ, কিন্তু আসল খাতাটা উনি কৃষ্ণ কৃপালানীকে দিয়ে গিয়েছিলেন এবং ... কৃষ্ণ কৃপালানীর হাত দিয়ে অন্য কারুর কাছে আসে যার নাম উনি mention করেননি, সেই খাতাটি থেকে এটা উনি ছেপেছেন।

আহসান : তাই যদি হয়, তা হলে শক্তিনাথ ঝায়ের কথার পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায় যে রবীন্দ্রনাথ যাকে দিয়ে নকল করাবেন গানগুলো তার নিঃসন্দেহে, মোটামুটিভাবে বানানের জ্ঞান আছে, এরকম বুঝতে হবে, আর ওই গানের পাঠ; এবং এই গানের পাঠ তুলনা করলেই বোঝা যাবে যে পার্থক্য কতটুকু, সেজন্য এটি গ্রহণযোগ্য নয় একথাও আমাদের বলা

প্রয়োজন এবং সবচাইতে বড় বিষয় পশ্চিমবঙ্গে যারা লালন নিয়ে, বাউল নিয়ে কাজ করছেন, তাদের মধ্যে শক্তিনাথ ঝা আমার দীর্ঘদিনের বন্ধু। বহরমপুরেও তাঁর সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হয়েছে, শক্তিনাথ ঝায়ের সঙ্গে বাউলদের একটা গভীর সম্পর্ক আছে। বাউল সংঘ ইত্যাদির সঙ্গে তার সম্পৃক্ততা আছে। কিন্তু কিছু মন্তব্য আছে যা উনি না করলে আমার মনে হয় ভালো হত, যেমন আমাদের আবিষ্কারের নেশা, myth তৈরি করার নেশা এত প্রবল যে রবীন্দ্রনাথের সাথে লালনের দেখা করাতেই হবে, তাহলে যেন লালন ফকির অনেক উঁচুতে উঠে যান। মানে জাতে উঠে যান আর কি! তো দেখা যদি হয়, আর দেখা যদি না হয় তাতে পার্থক্যটা কি? রবীন্দ্রনাথের সাথে দেখা না হয়েও তো তিনি লালনের কাছ থেকে অনেক কিছু গ্রহণ করেছেন। তাই দেখা হওয়াটাই বড় কথা না। আমরা চাই এই ধরনের কাজ যারা একেবারেই বাউলের সঙ্গে মিশে, তাদের কথাগুলো বের করে আনবেন বা তাদের জীবন-যাপনের ছবিটা আঁকবেন, চরিত্রগুলোকে ফুটিয়ে তুলবেন, এই তাদের চরিত্র তাদের লেখার ব্যক্তিত্ব লেখার ভেতরে আসবে, সেইগুলো আমরা চাই, নইলে আপনারা সেই গিলে করা সফেদ পাঞ্জাবী পরে দোতলা থেকে কথা বলছে, নিচতলায় দাঁড়িয়ে একটা বাউল আসছে — এই ব্যাপারগুলো যেমন — রবীন্দ্রনাথেরও যে কি বিনয় একটা ফকির গান গাচ্ছে, ''খাঁচার ভিতর অচিন পাখি কমনে আইসে যায়', শুনল কিন্তু এই শুয়ে শুয়ে গান শুনছে তো আলস্য বশতঃ, উঠে গিয়ে সেই গানটি লিখে নেওয়া হল। তো এই আলস্যবশতঃ আমাদের সফেদ পাঞ্জাবি পরা এই লালন বা বাউল গবেষকদের ওই নীচে নামা হয় না। আলস্যের কারণে, একটু ঘুম কাতুরে স্বভাবের কারণে। সে জন্য আমাদের দরকার পরে, নিজেকে বিখ্যাত করার প্রয়াস থেকে বিচ্ছিন্ন লালন, বাউল প্রেমী মানুষদের।

পত্রিকা : আমরা যে বাউল ফকির উৎসব করি, তাতে প্রত্যেক বার কাউকে না কাউকে সম্মান জ্ঞাপন করা হয়, তো সে বার লোকমান ফকিরকে করা হয়েছিল, তার মানপত্রটা আমরা শক্তিনাথ বাবুকে লিখতে বলেছিলাম, তো উনি লিখেছিলেন, তারপর উনি একটা চূড়ান্ত গাঁজাবিরোধী বক্তৃতা দেন এবং সেখানে উনি লালনের একটি গান

quote করেন যে, 'গাঁজা খেয়ে ব্যোম কালী আর বলিস না রে ...'

আহসান : এটাও জাল গান, লালনের শিষ্যদের অনেকেই গাঁজা বিরোধী। যেমন - আব্দুল গণি শাহ, ফকির মন্টু শাহ। কিন্তু আমি ছেলেবেলা থেকে দেখে আসছি গঞ্জিকার ব্যাপারটি নিয়ে বাউলদের মধ্যে কোন ধরনের ... কারো ইচ্ছা হয় না খায়না, কিন্তু এটা খেতে বারণ আছে এমন না।

পত্রিকা : লালনের কি কোন নেশাবিরোধী গান থাকতে পারে বলে আপনি মনে করেন?

আহসান : না, নেশা বিরোধী গান না থাকারই কথা। এই কারণে যে লালন এমন পরিস্থিতির সম্মুখীন হননি, আর সেই সময়টা এমন ছিল না যে তামাক বিরোধী আন্দোলন শুরু হয়েছে, উনি একটা সরকারি প্রচার বিভাগের জন্য গান লিখবেন এই ধরণের ... কে গঞ্জিকা খাচ্ছে বা খাচ্ছে না, এ নিয়ে লালনের কোন মাথাব্যাথা ছিল বলে আমার মনে হয় না।

গঞ্জিকা সেবনের ব্যাপারে কারো আপত্তি যদি তাকে, শক্তিনাথ ঝায়েরও যদি তাকে, তো সেই সম্বন্ধে আমারও আপত্তি আছে। না আমি বলি যে, বাউলেরা তো গঞ্জিকা সেবন করেন, আর আমাদের বাবুরা, কলকাতার বাবুরা, ঢাকার বাবুরা সুরাপান করেন, তাহলে সুরা অভিজাত সম্প্রদায়ের নেশার বস্তু বলে তা গৃহীত হবে, এমন কোন আপত্তি চলবে না, বরঞ্চ এই কথাটি বলা যেত নেশা থেকে দুরে থাক, তাহলেও একটা ব্যাপার ছিল, মানে সুরাপান কেউ যদি করেন, তিনিও সমান্নভাবে নিন্দিত হবেন।

আপনার ব্যক্তিগত জীবনে আপনি ক'টি বিবাহ করেছেন, তা দিয়ে আমার শ্রদ্ধা বা অশ্রদ্ধা নির্ণীত হবে এটা আমি মনে করি না, আপনি মদ্যপান করেন কিনা, গঞ্জিকায় আপনার আসক্তি আছে কি না, এ বিষয়টি একান্ত আপনার ব্যক্তিগত বিষয়, আপনি আপনার জীবন-যাপন কি ভাবে করেন, আপনি তিনমাস স্নান করেন না, ছয় মাস চুলে তেল দেন না ... এ সব অনধিকার চর্চা এবং ব্যক্তি স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ বলে আমি মনে করি।

ভগে দিয়ে বাণ সাধ পঞ্চবাণ
সাধনার সন্ধান জান গুরুর দ্বারে

পাবে সামান্যে কি তার দেখা
বেদে নাই যার রূপরেখা

সুফিবাদ ও তার পরম্পরা

রাজিউদ্দিন আকিল

ইসলাম ধর্ম প্রবর্তিত হওয়ার প্রথম দুই শতকের মধ্যবর্তী সময়ে অর্থাৎ ৭ম ও ৮ম সাধারণ অব্দে (C.E.) মধ্যপ্রাচ্যে উম্মায়াদ্ এবং আব্বাসিদ খালিফাদের রাজত্বকালে উদ্ভূত চূড়ান্ত জাগতিকতা এবং সীমাহীন ভোগ-বিলাস ও স্থূল জড়বাদের বিরুদ্ধে আধ্যাত্মিক বিদ্রোহ হিসেবে সুফিবাদের সূত্রপাত ঘটেছিল। বায়াজিদ বুস্তামি, রাবিয়া বাসারি ও হাসান বাসারির মত প্রথম যুগের সুফি সন্তরা সরল, তপশ্চর্যাপূর্ণ সন্ন্যাসীর জীবন-যাপন করতেন। ধ্যান ও অন্যান্য আধ্যাত্মিক আচার-অনুশীলনের পথে ঈশ্বরের সঙ্গে মিলনই ছিল তাঁদের পরম আকাঙ্ক্ষিত অভিপ্রায়। গোড়ার দিকের অতীন্দ্রিয়বাদী মুসলমান সাধকেরা প্রায়শই তাঁদের অনন্য সাধারণ প্রতিভা ও নেতৃত্বের কারণে ছিলেন বেশ জনপ্রিয় এবং ঘটনাক্রমে তাঁরা নিজেদের নানান রীতি ও মতাদর্শ অনুসারী সিল্‌সিলা বা সম্প্রদায়ের বিন্যাসে সংগঠিত করেন। ফলে এইভাবে পরস্পরের সঙ্গে প্রতিযোগিতামূলক সম্পর্ক বিশিষ্ট বেশ কিছু সুফি সম্প্রদায় শাখা বিস্তার করে।

নবী প্রবর্তিত ইসলামের যে ধারা, তার তিনটি মাত্রা বা দিশার নির্দেশ আমরা সবিশেষ পেয়ে থাকি : ধর্মীয় আইন প্রণেতাদের দ্বারা বলবৎ ইসলাম বা 'সমর্পণ'; ধর্মগুরুদের দ্বারা প্রচলিত ইমান বা 'ধর্মীয় বিশ্বাস'; এবং সুফি সাধকদের দ্বারা অনুশীলিত এহসান অর্থাৎ 'সৎকর্ম সম্পাদন' (এই কারণে সুফিরা মুসলমানদের মধ্যে শ্রেষ্ঠত্বের আসনে সমাসীন)। সুফিদের সাধনার প্রধান লক্ষ্য হল নিরন্তর প্রার্থনা, ভগবানকে সদা স্মরণ করা, ধ্যান এবং আধ্যাত্মিক আচার অনুশীলনের মাধ্যমে এক দয়াময় ও প্রেমে পূর্ণ ঈশ্বরের সঙ্গে মিলিত হওয়া বা তাঁর সান্নিধ্য পাওয়া। (সুফি সাধকদের দ্বারা অনুসৃত বিভিন্ন আধ্যাত্মিক আচার ও অনুশীলনের পন্থাগুলি হয়তো বা অনেক ক্ষেত্রেই উলেমা বা ধর্মগুরুদের স্বীকৃতি বা অনুমোদন নাও পেতে পারে)। ধর্মের এই তৃতীয় মাত্রা, এহ্‌সান ধর্মের গভীরতম মর্মবস্তুকে বিকশিত করে এবং সুফি সাধকদের কাছে পরম আকাঙ্ক্ষিত বিষয়গুলি, যেমন আন্তরিকতা, প্রেম, নৈতিক উৎকর্ষ ও বিশুদ্ধতার মধ্যে দিয়ে এই এহ্‌সান পরিস্ফুট হয়ে ওঠে।

আদর্শগত বৈশিষ্ট্য স্বরূপ সুফি সাধকেরা পথ চলা শুরু করেছিলেন সব

ধরনের পার্থিবতার প্রতি আসক্তিজনিত উদ্বেগগুলি পরিহার করার মাধ্যমে, তা একান্ত ব্যক্তিগত স্তরেই 'হোক বা হোক' না কেন জনসাধারণের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট প্রকাশ্য সামাজিক স্তরে। আত্মানুসন্ধান, মসজিদের প্রথাগত উপাসনার গন্ডী ছাড়িয়ে ঈশ্বরকে স্মরণ ও ভজনা, নির্জনে একাকিত্বের মাঝে ধ্যান ও আরাধনা এবং দরবেশ রূপে ভবঘুরের মত মুসলমান অধ্যুষিত বা অমুসলমান শহরগুলিতে বা আধা-মুসলমান পশ্চাৎবর্তী দূর দূর গ্রামে পরিভ্রমণ ছিল তাঁদের সাধনার অঙ্গ। এই পরিক্রমার শেষে ফিরে এসে তাঁরা দাবী করতেন যে, ইসলামের সার সত্য তাঁদের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতায় ধরা দিয়েছে, যে সত্যে নিহিত আছে এক করুণাময় ঈশ্বরের ধারণা এবং নবী নির্দেশিত পথের ন্যায্যতা (যা কিনা সুন্নী সম্প্রদায়ের উলেমাদের অবস্থানকে আরও দৃঢ়তর করে তুলত)। সুতরাং, ধরে নেওয়া যায় যে ধর্মাচরণের ক্ষেত্রে অনুকরণীয় ও আদর্শস্বরূপ সুফি সাধকেরা যাবতীয় মানবিক দুর্বলতাকে উপেক্ষা করে বা সেই সবের প্রতি সহনশীল হয়ে মুসলমান সম্প্রদায়ের মানুষজনকে পথ দেখিয়ে এগিয়ে নিয়ে যেতেন এবং একই সঙ্গে অমুসলমান অন্যান্য সম্প্রদায়ের লোকেদেরও আকৃষ্ট করে ইসলাম সম্প্রদায়ের পরিধির মধ্যে নিয়ে আসতেন। এইভাবেই ত্রয়োদশ শতাব্দীতে বিভিন্ন মুসলমান ধর্মাবলম্বী সুলতানি রাজত্বের উত্থানের পূর্বেই ইসলামের অন্তর্বর্তী এক প্রতিষ্ঠিত ধারা হিসেবে সুফিমতবাদ কেন্দ্রিক আন্দোলন ভারতীয় উপমহাদেশে সমধিক প্রচলিত ছিল।

বেশীরভাগ ক্ষেত্রেই সুফিবাদ সম্বন্ধে আমরা যা জানি, সেই জ্ঞান আহরণের উৎস হ'ল ফারসী ও অন্যান্য দেশীয় ভাষায় রচিত সুনিপুণ ও সমৃদ্ধ সুফি-সাহিত্যের সঞ্চিত ভান্ডার। এই সুফি-সাহিত্য ধারার এই উৎসগুলির মধ্যে পড়ে : (১) মাল্‌ফুজাৎ (কোন সুফিসাধক প্রদত্ত উপদেশগুলি, যা সাধারণত তাঁর জীবদ্দশায় কোন শিষ্য বা মুরিদের দ্বারা সংকলিত); (২) মক্তুবাৎ বা চিঠিপত্রাদি, যা ভক্তদের উদ্দেশ্যে কোন সুফি গুরুর দ্বারা লিখিত; (৩) কোন এক সুফি শেখ রচিত সুফিবাদের উপর লিখিত মরমিয়া অতীন্দ্রিয়বাদী তাত্ত্বিক প্রবন্ধমালা; (৪) বিভিন্ন সুফি-কাব্যের সংকলনগুলি; (৫) তাজ্‌কিরা বা সুফিসাধকদের জীবনী অবলম্বনে রচিত উপাখ্যানগুলি, যা সাধারণতঃ সুফি গুরুর মৃত্যুর পর সংকলিত। সুফি মতাবলম্বীদের বিচিত্র কর্মকান্ড বিষয়ক গুরুত্বপূর্ণ তথ্যপঞ্জী রাজসভার বিভিন্ন ধারাবিবরণী এবং সাধারণ ঐতিহাসিক রচনাগুলির উৎস থেকেও সংগ্রহ করা যেতে পারে। বিশেষ করে শাসকবর্গের সঙ্গে সুফি-সাধকদের সম্পর্কের উপর ভিত্তি করে যে সব বিষয়ের উপর ঐতিহাসিক

বিবরণগুলি রচিত হয়েছিল, সেই সব বিবৃতির থেকে। সুফিসাধক প্রদর্শিত বিভিন্ন অলৌকিক ক্রিয়াকলাপের কাহিনীগুলি এবং অন্যান্য জনসাধারণ্যে বহুল প্রচারিত ও সমাদৃত কিংবদন্তি বা আখ্যানগুলিও বিভিন্ন অঞ্চলে মুসলমান মরমিয়া সাধকদের গুরুত্বপূর্ণ উপস্থিতি ও প্রভাব সম্বন্ধে যথেষ্ট আলোকপাত করে। যদিও গাজী ও শহীদদের মতে মহাত্মাদের স্মৃতি বিজড়িত গূঢ় রহস্যময় কাহিনী ও কিংবদন্তীগুলির ঐতিহাসিক সত্যাসত্যতা নির্ণয় করার ক্ষেত্রে ঐতিহাসিকেরা কঠিন সমস্যার মুখোমুখি হন। তবু এই তথ্যটিও সঠিক : যে সমাজে সুফিসন্তদের খ্যাতি ও প্রভাব উন্নতির শিখরে উত্তীর্ণ হয়েছিল, সেই সমাজে তাঁদের যথার্থ ভূমিকা নির্ধারণের ক্ষেত্রে মূল প্রতিপাদ্য হিসেবে বিবেচিত হয় মরমিয়া সন্ত ও মহাত্মাদের অধিগত অতিবাস্তবিক (Paranormal) ক্ষমতা এবং দুর্গতির বিপদ থেকে উদ্ধার করার ক্ষেত্রে তাঁদের অতুলনীয় সামর্থ সম্পর্কে লোকমানসে প্রচলিত ধ্যানধারণা প্রসূত উপাদানগুলি।

যে সব সুফি সম্প্রদায়ের উদ্ভব হয়েছিল, তাদের মধ্যে চারটি ধারা ভারতীয় পটভূমিতে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করেছিল। সুলতানি আমলে যেমন চিস্তি ও সুরাবর্দি সম্প্রদায়ের খ্যাতি ও প্রভাব ব্যাপক প্রসার লাভ করেছিল, মোগল আমলে তেমনই কাদিরি ও নাস্‌বন্দি সম্প্রদায় সারা ভারতে বিশেষ তাৎপর্যময় ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিল। শতাব্দীর পর শতাব্দীব্যাপী ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে এই সব সুফি সম্প্রদায়গুলি বহু শাখা-প্রশাখায় বিভক্ত হয়ে তাদের প্রভাব বিস্তার করেছিল। শুরুর দিকে, জীবিত সুফি ধর্মাবলম্বী গুরু তাঁর অনুগামী শিষ্যবৃন্দ বা অন্যান্য দর্শনার্থীদের তাঁর অধীনে পরিচালিত ধর্মশালায় নীতিকথা ও উপদেশ শোনাতে ডেকে নিতেন। পরবর্তী সময়ে পূর্বপ্রজন্মের সুফি সাধকদের দর্গাগুলি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে এবং তীর্থকেন্দ্রে পরিণত হয়। পরিণামস্বরূপ এর থেকে সৃষ্ট হয় সুফিবাদের এক পূর্ণাঙ্গ ও পবিত্র মানচিত্র, যা বিলায়েৎ হিসেবে অভিহিত হয় এবং এই ভৌগোলিক প্রসারের সঙ্গে জড়িত হয়ে পড়ে প্রভাব বিস্তারের ক্ষেত্র, ভক্ত-অনুগামী ও সঙ্গতি-সংস্থান, ইত্যাদির উপর নিয়ন্ত্রণ কায়েম করার উদ্দেশ্যে বিভিন্ন সুফি সম্প্রদায়গুলির মধ্যে বিদ্যমান বিপুল পারস্পরিক দ্বন্দ্ব ও প্রতিযোগিতা। যদিও ত্রয়োদশ শতক বা তারও পূর্বে সুফি মতাবলম্বীরা বঙ্গভূমে তাঁদের প্রভাব সুপ্রতিষ্ঠিত করেছিলেন এবং তার ফলে ইসলাম ধর্ম প্রচারের ক্ষেত্রে তাঁদের ভূমিকা ছিল স্পষ্ট স্বাক্ষরে ভাস্বর, তবু সন্ত নিজামউদ্দিন আউলিয়ার অনুগামী চিস্তি সম্প্রদায়ের শিষ্যদের এই অঞ্চলে নিজেদের বিলায়েৎ প্রতিষ্ঠিত করতে চতুর্দশ শতকের প্রথম পাদ অবধি অতিবাহিত হয়ে যায়।

সম্ভবতঃ এই কাজ সহজে সাধিত হয়নি। কারণ, এই অঞ্চলে পরিভ্রমণরত অমুসলমান সম্প্রদায়ভুক্ত মরমিয়া সাধু-সন্ত ছাড়াও প্রতিদ্বন্দ্বী সুরাবর্দি সম্প্রদায়ের সুফি সাধক ও তাঁদের অনুগামী শিষ্যরা সোনারগাঁও এবং সিলেটের মত প্রধান প্রধান কেন্দ্রগুলিতে তাঁদের ধর্মীয় প্রভাব বিস্তার করেছিলেন। যাই হোক, যদিও এই চিস্তি সম্প্রদায়ের মরমিয়া সাধকরা তাঁদের মত ও পথের উত্তর ভারতীয় মহান শিক্ষাগুরুদের থেকে পরম্পরা সূত্রে যে মহৎ ঐতিহ্য লাভ করেছিলেন, তাকে অটুট ও অক্ষত অবস্থায় ধরে রাখতে বিশেষ সচেষ্টও ছিলেন। তবু ক্রমে তাঁরা স্থানীয় ধর্মীয় পরিবেশে নিজেদের গভীরভাবে প্রোথিত করেছিলেন এবং এই অঞ্চলে মারিফতি ধারা হিসেবে যে সাধনপন্থা চিহ্নিত হয়েছে, তার নির্দিষ্ট রূপায়ণের ক্ষেত্রে তাঁরা মুখ্য ভূমিকা পালন করেছিলেন। বাংলার বাইরে যে ঐতিহ্য বা পরম্পরা বিস্তার লাভ করেছিল তার সঙ্গে নিজেদের একাত্ম রাখা এবং স্থানীয় বাস্তবতাকে স্বীকার করে নিয়ে তার সঙ্গে নিজেদেরকে মানিয়ে নিয়ে চলার এই দ্বৈত প্রক্রিয়ার ফলস্বরূপ হয়তো সুফি সন্তরা অনেক ক্ষেত্রে ধর্মীয় বিচার বিবেচনায় আপস করেছিলেন। এই বিষয়টি হয়তো ইসলামের অতন্দ্র প্রহরায় নিবিষ্ট উলেমাদের মনঃপুত ছিল না। এই বিষয়ে আমরা পরে আরও আলোকপাত করব।

পরমেশ্বরে সঙ্গে মানবাত্মার মিলন সম্ভবপর এই বিশ্বাস সুফিবাদকে ইসলামের অন্তর্গত অন্যান্য ধারার থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র হিসেবে চিহ্নিত করেছে। ত্রয়োদশ শতকের সুফি ধর্মগুরু ইবন্-ই-আরাবি প্রবর্তিত ওয়াহ্দাৎ-উল্-উজুদ (সত্তার একত্ব বা একটি বাস্তবতা হিসেব পরিগণিত একেশ্বরবাদ) শীর্ষক মতবাদের উপর ভিত্তি করে এই বিশ্বাস একটি নির্দিষ্ট রূপ ধারণ করেছে। এই মতবাদ পোষণ করার কারণে সুফিবাদীরা নিষ্ঠাবান, গোঁড়া ইসলাম ধর্মমতে বিশ্বাসী সুন্নি সম্প্রদায়ভুক্ত হানাফি পন্থী উলেমাদের দ্বারা প্রতিনিধিত্বকারী গোষ্ঠীর সঙ্গে দ্বন্দ্বে লিপ্ত হয়। এই দ্বিতীয় গোষ্ঠীর সদস্যরা বিশ্বাস করে যে ঈশ্বর এক এবং অদ্বিতীয়। সুতরাং, তাদের মতে ঈশ্বরের সঙ্গে মানবাত্মার সম্ভাব্য মিলন সংক্রান্ত ধারণার মধে নিহিত আছে ঈশ্বর ও বিভিন্ন সত্তার মধ্যে বিদ্যমান অভিন্নতার ইঙ্গিত। এই কারণে কখনও কখনও সুফি মতাবলম্বীরা আক্রান্ত ও অত্যাচারিত হতেন। সুফি সাধকেরা কিছু কিছু ক্ষেত্রে সমবেত প্রার্থনা ও উপাসনা (নামাজ/সালাৎ), ইত্যাদির মত প্রথাগত ধর্মীয় আচার-অনুশীলনের প্রতি তত গুরুত্ব না দিয়ে ধ্যান এবং অন্যান্য আধ্যাত্মিক সাধনার উপর অনেক বেশি জোর দিতেন। তাঁদের এই আধ্যাত্মিক সাধন ধারার অঙ্গ ছিল সঙ্গীত। এর

কারণেও তাঁরা বিদ্বেষের শিকার হ'তেন। বিশেষ করে সামা ও কাওয়ালির মাধ্যমে সঙ্গীত শ্রবণ ও চর্চাকে আধ্যাত্মিক সাধনার পন্থা হিসেবে বৈধতা প্রদান করার জন্য মুখ্যত সুফিপন্থীদের সঙ্গে ধর্মীয় উলেমাদের বিরোধ ঘটত।

দেশীয় ভাষা এবং সেই সব ভাষায় রচিত সাহিত্যের প্রসার ও উন্নতি সাধনের ক্ষেত্রে সুফিবাদী সাধকেরা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন। এর বিপরীতে, রাজসভার সাংস্কৃতিক পৃষ্ঠপোষকতায় ও রাজশক্তির সমার্থকতায় ঋদ্ধ সরকারি ভাষা হিসেবে ফারসী ভাষা বিশেষ প্রসার লাভ করেছিল এবং প্রাধান্য অর্জন করেছিল। কাব্য ও সঙ্গীতের প্রসার এবং উন্নতি সাধনের ক্ষেত্রেও সুফি সাধকদের অবদান সমানভাবে উল্লেখযোগ্য। বিভিন্ন বর্গের উলেমাদের বিরোধিতা সত্ত্বেও চিস্তিপন্থীদের মত সুফি সম্প্রদায়গুলি নৃত্য ও সঙ্গীতকে ধ্যান ও মনঃসংযোগের কৌশল এবং আধ্যাত্মিক পরমানন্দ লাভের উপায় হিসেবে গ্রহণ করেছিলন। সুতরাং, ভারতীয় লোক-সংস্কৃতি এবং ধ্রুপদী কৃষ্টির উন্নতি সাধনের ক্ষেত্রে সুফিবাদের অবদান অপরিসীম।

ওয়াহ্দাৎ-উল্-উজুদ মতবাদের উপর বিশ্বাস স্থাপন এবং ধ্যান ও মনোঃসংযোগের জন্য বিভিন্ন ধরনের পন্থা অবলম্বন করার কারণে সুফি সাধকরা আধ্যাত্মিকতার নিরিখে কোন কোন ধারার অমুসলমান ধর্মীয় ঐতিহ্যের খুব কাছাকাছি চলে এসেছিলেন। উদাহরণ স্বরূপ উল্লেখ করা যায় যে হিন্দুধর্মের অন্তর্গত অদ্বৈতবাদ দাবী করে আত্মা ও পরমাত্মা এক এবং অভিন্ন। এই তত্ত্বের সঙ্গে ওয়াহ্দাৎ-উল্-উজুদ মতবাদের যথেষ্ট মিল খুঁজে পাওয়া যায়। যোগসাধনার মত আধ্যাত্মবাদী তপশ্চর্যার থেকেও সুফিরা অনেক শিক্ষণীয় বিষয়বস্তুর অনুসন্ধান পেয়েছিলেন যা তাঁদের ধ্যান ও সাধনা এবং অন্যান্য আধ্যাত্মিক আচার-অনুশীলনের উপর প্রভাব ফেলেছিল। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে দু'টি বহুল প্রচলিত অনুশীলনের কথা : শ্বাসক্রিয়ার উপর নিয়ন্ত্রণ আনার উদ্দেশ্যে প্রাণায়ামের নিয়মিত অভ্যাস করা এবং আরও বেশি চিত্তাকর্ষক চিল্লা-ই-মাকুস পদ্ধতির সাধনায় লিপ্ত হওয়া, যে অনুশীলনে একজন সাধক কোন কুঁয়োর মুখে ঝুঁকে পড়া গাছের ডাল থেকে মাথা নীচে ও পা উপরে রেখে ঝুলে থাকে। যদিও সাধারণতঃ এই ধরনের সাধনা নির্জনে, রাতের অন্ধকারে করা হ'ত।

অমুসলমান ধর্মীয় পরম্পরার ভেতর সুফিরা যেমন বহু শিক্ষণীয় বিষয়ের সন্ধান পেয়েছিলেন, ঠিক তেমনই স্থানীয় অমুসলমান ধর্মীয় অনুশীলনের ধারাগুলিও সুফি সন্তদের দ্বারা প্রচারিত ইসলামি তত্ত্ব ও নীতিগুলির দ্বারা

ব্যাপকভাবে প্রভাবিত হয়েছিল। মধ্যযুগে ভক্তি আন্দোলনগুলি যে সব ধর্মীয় মত ও উপাদানগুলিকে আঁকড়ে ধরে বিকশিত হয়েছিল, যেমন মূর্তিপূজা ও বিভিন্ন অন্তঃসারশূন্য প্রচলিত প্রথা ও রীতির সমালোচনা, সাম্যের উপর অতিরিক্ত গুরুত্ব প্রদান, এক ও অদ্বিতীয় পরমেশ্বরের প্রতি নিরবচ্ছিন্ন ভক্তি ও তাঁর ভজনা, ইত্যাদি — এই সব ধারণার শিকড় সুফিবাদের গভীরেও প্রোথিত ছিল। ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে একত্রে সহাবস্থানের যে উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত এই সাধনচর্যা তুলে ধরেছিল, সেটিই ভারতীয় সংস্কৃতির পরিমন্ডলে সুফিবাদের সর্বশ্রেষ্ঠ অবদান হিসেবে বিবেচিত হয়। এই সহাবস্থানের পরম্পরাকেই পন্ডিতেরা সমন্বয়বাদ এবং তৎসংক্রান্ত সাধনা হিসেবে সুস্পষ্টভাবে অভিহিত করেছেন। এই সমন্বয়ের সাধনাকে নিখুঁতভাবে চিহ্নিত করতে যে পরিভাষাই ব্যবহার করা হোক না কেন, সুফি সম্প্রদায়গুলি প্রমাণ করেছিল যে মুসলমান ও অমুসলমান ধর্মীয় ঐতিহ্য ও ধারাগুলি একে অপরের পাশাপাশি অবস্থান করে প্রসার লাভ করতে পারে এবং একে অন্যের থেকে শিক্ষাগ্রহণের মাধ্যমে সমৃদ্ধ হ'তে পারে।

যদিও সুফিবাদ ও বৈষ্ণব ভক্তিবাদের আগ্রহী পাঠক ও পন্ডিতদের মধ্যে এই দু'টি জোরালো ধর্মীয় আন্দোলনের ধারাকে স্বতন্ত্র করে দেখে অধ্যয়ন ও গবেষণার কাজ পরিচালনা করার একটা প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়, কিন্তু আরও গভীরভাবে প্রণিধান করলে আধ্যাত্মিক আচার-অনুশীলন ও ভক্তিবাদের স্তরে বিরাজিত সাদৃশ্যগুলিই যে শুধুমাত্র উদ্ঘাটিত হ'তে পারে তাই সব নয়, বরং আরও দেখা যেতে পারে যে দু'টি ধারার মধ্যে আধ্যাত্মিক স্তরে এক ধরনের পারস্পরিক প্রতিদ্বন্দ্বিতার সম্পর্কও ক্রিয়াশীল ছিল। দেখা যেতে পারে যে একে অপরের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় লিপ্ত বিভিন্ন ধর্মীয় আন্দোলনগুলির নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিরা প্রতিপত্তি ও সম্মান অর্জনের উদ্দেশ্যে নানান ধরনের কৌশলের উদ্ভাবন করেছিলেন — যেমন আরও উৎকর্ষতার সঙ্গে অলৌকিক ক্রিয়াকলাপের প্রদর্শন, প্রতিদ্বন্দ্বীদের অলৌকিক ঘটনা সংঘটনের প্রতিযোগিতায় সামর্থ্যের বিচারে পরাভূত করা, অন্যদের অনুসৃত ধর্মশাস্ত্রের সমালোচনামূলক পাঠগ্রহণের মাধ্যমে নিজের বৌদ্ধিক শ্রেষ্ঠত্বের প্রমাণ দেওয়া এবং এইভাবে স্বকীয় শ্রেষ্ঠত্ব ও ন্যায়পরায়ণতা সর্বসমক্ষে উপস্থাপিত করা, ইত্যাদি। এই সব সত্ত্বেও, তাঁদের নিজেদের জ্ঞানের পরিধি বিস্তার করার এবং আরও বেশি সংখ্যক শিষ্য ও অনুগামীদের উপর প্রভাব ও কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত করার উদ্দেশ্যে। সুফিবাদীরা এবং তাঁদের প্রতিদ্বন্দ্বী অন্যান্য সম্প্রদায়ের সাধকরা একে অপরের থেকে অনেক

ভাবনা গ্রহণ করেছিলেন বা আত্মস্থ করেছিলেন এই ভক্তিবাদী আন্দোলনগুলির প্রশ্রয়পুষ্ট সাহিত্যের ভান্ডারে সুফিবাদের প্রভাব বা সুফিবাদ ও বাউলদের মরমিয়া দর্শন এবং বৈষ্ণব ধর্মের বিভিন্ন শাখাগুলির মধ্যে বিদ্যমান সাদৃশ্যগুলি স্পষ্ট করে লক্ষ্য করা যায়। প্রায়শই দেখা গেছে যে বিভিন্ন ধারার মরমিয়া সাধক (ফকির, দরবেশ, নাথ, গোস্বামী প্রভৃতি) সম্প্রদায়গুলির মধ্যে প্রাপ্ত সাধারণ সাদৃশ্য সূচক লক্ষণগুলির উপস্থিতির কারণে তাঁরা যে একে অপরের মধ্যে সূক্ষ্ম স্বাতন্ত্র্যের সীমা বজায় রেখে পথ চলতে চাইতেন, সেই বিভেদের রেখাগুলি মুছে একাকার হয়ে যাবার উপক্রম হয়েছিল।

বিভিন্ন অমুসলমান পরম্পরার সান্নিধ্যে অবস্থিতির কারণে সুফি মতাবলম্বীদের পক্ষে ধর্মান্তরকরণ ও ইসলামের প্রভাব বিস্তার করার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে বিশেষ সুবিধে হয়েছিল, যদিও তাঁদের মধ্যে অনেকেরই হয়ত এই ধরনের সুস্পষ্ট কর্মসূচী নিয়ে কাজ করার উদ্দেশ্য ছিল না। তা সত্ত্বেও, জনসংখ্যার এক বিপুল অংশের ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করার পেছনে সুফি মতাবলম্বী সন্তদের উপস্থিতি অন্যতম প্রধান কারণ হিসেবে কাজ করেছিল। শুরুর দিকে খানাকা বা দরগার মত সুফি প্রতিষ্ঠানগুলি মুসলমান ও অমুসলমান সম্প্রদায়ের ভক্তমন্ডলীর মিলনকেন্দ্রে পরিণত হয়েছিল। সেই সব স্থানে তারা উপাসনা, ধ্যান বা আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করার জন্য সম্মিলিত হ'ত এবং সুফিবাদী ধর্মীয় গুরুদের কাছে দোয়া ও আশিস্ প্রার্থনা করত। কোন এক বিশেষ সুফিসন্তের প্রতি ভক্তি ও বিশ্বাস অর্পণ করার মাধ্যমে ধর্মান্তরিত হওয়ার প্রক্রিয়া শুরু হত, যার ফলে অর্ধ বা আংশিক ধর্মান্তরণের প্রতীক স্বরূপ বিভিন্ন সমন্বয়বাদী সম্প্রদায়ের উদ্ভব হয়েছিল। এরই পরিণামে এমন সব বিভিন্ন মুসলমান গোষ্ঠী শাখা বিস্তার করেছিল যারা আনুষ্ঠানিকভাবে ইসলাম ধর্ম প্রকাশ্যে গ্রহণ করলেও তাদের পূর্বের থেকে অনুসৃত হয়ে আসা স্থানীয় লোকাচার এবং প্রথাগুলিও পালন করে চলত। এই কারণে তারা কঠোর বিশুদ্ধতাবাদী ও সংস্কারপন্থী ইসলামি ধর্মমতের দ্বারা নিন্দিত হত। যাইহোক, বাংলার বহু মুসলমান গোষ্ঠী তাদের ধর্মান্তরিত হওয়ার পেছনে শাহ জালালউদ্দিন মুজাররাদ্ ও শেখ্ জালালউদ্দিন তাব্‌রেজির মতন সুফি সাধকদের আশিস্ ও প্রেরণাকেই মূল কারণ হিসেবে নির্দিষ্ট করেছে। যদিও এই ঐতিহাসিক ব্যক্তিরা ত্রয়োদশ শতকে খ্যাতি ও প্রতিপত্তির শিখরে উন্নীত হয়েছিলেন, তবু পরবর্তীকালে সম্ভবত সুফি সন্তদের স্মৃতিধন্য পবিত্র তীর্থস্থানগুলিকে কেন্দ্র করে বহু শতাব্দীব্যাপী পৃথক পৃথক সাংস্কৃতিক ধারার সমন্বয় সাধনের প্রক্রিয়ার মাধ্যমেই এই গোষ্ঠীগুলির উদ্ভব হয়েছিল।

একথা নিঃসংশয়ে বলা চলে যে, পূর্ববঙ্গে ব্যাপক মাত্রায় ইসলামে ধর্মান্তরিত হওয়ার ঘটনা ঘটেছিল মূলতঃ ধর্ম-কর্মের সঙ্গে জড়িত যে সব বিভিন্ন ব্যক্তিদের নিষ্কর জমি দান করে বসবাসের জন্য পত্তনি দেওয়া হয়েছিল, তাঁদের সঙ্গে স্থানীয় অমুসলমান অধিবাসীদের দীর্ঘকালব্যাপী আদান-প্রদানের মাধ্যমে। হয়তো ব্রাহ্মণ্য ধর্মের সুদৃঢ় প্রভাব না থাকার দরুন বাংলার পূর্বাঞ্চলে ধানচাষের উদ্দেশ্যে উদ্ধারকৃত পতিত জমিতে কৃষিকাজ অবলম্বন করে সদ্য সদ্য স্থায়ীভাবে বসবাস করতে শুরু করা বিপুল সংখ্যক অমুসলমান জনসাধারণের উপর প্রভাব বিস্তার করার কাজটি সুফি সন্তদের পক্ষে সহজ হয়েছিল। এরই বিপরীতে, বাংলার পশ্চিমাঞ্চলে ভক্তিবাদী ঐতিহ্যের সুদৃঢ় প্রভাব ক্রিয়াশীল থাকার কারণে স্থানীয় জনসাধারণের মধ্যে বিপুল সংখ্যায় ইসলামে ধর্মান্তরিত হওয়ার প্রবণতা প্রতিরুদ্ধ হয়েছিল। তা সত্ত্বেও বাংলার মানচিত্রে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা গাজীবাবা ও শহীদদের স্মৃতিধন্য তীর্থকেন্দ্রগুলি বঙ্গবাসীদের জীবনে অতি তাৎপর্যময় ভূমিকা পালন করেছিল এবং সরাসরি আনুষ্ঠানিকভাবে ধর্মান্তরিত হওয়ার আহ্বান না জানিয়েও বহু মানুষকে ইসলাম ধর্মে সম্প্রদায়ভুক্ত করার ক্ষেত্রে সফল হয়েছিল। মরমিয়া সাধকদের জীবনী অবলম্বনে রচিত উপাখ্যানগুলিতে বর্ণিত ব্যতিক্রমহীন অলৌকিক ক্রিয়াকলাপ সংঘটিত করার সামর্থ্যের উল্লেখগুলি ছাড়াও সুফি সন্তরা শ্রদ্ধেয় হয়েছিলেন তাঁদের বাসভূমের পারিপার্শ্বিক পরিবেশের উপর প্রভাব বিস্তার করার ও নিয়ন্ত্রণ কায়েম করার ক্ষমতার অধিকারী হওয়ার দরুন। তাঁরা বিশেষ শ্রদ্ধার পাত্র হয়ে উঠেছিলেন এই কারণে যে বাঘ পোষ মানানোর মতন নানা ক্রিয়াকলাপের মাধ্যমে তাঁরা সাধারণ মানুষদের রক্ষা করতেন। তাছাড়াও, দরিদ্র জনসাধারণকে নানান ধরনের পরহিতপরায়ণ উদ্যোগ গ্রহণের মাধ্যমে তাঁরা সাহায্য করতেন। তাদের বিভিন্ন সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে রাজনৈতিকভাবে হস্তক্ষেপ করতেও তাঁরা কুণ্ঠিত হতেন না। এই কারণগুলিও তাঁদেরকে জনমানসে বিশেষ শ্রদ্ধার আসনে প্রতিষ্ঠিত করেছিল।

যদিও বাস্তবে সুফিরা যে সামাজিক প্রতিবেশে নিজেদের প্রভাব বিস্তার করেছিলেন, সেই সমাজে অঙ্গীভূত হবার তাগিদে ইসলামের নির্দিষ্ট সীমা লঙ্ঘন না করার বিষয়ে তাঁরা যথেষ্ট সতর্ক ছিলেন। তা সত্ত্বেও বিভিন্ন সুফি সম্প্রদায় সম্পর্কে উলেমাদের মনোভাব ছিল শত্রুভাবাপন্ন। কারণ, ইসলামি অনুশাসন বা শরিয়ৎ সম্বন্ধে উলেমারা যে ধ্যান-ধারণা পোষণ করতেন বা তার যা ব্যাখ্যা করতেন, তৎপ্রসূত দৃষ্টিভঙ্গির বিচারে সুফি মতাবলম্বীদের বিভিন্ন ভাবনা-চিন্তা এবং আচার-অনুশীলন প্রচলিত ধর্মমতের পরিপন্থী হিসেবে পরিগণিত হ'ত।

যদিও উলেমারা ইসলাম ধর্ম প্রচার করার থেকে ধর্মীয় শুদ্ধতা ও নৈষ্ঠিকতা রক্ষা করার কাজে অনেক বেশি আগ্রহী ছিলেন এবং অমুসলমান জনগোষ্ঠীর সঙ্গে তাঁরা সীমিত সম্পর্ক বজায় রেখে চলতেন এবং সম্ভবত তাঁদের সেই সম্পর্ক বিশেষ ফলপ্রসূও ছিল না, তবু ইসলাম ধর্মের প্রভাব বিস্তার করার ক্ষেত্রে ও সেই ধর্মে অমুসলমানদের সম্প্রদায়ভুক্ত করার কাজে সুফিদের যে বিশেষ ভূমিকা ছিল, তা উলেমাদের পক্ষ থেকে বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে গ্রাহ্য করা হ'ত না। কারণ, তাঁদের ভাবনায় এই বিষয়টিই গুরুত্ব পেয়েছিল যে সুফিদের প্রচারিত ও আচরিত ইসলামি মত মানের নিরিখে ছিল অশুদ্ধ ও নিকৃষ্ট। বস্তুত, সুফিদের আচার-অনুশীলনগুলি ইসলামের বিচারে অননুমোদিত হিসেবে উলেমারা তীব্র নিন্দায় বিদ্ধ করতেন। এই উদ্দেশ্যে প্রায়ই দেখা গেছে যে তাঁরা রাজশক্তি প্রয়োগ করারও পক্ষপাতী ছিলেন।

সাধারণত বলা হয়ে থাকে যে রাষ্ট্রের সঙ্গে সুফি সম্প্রদায়গুলির সম্পর্ক বেশ ব্যবধানবিশিষ্ট ছিল। চিস্তি জাতীয় সম্প্রদায়গুলি শাসকবর্গের থেকে অর্থ বা সহায়তা গ্রহণ করতে অসম্মত হ'ত। তারা বিশ্বাস করত যে রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়লে তাদের মধ্যে স্থূল জড়বাদী ও ঐহিকতা কেন্দ্রিক প্রবণতাগুলির উৎপত্তি হবে, যা তাদের পক্ষে ছিল একান্তই অনভিপ্রেত। যাইহোক, এই মনোভাব এক সম্প্রদায় থেকে অন্য সম্প্রদায়ের ক্ষেত্রে স্বতন্ত্র হত এবং একই সম্প্রদায়ের অন্তর্গত সুফি সন্তরাও এই বিষয়ে ব্যক্তি বিশেষে ভিন্ন ভিন্ন মত পোষণ করতেন। চিস্তি সম্প্রদায়ের সুফিপন্থীরা যেখানে রাষ্ট্রের সম্পর্কে নিরপেক্ষ ও উদাসীন থাকাই বিধেয় বলে মনে করতেন, সুরাবর্দি সম্প্রদায়ের সুফিবাদীরা সেখানে সুলতানের রাজসভার সঙ্গে সংশ্রব রেখে চলার ক্ষেত্রে কোন ধরনের কুণ্ঠা বোধ করতেন না। মোঘল আমলে নাক্সবন্দি ও কাদিরি সম্প্রদায়ভুক্তরাও রাজনৈতিক কাজ-কর্মে লিপ্ত হয়ে পড়েছিলেন বলে জানা যায়। যদিও বিভিন্ন সমসাময়িক সামাজিক ও রাজনৈতিক স্তরে ঘটে যাওয়া বিতর্কিত বিষয়গুলির বিবেচনার প্রসঙ্গে এই দুই সিল্‌সিলার প্রতিনিধিরা লক্ষণীয় ভাবে ভিন্ন ভিন্ন পন্থা অবলম্বন করেছিলেন। সুফিপন্থীদের রাজনৈতিক বিষয়ে হস্তক্ষেপের এক অন্যতম বিশিষ্ট উদাহরণ হ'ল পঞ্চদশ শতকে বাংলার সুলতানিতে মুসলমান প্রাধান্য রক্ষা করতে চিস্তি সম্প্রদায়ভুক্ত সুফি সন্ত নুর কুতব্-ই-আলমের সক্রিয় উদ্যোগ গ্রহণ করা। তাঁর সমসাময়িক অযোধ্যা অঞ্চল থেকে আগত চিস্তিপন্থী আস্‌রাফ সিম্‌নানির সহযোগিতায় ও সমর্থনে পুষ্ট হয়ে কুতব্-ই-আলম বলপূর্বক রাজসিংহাসন দখলকারী রাজা গণেশকে বাধ্য করেছিলেন তাঁর জনৈক পুত্র সন্তানকে সিংহাসনের দখল ছেড়ে দিতে। রাজা গণেশের এই সন্তান

ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে সুলতান জালালউদ্দিন নামে পরিচিত হয়ে সিংহাসনে আরোহণ করেছিলেন। সাধারণত তাঁদের রাজনৈতিক কর্তৃত্বকে বৈধতা দান করার জন্য সুলতান ও নবাবদের সুফিপন্থী সাধকদের এবং অন্যান্য ধার্মিক ব্যক্তিদের সমর্থন পাওয়া অত্যন্ত জরুরী ছিল। পক্ষান্তরে, অগ্রণী মরমিয়া সন্তরাও রাজনৈতিক পৃষ্ঠপোষকতা ও সহায়তার প্রত্যাশী ছিলেন এবং এমন কি প্রতিদ্বন্দীদের উপর সফলভাবে প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা করার ব্যাপারে শাসকবর্গের উপর প্রভাব বিস্তার করতেও তাঁরা সচেষ্ট হয়েছিলেন। যদিও মনে হ'তে পারে যে পরিভ্রমণরত মরমিয়া সাধক সম্প্রদায়ের সদস্যদের কাছে পারত্রিক বিষয়ে ধ্যানে নিবিষ্ট থাকাই সর্বাগ্রগণ্য কাজ বলে বিবেচিত হ'ত, তবু দেখা যায় যে তাঁদের মধ্যে অনেকেই ইহজাগতিক বিষয়-আশয়ে গভীরভাবে সংশ্লিষ্ট হয়ে পড়েছিলেন এবং এই কারণে প্রায়ই বিভিন্ন রাজনৈতিক বিবাদে ও বিতর্কে তাঁদের জড়িয়ে পড়তে হ'ত।

কোন কোন সময়ে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে হস্তক্ষেপ করা ছাড়া সুফি ঐতিহ্যের ধারাবাহিকতায় প্রেম ও শান্তির বাণী আজও প্রচারিত হয়ে আসছে এবং সেই উদ্দেশ্য নিয়ে ধর্মাচরণের অভ্যাস আজও অনুসৃত হয়ে চলেছে। লক্ষণীয় বিষয় হ'ল এই যে, এই ধারা প্রচলিত হয়ে চলেছে এমনই এক যুগে যখন ইসলামের অন্তর্গত বেশিরভাগ ধারাই হিংসা ও সন্ত্রাসবাদের সমার্থক হয়ে চিহ্নিত হচ্ছে বা হিংসা ও সন্ত্রাসবাদের সঙ্গে অভিন্ন করে দেখে তাদেরকে গুলিয়ে ফেলা হচ্ছে। চিস্তিদের মতন সহনশীল, সমন্বয় ও সহাবস্থানে আগ্রহী, জনপ্রিয় সুফিবাদী সম্প্রদায়গুলির উৎপত্তি হয়েছিল বর্তমানে হিংসার কারণে কুখ্যাত আফগানিস্তান অঞ্চলে। এর থেকে একটি সত্য স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়ে ওঠে যে নিষ্ঠাবান মুসলমান হিসেবে জীবন-যাপন করেও একজন ব্যক্তি বৃহত্তর মানবসমাজের মর্মের নাগাল পেতে সক্ষম হয় এবং সেই জনগোষ্ঠীর উপর কোনরকম বলপ্রয়োগ না করে বা রাজনৈতিক ক্ষমতার চাপে তাদের পিষ্ট না করে সেই বৃহত্তর মানবসমাজকে ইসলাম প্রবর্তিত মার্গে আকৃষ্ট করে নিয়ে আসাও তার পক্ষে সম্ভব হ'তে পারে। সুফিবাদী ধর্মীয় গুরুরা তাঁদের জীবদ্দশায় এবং পরবর্তীকালে তাঁদের অনুগামী উত্তরসুরিরা, উভয় পক্ষই জনমানসে অত্যন্ত মর্যাদার আসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন। একই সঙ্গে সেই সব সুফি সাধকদের স্মৃতিধন্য পবিত্র তীর্থকেন্দ্র বা দরগাগুলির রক্ষকেরাও যথেষ্ট শ্রদ্ধা ও সম্মানের পাত্র হিসেবে সমাজে গৃহীত হয়েছিলেন। তাঁদের অনুশীলিত ইসলামের ধারা ও সংশ্লিষ্ট ধর্মাচরণ জনসাধারণের কাছে মহিমান্বিত হয়ে প্রতিভাত হয়েছিল এই কারণে যে সুফি সাধকদের উপলব্ধিতে ও সাধনচর্যায় ইসলামের অর্থময়তায়

এক অন্য তাৎপর্য যুক্ত হয়েছে। সেই ইসলামের তাৎপর্য চূড়ান্ত পরিণতি পেয়েছে লায়লার প্রতি নিবেদিত মজনুর প্রেমের সমতুল্য ঈশ্বরের প্রতি তীব্র ভালোবাসায়, মহানবী মহম্মদ নির্দিষ্ট ঐতিহ্যের প্রতি গভীর শ্রদ্ধায় ও তাঁর প্রদর্শিত পথে অনুগমন করার ব্যাকুল অভিলাষে এবং শুধুমাত্র মুসলমান ধর্মাবলম্বীদের প্রতি নয়, এক বৃহত্তর মানবসমাজের প্রতি নিবেদিত ঐকান্তিক সেবাপরায়ণতায়। আমাদের মনে রাখতে হবে যে পবিত্র সুফি তীর্থকেন্দ্রগুলির জনপ্রীতি ও প্রভাব বৃদ্ধি হচ্ছে এমনই এক ঐতিহাসিক মুহূর্তে যখন রাষ্ট্রযন্ত্রের মদতপুষ্ট হয়ে ইচ্ছে করলেই বিভিন্ন মসজিদগুলিকে ধ্বংস করা সম্ভব হ'তে পারে।

সুফিবাদ এখনও একটি প্রাণের স্পন্দনে পূর্ণ ধর্মীয় আন্দোলন হিসেবে প্রবহমান এবং সমাজের বিভিন্ন স্তরের থেকে আগত এক বিপুল সংখ্যক ভক্তমন্ডলীকে আকৃষ্ট করে এই মতবাদ নিজস্ব ধর্মীয় পরিধির আওতায় টেনে আনছে : গ্রাম ও শহরে বসবাসকারী দরিদ্র শ্রেণীর জনগণ থেকে শুরু করে ঠগ-জোচ্চোর, কুকর্মে লিপ্ত অপরাধী ব্যক্তিদের থেকে রাজনীতিবিদ ও মন্ত্রীদেরও পর্যন্ত বিভিন্ন সুফি দরগায় প্রথা অনুযায়ী চাদর নৈবেদ্য হিসেবে উৎসর্গ করতে ও সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করতে দেখা যায়। সুফিবাদী সাধকদের সাধারণ্যে প্রচলিত ভাষায়, বিশেষতঃ আঞ্চলিক বাচনরীতিতে কথা বলায় পারঙ্গমতার কারণে এবং তাঁরা যে যোগলব্ধ অতিবাস্তবিক ক্ষমতা সম্পন্ন ব্যক্তিত্ব — জনমানসে এই প্রতীতি ও ধারণা বদ্ধমূল হয়ে থাকার কারণে বহু মানুষ এই ধর্মমতের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে থাকেন। তাদের মধ্যে কেউ কেউ সুফি সাধকদের প্রদর্শিত পন্থা ও উপদিষ্ট চর্যাগুলি অনুসরণ করে থাকেন। কিন্তু, বেশির ভাগ মানুষই আসেন দোয়া ও আশিস্ প্রাপ্তির আশায়।

কাওয়ালি এবং অন্যান্য সঙ্গীত ও নৃত্যশৈলীগুলিকে কেন্দ্র করেই ভক্তিবাদী ধর্মগুলি বেশিরভাগ ক্ষেত্রে রূপ পরিগ্রহ করে থাকে। চতুর্দশ শতকের প্রারম্ভে ভক্তিমূলক সঙ্গীতের আসরগুলি অনুষ্ঠিত করার ক্ষেত্রে বৈধতা অর্জন করার জন্য তাঁর জীবিতাবস্থায় প্রখ্যাত চিস্তিপন্থী সুফি সাধক নিজামুদ্দিন আউলিয়া এই ধরনের ধর্মাচরণের বিরোধী দিল্লীর উলেমাদের সঙ্গে অত্যন্ত তিক্ত দ্বন্দ্বে জড়িয়ে পড়েছিলেন। মূল ধারার সুন্নি ইসলামের হানাফি মতের ধর্মীয় ব্যাখ্যানে বিশ্বাসী ধর্মবিদ্যা বিশারদদের অভিমত অনুযায়ী সঙ্গীত হচ্ছে হারাম বা নিষিদ্ধ কাজ। পক্ষান্তরে, অধিকাংশ সুফিবাদী সন্তরা আল্লাকে স্মরণ করার জন্য ও ঈশ্বরপ্রীতিজাত তুরীয় আনন্দ লাভের উপায় হিসেবে বিভিন্ন পন্থার মধ্যে সঙ্গীতকেই এক প্রকৃষ্টতম পন্থা বলে মনে করে থাকেন।

আধুনিক কালে সংস্কারবাদী ইসলামের বিভিন্ন ধারা, যেমন গোঁড়া ধর্মীয় সংগঠন তব্‌লিঘি জামাত এবং জামাত-ই-ইসলামির মত রাজনৈতিক দলের হাতে সুফিবাদ আক্রান্ত হয়েছে। সঙ্গীত শ্রবণ ও চর্চা, হিন্দু মরমিয়া পরম্পরার থেকে নিজেদের মত ও দর্শনের উপযোগী বিবিধ ধারণা গ্রহণ করা এবং ভারতীয় সামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রতিবেশে অন্য কোন নতুন ধরনের উপাসনার প্রণালী প্রবর্তন করার মত সুফিদের বিভিন্ন ধর্মীয় আচার-অনুশীলনের বিধিগুলি কঠোরভাবে নিন্দিত হয়েছে। তাঁদের কারণেই যে ইসলামের দ্রুত প্রসার সম্ভবপর হয়েছে সুফিদের এই দাবি উপহসিত হয়েছে এই ধারণাবশত, যে তাঁদের দ্বারা প্রচারিত ও অনুশীলিত ইসলাম মানের নিরিখে ছিল নিকৃষ্ট।

এরই সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অন্য আরেকটি মাত্রা। যদিও চরমপন্থী ও জঙ্গী মতাদর্শে বিশ্বাসী রাজনৈতিক ইসলামের উৎপত্তি হয়েছে সাধারণত ওয়াহাবি মতের সমগোত্রীয় সংস্কারবাদী বা ইসলামের নিরঙ্কুশ প্রাধান্যে বিশ্বাসী মতবাদের গর্ভে, তবু ভক্তিমূলক ইসলাম ধর্ম বা সুফিবাদের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট মুসলমানেরাও কিন্তু মুসলমান ধর্মাবলম্বীদের সঙ্গে সম্বন্ধিত আন্তর্জাতিক রাজনীতির ক্ষেত্রে ভূমিকা পালনে নিজেদেরকে আর নিরপেক্ষ বা নিষ্পাপ অবস্থানে সীমাবদ্ধ রাখতে পারছে না। শত্রুতাপূর্ণ রাজনৈতিক পরিপ্রেক্ষিতে অন্য আর পাঁচটা গোষ্ঠীর মত সুফিবাদ কেন্দ্রিক ইসলামও আগ্রাসী হয়ে উঠতে পারে, যদিও এই মতবাদে বিশ্বাসী গোষ্ঠী সংস্কৃতিগতভাবে স্থান ও কালের দাবি মেনে নিজেদের উপযোগী করে গড়ে তুলতে এবং বিভিন্ন মরমিয়া ভাবধারার থেকে ধারণাগত উপাদান গ্রহণ করতে কখনোই বিরূপ হয় না। ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ থেকে এই উপমহাদেশের বিস্তৃত অঞ্চলগুলিতে ইসলাম ধর্মের প্রসারের কাজে অগ্রণী সুফিবাদী প্রবক্তাদের যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল তার প্রসিদ্ধি সুফি পরম্পরায় বিভিন্ন উৎসবের মাধ্যমে পালিত হয়ে এসেছে। বাংলাভাষী বিপুল সংখ্যক জনগণের মুসলমান ধর্ম অবলম্বন করা সেই ধর্মীয় কার্যক্রমের অন্তর্গত বিশেষ একটি পরিণাম। যদিও অল্প সংখ্যক গবেষক বা পন্ডিতদের বিচারে এই মুসলমান জনগোষ্ঠীর সারূপ্যগত পরিচয় আজও অস্পষ্টতার প্রহেলিকায় আবৃত থেকে গেছে। ...

অনুবাদ : পার্থ বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রাসঙ্গিক পাঠ্য-সূচী :

চিটিক্, উইলিয়ম ঈটন, রিচার্ড এম্ হক্, এনামুল কারামুস্তাফা, আহ্‌মেট্ টি. লতিফ্, শেখ্ আব্দুল রায়, অসীম

দিনদুপুরে চাঁদের উদয়
রাত পোহানো ভার

হেঁট মুণ্ড উর্দ্ধ পদে
যে দেশে বাস করেছ
সেই না দেশের কথা রে মন
ভুলে গিয়াছ

মরমি সাধক পাঞ্জু শাহ

সুরজিৎ সেন

১.

বাংলার ফকিরদের মধ্যে লালন সাঁইয়ের স্থান সর্বোচ্চ। লালনের পর বাংলার ফকিরদের মধ্যে যাঁর প্রভাব সবচেয়ে বেশি দেখা যায় তিনি হলেন ফকির পাঞ্জু শাহ (১৮৫১-১৯১৪)। লালন যখন মারা যান (১৮৯০) তখন পাঞ্জু শাহর বয়স উনচল্লিশ বছর। লালন পরবর্তী পঁচিশ বছর পাঞ্জু লালনের অভাব অনেকটাই পূর্ণ করেছিলেন। পূর্বসুরি লালনের ভাবধারায় নিজেকে তৈরি করেন পাঞ্জু, মগ্ন হয়ে যান সাধনায় এবং পদ রচনায়। এই সাধকের পদাবলী উনিশ শতকের শেষের দিকে ও বিশ শতকের প্রথম দিকে বাংলা দেহতত্ত্বের গানে একটি স্বতন্ত্র ঘরানা তৈরি করে। এই কারণেই পাঞ্জু শাহর জীবনেতিহাস বাংলার সাংস্কৃতিক ইতিহাসে গুরুত্বপূর্ণ।

সাধক পাঞ্জু শাহর জীবন সম্পর্কে কিছু লেখার আগে শিরোনামে ব্যবহৃত *মরিম* শব্দটিকে বুঝে নেওয়া প্রয়োজন, ইংরাজি মিস্টিক (mystic) শব্দের বাংলা রূপান্তর হল মরমি। মরমি বলতে বোঝায় অস্পষ্ট, গোপন ও রহস্যময় বিষয় যা হৃদয় দ্বারা অনুভূত হয়। আবার এই বিশ্ব প্রকৃতির স্রষ্টার সঙ্গে প্রত্যক্ষ সংযোগ যিনি করতে পেরেছেন তাঁকেও মরমি বলা হয়। কাজী আব্দুল ওদুদ ও অনিলচন্দ্র ঘোষ রচিত বাংলা ব্যবহারিক শব্দকোষ — এ লেখা আছে, পরম সত্যের সহিত যাহারা মর্মের যোগ ঘটিয়াছে তিনিই মরমি। এই সংজ্ঞাকে অনুসরণ করে বলা যায়, দার্শনিক প্রমাণ দ্বারা নির্ণীত তাঁর সিদ্ধান্তকে বলা যায় মরমিবাদ।

মরমিবাদ বস্তুগত বিচার বিশ্লেষণের বিষয় নয়। এ এমন এক অতীন্দ্রীয় অনুভূতি যার মাধ্যমে অবাঙমানসগোচর সেই পরম সত্তাকে ভাবুক অন্তরের নিথর স্তব্ধতায় অনুভব করেও তাকে বলতে বা ব্যাখ্যা করতে পারে না। রবীন্দ্রনাথের কথায়, বন্ধনের মধ্যে মুক্তির আস্বাদ, দেহে থেকেও দেহাতীতের স্পর্শানুভব, বিরহের মধ্যে মিলনের রস উপভোগ, সুদূরকে নিকটতম রূপে পাওয়া, নিকটতমকে সুদূরের ভ্রমে ধরার আকাঙ্খা, প্রাপ্তির মধ্যে অপ্রাপ্তির বেদনা, একাকীত্বের মধ্যে পূর্ণতার আস্বাদন, বিষাদের মধ্যে আনন্দের প্লাবনকে অনুভব করেন মরমীরা। আর এই অনুভবের মূলে আছে প্রেম। সাধারণের

চোখের দেখার বাইরে যে অতীন্দ্রীয় জগৎ আর শাশ্বত আধ্যাত্ম প্রেম চিরন্তন। মরমীরা এই চিরন্তনবাদে বিশ্বাসী। মানুষ যে উৎস থেকে এসেছে, সেই উৎসে ফিরে যাবে। আল কোরানে সুরা বাকরার ১৫৬ আয়াতে লেখা *ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্ন ইলাইহি রাজিউন* অর্থাৎ আমরাতো আল্লাহরই এবং নিশ্চিতভাবে তাঁহারই দিকে প্রত্যাবর্তনকারী। যাঁর কাছ থেকে এ জীবজগতের যাত্রা শুরু হয়েছে এবং দীর্ঘ পথ পরিক্রমা শেষে একদিন তাঁর সাথে জীবের মিলন কি হবে? এ প্রশ্নের উত্তর খোঁজার উৎকণ্ঠা মরমি চিন্তার আরেকটি উৎস।

নশ্বর দেহের মধ্যেই অবিনশ্বর সত্তার বসত। বাইরে না খুঁজে আপন দেহমধ্যে খোঁজ করলে তাঁকে পাওয়া যায়। মরমি মনের এই আত্ম অনুসন্ধানের ইচ্ছা থেকেই মরমিবাদের উৎপত্তি। বিশ্বের কোথায় সর্বপ্রথম মরমিবাদের আত্মপ্রকাশ ঘটে তা নিশ্চিত করে জানা যায় না। গবেষকদের মতে মরমিবাদ অনেক ধর্মমতেরই গুরুত্বপূর্ণ অংশ। প্রাচ্যের আদিম ধর্মমতসমূহ, বৈদিক মতবাদ, চিন — ভারতের বৌদ্ধমত, ইহুদী মতবাদ, গ্রীক মতাদর্শ, খ্রিস্টান ধর্মমত ও ইসলাম ধর্মে মরিম চিন্তার খোঁজ পাওয়া যায়। আরও জানা যায়, এই মরমিবাদ ইসলাম প্রভাবিত দেশগুলিতে ছড়িয়ে পড়ে এবং মিশর, তুরস্ক, পারস্য ও ভারতবর্ষে এর প্রভাব সবচেয়ে বেশি দেখা গেছে।

ইসলাম দর্শনে মরমিবাদের তাৎপর্য গভীর। ইসলামে নিহিত মরমিবাদ *সুফিবাদ* নামেই পরিচিত। মরমি শব্দটি আরবি, ফারসি ও তুর্কি — মুসলমানদের এই তিনটি প্রধান ভাষায় সুফি নামে পরিচিত। আর সুফি সাধক বললে মরমিবাদের সেইসব সাধকদের বোঝায় যাঁরা ইসলামের অনুসারী।

আরবি শব্দ সুফ থেকেই সুফি শব্দের উৎপত্তি। সুফ কথাটির অর্থ পশম। এর নিকটতম শব্দ *তাসাউফ*, যার অর্থ পশমি বস্ত্র পরিধান করার অভ্যাস। মরমি তত্ত্বের সাধনায় নিজেকে নিয়োজিত করার কাজকেও তাসাউফ বলা হয়। এরূপ সাধনায় আত্মসমর্পিত ব্যক্তি ইসলামে সুফি নামে পরিচিত। সুফিরা পশমের পোশাক পরতেন এবং মহম্মদ সহচর কিছু সাধক সুফি সাধনায় মগ্ন থাকতেন। তাঁরা নিজেদের যেমন পশমের পোশাকে ঘিরে রাখতেন তেমনি তাঁরা ঘিরে রাখতেন তাঁদের প্রিয় নবি হজরত মহম্মদকে।

হজরত মহম্মদের পর তাঁর শিষ্যরা এই ভক্তিভাবের ভাবুক হয়ে ওঠেন। সুফিরা অনাড়ম্বরপ্রিয়, প্রচারবিমুখ, সুফি সাধক যখন গুরুর নিকট দীক্ষালাভ করে ধ্যানস্থ হন, তখন বাহ্য জগতকে নিজের মতের স্বপক্ষে আনার ইচ্ছে তাঁর মনে

আসে না। এইজন্যে এক সুফি সাধক থেকে অন্য সুফি সাধকের মতের পার্থক্য দেখা যায়। এই দিক থেকে সুফিমতকে ব্যক্তিগত মতও বলা যায়। সুফি সাধক যে সত্যে পৌঁছান তা অপরকে বলে বোঝানো সম্ভব নয়। অপরের ধর্মমতের সঙ্গে তাঁর বিরোধ নেই, আসলে ধর্মের আকারভেদে কিছুই যায় আসে না, তার অন্তর্নিহিত সত্যই আসল বস্তু, সেখানে কোনো বিরোধ নেই। সুফি তাঁর ইতিহাসের জন্য কোরানের বাইরে যান না। হজরত মহম্মদ বলেছেন, যা আমি জানি, তোমরা তা জানলে অল্প হাসতে ও বেশি কাঁদতে। হজরত আলি তাঁর বুকের দিকে ইশারা করে বলেছেন, আমার এখানে যে তত্ত্বজ্ঞান নিহিত আছে তা প্রকাশ করতাম যদি যোগ্য পাত্র পেতাম। আবু হোয়ায়রা হাদিসের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেছেন, হজরত রাসুলের কাছ থেকে দুই প্রকার এলম (জ্ঞান) রেখেছি। এক প্রকার সাধারণে প্রকাশ করেছি। অন্য প্রকার প্রকাশ করলে নিশ্চয় আমার কণ্ঠনালী কাটা যাবে।

কোরানের ভাষা ইঙ্গিতপূর্ণ ও রূপকে পরিপূর্ণ। সুফিরা কোরানের সূক্ষ অর্থের ভিতর প্রবেশ করেছেন। তাঁরা ইসলামের আল্লাহকে সৃষ্টি হতে পৃথক দেখেন না। কোরানের একটি আয়াতে বলা হচ্ছে *কুনতো কানজান মাগফিয়ান ফাহবাবতু আন ওরাফা ফা-খালাকতোল খালকা* -এর অর্থ আমি গুপ্ত ভাণ্ডার ছিলাম, আমার ইচ্ছা হল নিজেকে প্রকাশ করব, তাই সৃষ্টি করেছি এবং সৃষ্টির ভেতর দিয়ে নিজেকে প্রকাশ করছি। ইসলামের কঠোর নিয়মানুবর্তিতা ও শাস্ত্রবচনসার সামাজিকতা ভক্তিপ্রবণ মুসলমানের মনে শান্তি দিতে পারেনি। ঈশ্বর ভক্তিতে আকুল ভক্তরা চাইতেন নিজের নিজের মনের মত আল্লাহর ভজনা করতে। তাঁর কতকগুলো পদ্ধতি তাঁরা প্রবর্তন করেন। এগুলো গুরু-শিষ্য পরম্পরায় চলতে থাকে।

সুফি শব্দের উৎপত্তি সম্পর্কে আরেকটি মত হল, মদিনায় ইসলাম প্রচারের প্রাথমিক যুগে মদিনার মসজিদ সংলগ্ন নির্জন স্থানে অবস্থানরত সংসার নির্লিপ্ত আল্লাহ প্রেমিক একদল লোক *আহলুস সাফফা* নামে পরিচিত হয়। এই *সাফফা* শব্দটি থেকেই সুফি শব্দটির উদ্ভব বলে অনেকে মনে করেন।

মরমিবাদের শ্রেষ্ঠতম বিকাশ এই সুফিবাদ। আরবের মরুভূমিতে জন্ম নিয়ে সুফিবাদ গিয়ে পৌঁছয় পারস্যে। সেখানে এই ভাবধারা শতফুলে বিকশিত হয়। এরপর ছড়িয়ে পড়ে তুরস্ক, মিশর, সিরিয়া ও ইউরোপের অন্যান্য দেশে। খ্রিস্টিয় একাদশ শতাব্দীতে ভারতীয় উপমহাদেশে সুফিবাদ আসে, যদিও মনে

করা হয় অষ্টম শতাব্দীতেই এই ভাবধারা আরব বণিকদের হাত ধরে এদেশে ঢুকে পড়েছিল।

সুফিদের মধ্যে শাহ সুলতান রুমি বাংলাদেশে মরমিবাদ নিয়ে আসেন। শশিভূষণ দাশগুপ্তের মতে ভারতীয় উপমহাদেশেও সুফি মরমিবাদ নিয়ে আসেন ইনি। খ্রিস্টিয় ত্রয়োদশ শতক থেকে চিশতিয়া ও সুরাবর্দিয়া ঘরানার সুফিরা ভারতবর্ষ তথা বাংলায় তাদের ভাবধারা নিয়ে প্রচার চালায়। বাংলায় আসার পর সহজিয়া সাধনপন্থা দ্বারা সুফিবাদ প্রভাবিত হয়। মরমি শব্দটিকে এবার কিছুটা বোঝা যাচ্ছে।

২.

এবার সাধক পাঞ্জু শাহের জীবনের দিকে তাকানো যাক। পাঞ্জু শাহ তাঁর নিজের একটি রচনায় জানাচ্ছেন পাঠান বংশে তাঁর জন্ম। পাঞ্জুর ঊর্ধ্বতন সপ্তম পুরুষ ছিলেন নোয়াবেশ খাঁ। ইনি আফগানিস্তান থেকে বাংলায় আসেন এবং বাংলার তৎকালীন সুবেদারের সুপারিশে দিল্লির বাদশার (শাহজাহান) ফরমানে যশোহর জেলার শৈলকুপা অঞ্চলে জমিদারি লাভ করেন। নোয়াবেশ খাঁ থেকে পাঞ্জু শাহ পর্যন্ত বংশ তালিকাটি এইরকম —

নোয়াবেশ খাঁ — দুদ্দু খাঁ — এলেচ বা ইলিয়াস খাঁ — আফজল খাঁ — আবদুস সোহবান খোন্দকার — খাদেমালী খোন্দকার — পাঞ্জু শাহ। দেখা যাচ্ছে আফজল খাঁ পর্যন্ত এঁরা 'খাঁ' উপাধি ব্যবহার করতেন, কিন্তু আবদুস সোহবানের আমলে ঐ উপাধি বদলে 'খোন্দকার' হয়েছে।

'খোন্দকার' শব্দের আভিধানিক অর্থ 'অধ্যাপক' বা 'শিক্ষক'। ব্যবহারিক ক্ষেত্রে ধর্মীয় শিক্ষক বোঝাতেও 'খোন্দকার' শব্দের প্রয়োগ বিশেষভাবে লক্ষণীয়। মুসলিম সমাজে যাঁরা পীর বা মুরশিদরূপে পরিচিত, তাঁরাই 'খোন্দকার' বা 'খনকর' নামে পরিচিত। এছাড়া বিয়ে পড়ানো, মসজিদে ইমামতি করা, ঈদের জামাত পরিচালনা করা, মৃত ব্যক্তির জানাজা পড়া ইত্যাদিও খোন্দকারদের কাজ। যদিও আবদুস সোহবান পীরগিরি করেই 'খোন্দকার' উপাধি লাভ করেন।

আবদুস সোহবানের একমাত্র পুত্র খাদেমোলী খোন্দকার এই বংশের শেষ জমিদার। এনার মধ্যে ধর্মীয় চেতনা প্রবল থাকায় জমিদারীর দেখাশোনা সেভাবে করতেন না। সেই সুযোগে জমিদারীর তত্ত্বাবধায়ক গোমস্তার ষড়যন্ত্রে দেনার দায়ে জমিদারী নিলামে ওঠে এবং সেই গোমস্তা সস্তায় তা কিনে নেয়। এ

জানতে পেরে খাদেমালী গোমস্তার বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নিতে তৎপর হন। তখন গোমস্তা কিছু দুর্বৃত্তকে টাকা দিয়ে বশ করে জমিদারের প্রাণনাশের ষড়যন্ত্র করলে খাদেমালী এক রাতের আঁধারে শৈলকূপা ছেড়ে পাশের গ্রাম হরিশপুরে চলে যান।

হরিশপুরে তাঁর বড় জামাই পরাণ কাজীর বাড়ি। এছাড়া হরিশপুরের জোতদার — ফকির মামুদ বিশ্বাসের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল অনেক আগে থেকেই। তাই জোতদার বন্ধু খাদেমালীকে তাঁর জমিতে ঘরবাড়ি করে দেন। সেই থেকে তিনি হরিশপুরের স্থায়ী বাসিন্দা হন। পাঁচ সন্তানের জনক খাদেমালীর বাকি জীবন কাটে দারিদ্রের মধ্যেই। হরিশপুরে তাঁকে আমরা দেখতে পাই মসজিদে ইমাম, সমাজের মোল্লা ও একজন গোঁড়া ইসলাম প্রচারকের ভূমিকায়।

৩.

১২৫৮ বঙ্গাব্দের (১৮৫১ খ্রীস্টাব্দ) ২৮ শ্রাবণ ঝিনাইদহ জেলার শৈলকূপা গ্রামে খাদেমালী খোন্দকারের তৃতীয় পুত্র পাঞ্জু শাহের জন্ম। পাঞ্জুর জন্মের কিছুদিন পরেই তাঁর বাবাকে হরিশপুর চলে যেতে হয়। এ বিষয়ে পাঞ্জু তাঁর কবিতাতেই লিখেছেন, *বসতি মোকাম মেরা হরিশপূর গ্রাম*। দারিদ্রের কারণে পাঞ্জুর শৈশবের দিনগুলি সুখের ছিল না। একজন কঠোর সংগ্রামী মোল্লার ছেলে হিসেবেই তিনি বেড়ে উঠেছিলেন। স্কুলে যাবার তাঁর উপায় ছিল না, তাই গৃহশিক্ষকের কাছে আরবি ও ফার্সি শিখেছিলেন তিনি।

পাঞ্জুর বাবা যেহেতু গোঁড়া শরিয়তি ছিলেন, তাই বাংলা ও ইংরেজি ভাষার তিনি ছিলেন বিরোধী। ফলত ষোল বছর বয়স পর্যন্ত পাঞ্জুর বাংলা ভাষা শেখা হয়নি। কিন্তু বাঙালি হয়ে জন্মে ও বাঙালি সমাজে বেড়ে ওঠার কারণে পাঞ্জু বুঝতে পারেন যে, বাংলা ভাষা না শিখলে নিজের ভাবনার সম্পূর্ণ বিকাশ হবে না আর প্রতিবেশি বন্ধুদের ভাবনাও বোঝা যাবে না। এই উপলব্ধি থেকে ষোল বছর বয়সে তিনি স্থানীয় পাঠশালার শিক্ষক ও তাঁর প্রতিবেশি মহর আলি বিশ্বাসের কাছে গোপনে বাংলা ভাষা শিখতে শুরু করেন।

সেই সময়ে হরিশপুর গ্রামে সুফি ফকিরদের মধ্যে জহরুদ্দিন শাহ, পিজিরদ্দিন শাহ, লালন শিষ্য দুদ্দু শাহ ইত্যাদি সুফি তত্ত্ববিদ ও বাউল সাধক মদনদাস গোস্বামী, যাদুনাথ সরকার, হারানচন্দ্র কর্মকার প্রভৃতি সমবেতভাবে বৈষ্ণব সাহিত্য, বেদান্ত, ইসলামের তাসাউফের গভীর তত্ত্ব নিয়ে আলোচনা

করাতেন। এইসব মজলিশে সুফি, বাউল ও ভাবসঙ্গীত গাওয়া হত, গাওয়া হত কীর্তন। কিশোর পাঞ্জু গোপনে এইসব মজলিশে যেতেন। ক্রমশ এইসব গান এবং হিন্দু-মুসলমানের আধ্যাত্ম সাধনা তাঁর মনকে আকৃষ্ট করে। কিন্তু গোঁড়া শরিয়তি বাবার কারণে পাঞ্জু সবসময়ে শঙ্কিত হয়ে থাকতেন।

কিছুদিন শেখার পর সংসারের আর্থিক দায় ঘাড়ে এসে পড়ায় তাঁর পড়াশোনা বন্ধ হয়ে যায়। চব্বিশ বছর বয়সে চুয়াডাঙা জেলার আইলহাস-লক্ষীপুরের বাসিন্দা আবদুর রহমান খোন্দকারের মেয়ে সন্দন্নেসার সঙ্গে তাঁর বিয়ে হয়, বিয়ের দু'বছর পরে প্রথম পুত্রের জন্ম হয়। এরপর কয়েক বছরের মধ্যে দুই কন্যার জন্ম হয়। সংসারের দায়িত্ব নেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পাঞ্জু বৈষয়িক কাজেও পারদর্শী হয়ে ওঠেন। বসতবাড়ি ছোট ভাই ওয়াসীমউদ্দিন খোন্দকারকে ছেড়ে দিয়ে তিনি সাত বিঘে জমি কিনে সেখানে বাড়ি করে থাকতে শুরু করেন। এছাড়া তিনি পঁচিশ বিঘে চাষের জমি কিনেছিলেন। এসময় তাঁর আর্থিক অবস্থা একটু ভাল হয়। ইতিমধ্যে বেশ কয়েক বছর আগে, পাঞ্জুর বয়স তখন সাতাশ, তাঁর বাবা খাদেমালী প্রয়াত হলেন। বাবা মারা যাবার পর ফকিরদের সঙ্গে অবাধ মেলামেশায় আর কোনো বাধা রইল না।

৪.

পাঞ্জু শাহ কীভাবে মরমি চেতনার প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়লেন, সে বিষয়ে ধারণা পেতে গেলে তাঁর পারিবারিক পরিবেশ, সামাজিক অবস্থা ও বাংলার মাটির প্রভাব ইত্যাদি বিষয়ে একটু জানা দরকার।

বাবার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র, নিরুপায় হয়ে বাবার জমিদারি ত্যাগ, বাসস্থান ছেড়ে উদ্বাস্তু জীবনে প্রবেশ, বাবার পরনির্ভর জীবিকা, মোল্লাগিরি — এসব ছোট থেকেই তাঁর মনে যে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছিল, তার ফলে ভোগের বাসনা, আভিজাত্যের বাহাদুরি, ক্ষমতার লোভ থেকে তিনি নিজেকে মুক্ত রাখতে পেরেছিলেন। পরবর্তীকালে পারিবারিক রীতি অনুযায়ী যখন তাঁকে শুধু আরবি-ফার্সি শিখতে হয়, তখন মাতৃভাষা প্রীতি, দেশীয় সংস্কৃতির প্রতি শ্রদ্ধাবোধ এবং মাটি ও মানুষের প্রতি ভালবাসা তাঁকে পারিবারিক সামন্ততান্ত্রিক প্রথার বিরুদ্ধে বিদ্রোহী করে তোলে। সেইজন্য তিনি গোপনে বাংলা ভাষা শিখেছিলেন। তাঁর উদাসী কবিমন বাইরের জগতে ঘুরে বেড়িয়েছে, আবহমান বাংলার চিন্তাধারায় উদ্বুদ্ধ হয়ে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে আত্ম-পরিবার বলে গ্রহণ করেছে, অজান্তে অচেতনে উচ্চারিত হয়েছে বসুধৈব কুটুম্বকম্।

উনিশ শতকের মুসলমান সমাজ সব বিষয়ে অত্যন্ত পিছিয়ে পড়ে। গ্রামে হিন্দু-মুসলমান মিলিত সমাজে মুসলমানের অবস্থা ছিল শোচনীয়। উইলিয়াম হান্টার এই বিষয়ে লিখেছেন, 'একটি বিরাট ঐতিহ্যের অধিকারী হয়েও তাদের কোনো জীবনোপায় নেই ... তারা দেনাগ্রস্ত হয়ে পড়ে ... প্রতিবেশী হিন্দু মহাজন ঝগড়া বাঁধিয়ে দেনার দায়ে তাকে সম্পত্তি বিক্রি করতে বাধ্য করে ... নিম্নবঙ্গের মুসলমানদের আমি বেশি চিনি এবং তারা বৃটিশ শাসনে সবচেয়ে বেশি নির্যাতিত হয়েছে ... যদি কখনো একটা জাতি জীবনোপায়শূণ্য হয়ে থাকে, সেটা হল নিম্নবঙ্গের মুসলমানেরা ... একশো সত্তর বছর আগে বাংলার একজন ভদ্র মুসলমানের গরীব হওয়া অসম্ভব ছিল, এখন তার পক্ষে ধনী হয়ে চলাই অসম্ভব। ... সামরিক, বিচার, রাজস্ব ও রাজনৈতিক বিভাগ থেকে মুসলমানদের ঘরে যে অজস্র ধারায় অর্থ আসত, এখন সেসব বন্ধ হয়ে গেছে।' এই সামাজিক দৈন্যতারই শিকার হয়েছিলেন পাঞ্জুর বাবা খাদেমালী খোন্দকার। এই পরিণতি মেনে নিতে তাঁকে আশ্রয় নিতে হয়েছিল ধর্মীয় গোঁড়ামির কাছে।

কিন্তু ধর্মীয় গোঁড়ামি ও সামাজিক অবক্ষয় নীচুতলার মানুষের প্রতি পাঞ্জুর মনকে সহানুভূতিশীল করে তুলেছিল। তাই তিনি কৃষিজীবী সমাজের গরীব মানুষের মনের কথা বুঝেছিলেন।

প্রাচীন বৌদ্ধ যুগ কিংবা ব্রাহ্মণ্য যুগ থেকে সপ্তদশ শতাব্দী পর্যন্ত কৃষিজীবী সমাজ অনুন্নত আদিম স্তরেই থেকে গেছে। লোকায়ত সংস্কৃতি তাদের যে জীবন বেদ দিয়েছে, সেখানে দেহ ছিল একই সঙ্গে অস্ত্র ও অনুষ্ঠান, সন্তান ও ধন উৎপাদনের জন্যে। পরবর্তীকালে সামাজিক পরিবর্তনের ফলে সেইসব লোকজ ধ্যান-ধারণা লুপ্ত হলেও থেকে গেছে দেহের স্মৃতি। সেই স্মৃতিই তাঁদের জীবন বেদ, তার ওপর প্রভাব পড়েছে ধর্ম ও সংস্কৃতির, ঈশ্বরে আত্মসমর্পণ তাই এই মানুষদের জীবনে এক সান্ত্বনা। লালন শাহ ও দুদ্দু শাহেরও ছিল একই উপলব্ধি। তাই একথা বলা যায় যে, কৃষিজীবী জীবন ধারা ও দরিদ্রতম সমাজ থেকে পাঞ্জু তাঁর মরমি চেতনার সূত্র খুঁজে পেয়েছিলেন।

বাংলার মাটির প্রভাব এমনই যে, এদেশের মানুষকে তা ভাবুক করে তোলে। সংসারের মধ্যে থেকেও এ দেশের মানুষ রণক্ষেত্র অপেক্ষা সাধনক্ষেত্র বেশি পছন্দ করে। সে সাধনা মূলত জীবনসাধনা। এই মাটির প্রভাবে পাঞ্জুও মরমি সাধনার পথের পথিক হয়ে পড়েন।

৫.

মরমি চেতনা পাঞ্জুর মনকে এতটাই আলোড়িত করে তুলেছিল যে, বাবার মৃত্যুর পর মাঝে মাঝেই গভীর রাতে তিনি সকলের অগোচরে মরমি সাধকদের ঘরে চলে যেতেন। সেখানে তত্ত্বালোচনায় সারারাত কাটিয়ে ভোরে বাড়ি ফিরতেন। এভাবে কিছুদিন চলার পর তিনি তত্ত্বজ্ঞানের হদিশ পেলেও সেই জ্ঞানের যে গভীর দ্যোতনা তা বুঝতে পারছিলেন না। এসময় তাঁর মনে হয় গুরু না ধরলে এসব বোঝা যাবে না। গুরুর সন্ধানে পাঞ্জু বেরিয়ে পড়েন। বাংলার বিভিন্ন সুফি সাধকদের আশ্রম ঘুরে তিনি আসাম যান। সেখানে গুরুর সন্ধান না পেয়ে যান মধ্যপ্রদেশে, সেখান থেকে পাঞ্জাব ও সিন্ধু প্রদেশ ঘুরে তিনি পৌঁছে যান সুদূর খোরসান। এভাবে তিনি ছুটে বেড়িয়েছেন একজন কামেল (পূর্ণ মানব) মুরশিদের খোঁজে। কিন্তু গুরুর সন্ধান না পেয়ে তিনি হরিশপুরে ফিরে আসেন।

এই গুরুসন্ধান প্রসঙ্গে পাঞ্জু গবেষক ডক্টর এস.এম লুৎফর রহমন একটি তথ্য পেশ করেছেন তা এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন। এঁর বক্তব্য :

পাঞ্জু শাহ প্রথমে লালন শাহের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। কিন্তু তিনি লালন শাহীর ঘরের মতানুযায়ী জীবন যাপনে ব্যর্থ হওয়ায় (অর্থাৎ বিবাহিত জীবনে সন্তানের জন্ম দেওয়ায়) লালন তাঁকে স্বগোষ্ঠী থেকে বিচ্যুত করেন। এরপর পাঞ্জু অন্য গুরুর শরণাপন্ন হল এবং লালন শাহী মত ত্যাগ করে ভিন্ন মতের সাধনায় মন দেন।

পাঞ্জু শাহের জীবনীকার ডঃ খোন্দকার রিয়াজুল হক জানাচ্ছেন এই তথ্য ঠিক নয়। অর্থাৎ এই তথ্যটি বিতর্কিত। যাই হোক, গুরু না পাওয়ায় মনে অশান্তি, এমন সময় হরিশপুরের দক্ষিণে হিরাজতুল্লাহ খোন্দকারের সঙ্গে তাঁর আলাপ হয়। এই সাধককে পাঞ্জু আগে থেকেই চিনতেন, কিন্তু পরিচয় ছিল না। কিছুদিন কথাবার্তা হবার পর পাঞ্জুর মনে হয় ইনিই তাঁর গুরু। পাঞ্জু তাঁর কাছে মনের কথা জানাতে হিরাজতুল্লাও তাকে বুকে টেনে নেন।

পঁয়তাল্লিশ বছর বয়সে পাঞ্জু শাহ খেরকা বা ফকিরি পোশাক গ্রহণ করেন। এই সময় থেকে শুরু হয় তাঁর পূর্ণ সাধক জীবন। আখড়া তত্ত্বাবধানের জন্য তাঁর আরো একজন জীবন সঙ্গিনীর প্রয়োজন দেখা দেয়। তখন তিনি কুষ্টিয়ার কুমারখালির আফিলউদ্দিন প্রামাণিকের মেয়ে পাঁচি নেসাকে বিয়ে করেন। এই বিবাহে তাঁর তিন পুত্র ও এক কন্যা জন্মে। উভয় স্ত্রীকেই কবি সমান মর্যাদা দিতেন। প্রথম জনকে তিনি 'রজনী' ও দ্বিতীয় জনকে 'প্রেয়সী' বলে ডাকতেন।

ব্যক্তিগত জীবনে পাঞ্জু ছিলেন খুবই সাধাসিধা। সামান্য ডালভাত খেয়ে থাকতেন। মাছ খেলেও মাংস খেতেন না। তাঁর শিষ্যরাও অনেকে তাঁকে অনুসরণ করে মাংস খেতেন না। ১৩২১ বঙ্গাব্দের (১৯১৪ খ্রিস্টাব্দ) ২৮ শ্রাবণ ৬৩ বছর বয়সে প্রয়াত হন। হরিশপুরে তাঁর আখড়াবাড়ির উঠোনে তিনি সমাহিত আছেন। দুই স্ত্রী তাঁর দুই পাশে শায়িতা। উল্লেখ্য, পাঞ্জু ও তাঁর স্ত্রীদ্বয়ের কবর পশ্চিম শিয়রী, অর্থাৎ সাধারণত মুসলমানদের কবরে শোয়ানোর পর মুখটি কাবার দিকে ঘুরিয়ে দেওয়া হয়, এঁদের ক্ষেত্রে তা করা হয়নি। পাঞ্জুর অন্তিম অনুরোধেই ওভাবে তাঁদের সমাহিত করা হয়েছে। ব্যতিক্রমী এই মাজার দর্শনে বহু লোক আসেন।

৬.

মরমি সাধকদের পরিচয় জানতে হলে তাঁদের গুরু পরিচিতি বিশেষ প্রয়োজন। তাঁদের মতে গুরুই পথের দিশারী। গুরুকে এঁরা সাঁই বলেন, এঁরা অরূপ খোদাকে রূপময় গুরুরূপে ভজনা করেন। গুরুর স্থান সবার উপরে। তাই পাঞ্জু শাহের গুরু হিরাজতুল্লার একটু পরিচয় দেওয়া দরকার। পাঞ্জু তাঁর গুরুর পরিচয় দিতে গিয়ে লিখেছেন,

জানিবে যে খোন্দকার হিরাজতুল্লায়।
আমার গুরুজী তিনি বড় দয়াময়।।
মোকাম তিনার যে হরিশপুর গ্রাম।
অধীনের তথা বাসা জানিবে তামাম।।

হিরাজতুল্লার বাবা গুলুব্দি শেখ ছিলেন পেশায় মোল্লা। তাই শেখ পদবীর বদলে তার পদবী হয় 'খোন্দকার'। হিরাজতুল্লা আরবি ও ফারসি ভাষায় দক্ষ ছিলেন, কোরান ও হাদিসে তিনি পণ্ডিত ছিলেন। বাবার প্রভাবে তাঁর মনে ধর্মভাব জাগ্রত হয়। দারিদ্রের মধ্যে জীবন যাপন করেও তিনি আদর্শ মানুষ হিসেবে গড়ে ওঠেন।

যৌবনে কুষ্টিয়া জেলার আব্দুল মালেক খোন্দকারের মেয়ে সবুরন্নেসার সঙ্গে হেরাজের বিয়ে হয়। বিয়ের কিছুদিন পরেই তাঁর বাবা মারা যান। এরপর সংসারের যাবতীয় দায়িত্ব তাঁকে নিতে হয়। একই সঙ্গে তিনি ঈশ্বর ভাবনায় ব্যাকুল হয়ে ওঠেন। ঐশি সাধনার জন্য তিনি একজন দীক্ষাগুরুর প্রয়োজন অনুভব করেনে। সেই সময় শাহ মহম্মদ সোনাউল্লাহ নামক এক সুফি সাধকের কাছে তিনি দীক্ষা নেন। সুফিতত্ত্বের বিভিন্ন স্তরের বিশেষ সাধনায় তিনি বারো

বছর কাটালে গুরু তাঁকে খেলকা বা ফকিরি পোশাক দান করন। ১২৯৮ বঙ্গাব্দের (১৮৯১ খ্রী.) ২০ শ্রাবণ ৭৯ বছর বয়সে হিরাজতুল্লা মারা যান। এ বিষয়ে পাঞ্জু লিখেছেন,

আমার গুরুজী সোবে রেখে ভবপরে।
বারশ অষ্ট নব্বই সালে মঙ্গলবারে।।
শ্রবণ মাসেতে বিশ তারিখ যেইদিন।
ইন্তেকাল হন তিনি কহে দীনহীন।।

বংশলিপি বা কুরশিনামা থেকে যেমন পূর্বপুরুষদের নাম জানা যায়, তেমনি ফকির দরবেশদের গুরু পরম্পরার তালিকা বা সিজারনামা থেকে সাধকদের আধ্যাত্মিক ইতিহাস জানা যায়। এবার আমরা পাঞ্জুর গুরু হিরাজতুল্লার সিজারনামার দিকে তাকালে দেখব সেই গুরু শিষ্য পরম্পরা হজরত আলি থেকে চলে আসছে।

হজরত আলি - হাসান বসরি - আবদুল ওয়ারেদ বিন জায়েদ - কুজায়েল বিন আয়াজ - ইব্রাহিম আদাহাম বল্‌খি - খাজা মারিয়াশী - খাজা ছবরায়তুল বসরী - খাজা মিমশাদ উলবী দিনওয়ারি - খাজা আবু ইসহাক শামী চিস্তি - খাজা আবু আহমদ চিস্তি - কাজা আবু মহম্মদ চিস্তি - খাজা আবু ইউসুফ চিস্তি - খাজা মওদদ চিস্তি - হাজি শরীফ জিন্দানি - খাজা ওসমান হারুণী - খাজা মইনুদ্দিন চিস্তি - খাজা কুতুবুদ্দিন বখতিয়ার কাকী - শেখ ফরিদুদ্দিন গঞ্জ-ই শোকর - নিজামুদ্দিনআউলিয়া - আখী সিরাজুদ্দিন - শাহ রহমতুল্লহ - শাহ বড় দস্তগীর - শাহ আব্দুর রহিম - শাহ জয়নুচ্ছাদেকীন - শাহ ফয়জুল্লাহ - শাহ কুদুরুতুল্লাহ - শাহ সোনাউল্লাহ - হিরাজতুল্লাহ খোন্দকার।

৭.

পাঞ্জু শাহের আত্মদর্শনটি এবার একটু বোঝার চেষ্টা করা যাক। মরমি সাধক লালনের সঙ্গে তাঁর চিন্তাধারার মিল পাওয়া যায়। ভারতীয় সাধনার ধারায় যেভাবে ব্রহ্ম বা শূণ্যের উপর অধিকতর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে, লালন সেভাবে গুরুত্ব আরোপ করেননি। তাঁর কাছে আত্মজন হচ্ছে মানবজীবনের সর্বপ্রধান লক্ষ্য। মনে হয় এ লক্ষ্যে পৌঁছনোর জন্য তিনি হজরত আলির একটি বিখ্যাত বাণীর অনুসারী। হজরত আলি বলেছিলেন, *মানআরফা নফসুহ ফাকাদ আরফা রব্বোহু* — এর অর্থ যে তার নিজেকে জেনেছে, সে তার রব (সৃষ্টিকর্তা, প্রতিপালক ও বিবর্তনকারী)কে জেনেছে।

এতে যে ইঙ্গিত আছে তা হল, নফ্‌স (ব্যক্তিসত্তা) ও রব অভিন্ন। লালনের গানে এরই প্রতিধ্বনি পাওয়া যায়।

একথা ঠিক যে, লালনের দর্শনকে কোনো বিশিষ্ট দর্শনের ছকে ফেলা যায় না। কারণ তিনি ইন্দ্রিয়, যুক্তি, স্বজ্ঞা কোন কিছুকেই অস্বীকার করেননি। তবু তাঁর ঝোঁক থেকে বলা যায়, তিনি স্বজ্ঞাবাদী ও মানুষ-রতন সন্ধানের জন্য একটি মরমি দৃষ্টি বিকাশের সাধনায় ছিলেন মশগুল, যার পরিণতি হল দ্বৈতবাদ। দ্বৈতবাদ অনুসারে জড় ও মন বা বস্তু ও আত্মা — এ দুই হল জগতের আদিম উপাদান। দৃশ্যমান জগতের মূলে এই দুটি পরস্পর বিরোধী সত্তা বিরাজমান। লালন মানবাত্মাকে পরম ব্রহ্মে সম্পূর্ণ লীন করতে চাননি। জীবাত্মা ও পরমাত্মার মধ্যে তিনি সবসময় একটা পার্থক্য রাখতে চেয়েছেন। এ ক্ষেত্রে তাঁর বক্তব্য হল, ঐ পরমতত্ত্বে সালোক্য বা সামীপ্য লাভ করলেও মৃত্যুর কবল থেকে রক্ষা পাওয়া যায় না।

পাঞ্জুর রচনাতেও একথার সমর্থন পাওয়া যায়। পাঞ্জু লিখছেন, *পুণ্য মুক্তি যতই কর মন/ কোন ধর্মে হয় না জন্ম-মৃত্যু যে খন্ডন।*

তাই দেহের নানা কোঠায় লীলা-বিহারী পরমাত্মার সন্ধানী লালনের ভাবানুসারী পাঞ্জু প্রথমত, অতি সূক্ষ্ম দৈহিক লতিফাগুলোর বিকাশের আহ্বান জানিয়েছেন। দ্বিতীয়ত, সেগুলোর মাধ্যমে *মনের মানুষ* বা *অধর মানুষ*-এর সন্ধান লাভ করে পরমতত্ত্বে উপনীত হয়েছেন। তবু পাঞ্জু শাহ দ্বৈত অনুষঙ্গ ত্যাগ করতে পারেননি। সুফি সাধকদের ধারায় দেখা যায়, তাঁরা শরিয়তকে অস্বীকার করে নানাবিধ শরিয়ত বিরোধী উক্তি করেছেন। এঁদের মধ্যে মনসুর হল্লাজ, বায়োজিদ বোস্তামী, ইবনুল ফরিদ, জালালুদ্দিন রুমি ইত্যাদিরা স্মরনীয়। হাল্লাজের আনাল হক (আমিই সত্য), ফরিদের আনাহিয়া (আমি সেই সুন্দরী নারী), বায়োজাদীর সুবহানী (আমিই পবিত্র) বা রুমির আমি মদ ইত্যাদি শরিয়ত বিরোধী উক্তি। তবে এঁরা শরিয়তের বিরুদ্ধে আত্মোপলব্ধিজাত সত্য প্রচার করলেও শরিয়তের প্রতিকূল কোনো আচার-অনুষ্ঠানে যোগদান করেননি।

পাঞ্জুও শরিয়তকে অস্বীকার করেননি। তবে তত্ত্বজ্ঞানের ক্ষেত্রে শরিয়তের জ্ঞান যে নিতান্ত অপ্রতুল, তা তিনি বলিষ্ঠ ভাষায় প্রকাশ করেছেন। দর্শনতত্ত্ব হিসেবে পাঞ্জু শাহ যে পথ ধরেছেন, সেটি জ্ঞানের পথ। এই জ্ঞানমার্গে পৌঁছিয়েই তিনি উপলব্ধি করেন যে, এই দেহতেই বিভিন্ন মোকাম মঞ্জিল রয়েছে। এগুলোকে বিশুদ্ধ ও জাগ্রত করলে এদের মাঝেই বিশ্বস্রষ্টার রূপ প্রতিভাত হয়ে ওঠে।

সুফি সাধকেরা এ মোকামগুলোকে বলেন, *লতিফা*। *লতিফা* আবার দুই ভাগে বিভক্ত, এই দুই ভাগ আবার নানা উপবিভাগে বিভক্ত। দেহতত্ত্বের এই সব সূক্ষ্ম কথা পাঞ্জুর লেখায় পাওয়া যায়। মোকাম মঞ্জিল ছাড়াও নয় দরজা, আট কুঠুরি, চব্বিশ চন্দ্র, ছয় লতিফা ইত্যাদি সম্পর্কে তাঁর যে উপলব্ধি ছিল, তা তার জীবনের সঙ্গে সম্পৃক্ত। সুফি ধারার প্রভাব তাঁর মধ্যে প্রবলভাবে ছিল। তিনি নিজেই বলেছেন যে, তিনি চিসতিয়া খানদানের শিষ্য এবং নিজামিয়া ঘরানার অনুসারি সাধক।

পাঞ্জর আধ্যাত্ম চিন্তা ছিল একত্ববাদভিত্তিক। তাঁর মনে মানুষ যতদিন ব্রহ্মকে না জানে, ততদিনই তাঁর কাছে জগতের অনুভূতি ব্যাপক। যে মুহূর্তে সে ব্রহ্মকে জানে, জগতের সত্তা সেই মুহূর্তেই ব্রহ্মসত্তায় হারিয়ে যায়। এমন কি মানুষ নিজেও ব্রহ্মের সঙ্গে লীন হয়ে যায়। পাঞ্জুর জীবনে এই ব্রহ্ম অনুভূতি গভীরভাবে ছিল বলেই সংসার ধর্ম পালন করেও *সর্বব্যাপী একক চেতনাকে* তিনি চিনতে পেরেছিলেন। জগত ধ্বংস হবে, সেই সঙ্গে যাবতীয় সৃষ্টি লোপ পাবে। পাঞ্জু সেই যন্ত্রণা থেকে পরিত্রাণের আশায় জীবন থাকতেই *আমিত্ব* বিসর্জন দিতে চান। একে বলে ফানা প্রাপ্তি। ফানা বলতে ব্যক্তিত্বের বিনাশ বোঝায় না। সাধনার বাধাস্বরূপ জাগতিক বাধাগুলো ঘুচে গিয়ে যথার্থ সত্য ও সত্ত্বগুণে পূর্ণ হয়ে ওঠার নামই ফানা। প্রেমের ফানার পথের অবস্থানই হল 'হাল' ও বাউল বৈষ্ণবদের 'দশা'। এরজন্য চাই অন্তর্দৃষ্টি, শ্বাসজপ এবং সর্বোপরি সেই প্রেমাস্পদের দয়া। এই অবস্থায় পৌঁছে পাঞ্জু বলেন,

ফানাহিল্লাহ হওরে মন / দেখ বান্দা হওয়ার ভেদ কেমন।

৮.

পাঞ্জু শাহ প্রায় দুইশোটি গান লিখেছেন। এই ধরনের গান যশোর-কুষ্ঠিয়া অঞ্চলে 'ভাবসঙ্গীত' বা 'ভাবগান' নামে পরিচিত। অর্থাৎ যে গান শুনে মনের মধ্যে আধ্যাত্ম চিন্তা প্রবলভাবে জেগে ওঠে, তাকেই বলা হয় 'ভাবগান'। লালন ফকিরকে বাংলা ভাবসঙ্গীতের পথিকৃৎ বলা হয়। লালন-পরবর্তী কালে দুদ্দু শাহ, হাউড়ে গোঁসাই যাদুবিন্দু এই গানের উল্লেখযোগ্য গীতিকার। পাঞ্জুকে এঁদেরই উত্তরসাধক বলা যায়।

অন্তর্নিহিত কতকগুলি বৈশিষ্ট্য ভাবগানকে একটা আলাদা পর্যায়ে নিয়ে গেছে। মানবজীবনের পূর্বাপর অবস্থা, জীবনলাভের উদ্দেশ্য, কর্তব্য সাধনের উপায়, কর্মফল, স্রষ্টা.ও সৃষ্টির সম্পর্ক, দেহ-আত্মা-মন, এসবই ভাবসঙ্গীতের বিষয়।

ঐতিহাসিক নিরিখে বিচার করলে সুফি সাধক খাজা মৈনুদ্দিন চিস্তি এই উপমহাদেশে শামা কাওয়ালি বা আধ্যাত্ম সঙ্গীতধারা প্রবর্তন করেন। আমির খসরু, ফরিদ্দুদিন গঞ্জ-ই-শোকর, নিজামুদ্দিন আউলিয়া প্রমুখ তাপসরা সেই ধারা চালু রাখেন। পাঞ্জু নিজেকে চিস্তি নিজামী শাখার সাধক বলে জানিয়েছেন।

উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য তার গ্রন্থে (বাংলার বাউল ও বাউল গান) জানিয়েছেন, সাধারণত ভাবসঙ্গীত লেখা হয় প্রবর্ত, সাধক, সিদ্ধ — এই তিন অবস্থার অনুসরণ করে। প্রবর্ত অবস্থায় ভগবানের নিকট দৈন্য ও গুরুর করুণা প্রার্থনা, সাধক অবস্থায় দেহতত্ত্ব, মনের মানুষ, সাধনার স্বরূপ প্রভৃতির বর্ণনা আর সিদ্ধ অবস্থায় সাধনার পরিপূর্ণতার স্বরূপ ইত্যাদি গানে বলা হয়।

পাঞ্জুর গানেও এই তিন অবস্থার কথা বলা হয়েছে। তবে তাঁর জীবনীকার পাঞ্জুর গানকে আরও বহু শ্রেণীতে ভাগ করেছেন, যেমন — আল্লাতত্ত্ব, রাসুলতত্ত্ব, মুরশিদতত্ত্ব, দেহতত্ত্ব ইত্যাদি আরও অনেক ভাগে বিভক্ত। পাঞ্জুর গানে বিভিন্ন জাতি এবং সমকালীন সমাজের অনৈক্যের খবরও প্রকাশ পেয়েছে। এদেশে হিন্দু ও মুসলমান সমাজ পাশাপাশি বাস করেও বিবাদ-বিসম্বাদে জড়িয়ে পড়েছে। যা দেখে বেদনা অনুভব করে পাঞ্জু লিখছেন, *হিন্দুরা যবন দেখে ঘৃণা যে করিল / মুসলমান হিন্দুকে বে-দ্বীন কহিল।*

আবার মুসলমানদের রাসুলের দেখানো পথ থেকে সরে আসতে দেখে পাঞ্জু লিখলেন, *নবির তরিক ভুলে গেল / হিংসা নিন্দা বৃদ্ধি হলো / খোদার বান্দা ভেবে দেখ না।* পুণ্য অর্জনের নামে হাজার হাজার পশুর কোরবানি দেখে পাঞ্জুর মনে প্রশ্ন জেগেছে যে, হজরত ইব্রাহিম বহু পশু কোরবানি দিলেও আল্লার দরবারে তা গৃহীত হয় না। তাহলে যে পশু কোরবানি আল্লা গ্রহণ করেননি, সেই পশু কোরবানি দিয়ে মানুষ কী পুণ্য অর্জন করবে যে, রোজ কয়ামতের (প্রলয়ের সময় শেষ বিচারের দিন) দিনে সে পুলসেরাত (যে তীক্ষ্ণধার পুল একমাত্র পুণ্যবানেরাই পেরোতে পারে) পেরিয়ে স্বর্গে যাবে? তিনি উপলব্ধি করেছেন, অন্ধ বিশ্বাসে পশু হত্যা করলে কোরবানি হয় না। আল্লা দেখেন মানুষের ইমান।

পাঞ্জুর গানের ভাষা সেই সময়কার বাংলার প্রচলিত ভাষা যা তৎসম, তদ্ভব, দেশি ও বিদেশি (আরবি, ফারসি ইত্যাদি) নিয়ে তৈরি। শুধু পাঞ্জু নয়, সেই লালন থেকে শুরু করে বাংলা দেহতত্ত্বের গান যে সাধক বা কবিরা লিখেছেন, তাঁরা সবাই এই ভাষাতেই লিখেছেন। এই ভাষা গ্রাম বাংলার দৈনন্দিন জীবনযাপনের ভাষা হলেও তৎকালীন শহুরে শিক্ষিত সমাজে এই ভাষাকে

অসাধু ভাষা বলে উপেক্ষা করা হয়। কারণ তখন অর্থাৎ উনিশ শতকে কলকাতায় ফোর্ট ইউলিয়াম কলেজ প্রতিষ্ঠা হয়ে গেছে এবং সেখানে ব্রাহ্মণ পণ্ডিতরা সংস্কৃতঘেঁষা বাংলা ব্যবহার করতে শুরু করেছেন। এর ফলে বাংলাভাষার মোড় সংস্কৃতের দিকে ফিরে যায় আর জন্ম নেয় সংস্কৃত ঘেঁষা সাধু বাংলা আর গ্রাম বাংলার ভাষাটা অসাধু বাংলা বলে চিহ্নিত হয়ে যায়। ফোর্ট ইউলিয়ামের পণ্ডিতেরা যখন সংস্কৃতের বেড়া তুলে জীবন্ত বাংলা ভাষাটিকে প্রান্তিক ভাষায় পরিণত করলেন, তখন লালন, হাউড়ে, পাঞ্জু, দুদ্দু, শাহ জালাল, হাসান, ইসরাইল শা প্রভৃতি বাংলার বাউল ফকিররা তাঁদের গানে এই ভাষাটিকে বাঁচিয়ে রাখলেন, তাঁরা নিজেরাও ছিলেন সমাজের প্রান্তবাসী।

এই যে আরবি ফারসিবহুল বাংলাভাষাটিকে আমরা ছোট থেকে জানলাম না, এর ফলে আজ আমরা লালন বা অন্যান্য পদকর্তাদের গান নিয়ে কাজ করতে গিয়ে গানের অনেক শব্দের অর্থ উদ্ধার করতে পারি না, কারণ আরবি ও ফারসি জানি না বলে।

৯.

লেখার শুরুতে যে মরমি বা মরমিয়াবাদের কথা বলা হয়েছিল, এই সুফি মরমিরা একাদশ খ্রিষ্টাব্দের শেষে যখন বাংলায় এলেন, তখন বাংলার সহজিয়া (সহজিয়া শব্দটি বৌদ্ধ সহজযান শব্দ থেকে এসেছে) দেহসাধনার গাছটি ফুলে ফলে ভরে উঠেছে। বাংলায় এসে তারা মালদহ, দিনাজপুর, রংপুর, বর্ধমান, বীরভূম, বাঁকুড়া, হুগলি, পাবনা, বগুড়া, রাজশাহী, ময়মনসিংহ, ঢাকা, ফরিদপুর, বাখরগঞ্জ, চট্টগ্রাম, নোয়াখালি ইত্যাদি জেলায় তাঁদের আখড়া তৈরি করে। পরবর্তী দুশো বছর তারা সারা বাংলায় ছড়িয়ে পড়েছিল।

প্রথম প্রথম বাংলার সুফি সাধকরা উত্তর ভারতের সুফিদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রেখে চলত। কিন্তু স্থানীয় সহজিয়া সাধকদের প্রভাবে যৌনযোগসাধনায় তারা আকৃষ্ট হয়ে পড়ে। তাদের সাধনায় ঢুকে পড়ে চারচন্দ্রভেদ। সহজিয়া ফকিররা মনে করেন, মানবদেহ চারটি উপাদানে তৈরি, আব অর্থাৎ অপ বা জল, আতস অর্থাৎ তেজ বা তাপ, খাক অর্থাৎ ক্ষিতি, বাত অর্থাৎ মরুৎ বা হাওয়া। এই চারটি উপাদানের দেহভ্যন্তরস্থ প্রতীক হল, মাটি (খাক বা ক্ষিতি), রস (আব বা অপ), রূপ (আতস বা তেজ), রতি (বাত বা মরুৎ)। দেহের উপাদান দেহ থেকে নিঃসৃত হবার পর তাকে আবার গ্রহণ করে দেহের মধ্যের রাসায়নিক উপাদানের অনুপাতের সামঞ্জস্য বজায় রেখে,

শরীরের মধ্যে এক রাসায়নিক বিক্রিয়া ঘটিয়ে নতুন শক্তি অর্জন করাই চারচন্দ্রভেদ পদ্ধতির লক্ষ্য। লালনের গানে এই চারচন্দ্রের উল্লেখ পাই। চার পেয়ালা বা চার মোকাম ইত্যাদি।

সহজিয়া সাধনায় গুরুই এইসব শিষ্যকে শিখিয়ে দেন। গুরু তাঁর জ্ঞান বিক্রি করেন না বরং তিনি শিষ্যদের পালন করেন আর দেহসাধনার শিক্ষা দেন। দেহের মধ্যেই বিশ্ব। সেই পরম তত্ত্বটি জানাতে পারেন গুরু, কাজেই গুরুর প্রতি ভক্তি বাড়তেই থাকল। শিষ্য তার নিজের স্বাধীন ইচ্ছা ও মুক্তবুদ্ধির ক্রিয়াকে গুরুর চরণে সমর্পণ করল। দেহসাধনার সময় গুরু মূর্তিকেই চোখ বুজে ধ্যান করা শুরু হল, কেননা গুরু ঈশ্বরতত্ত্ব গুরুই বুঝিয়ে দেবেন শিষ্যকে। এইভাবে ব্যাপারটা আর ইসলামের নিরাকার ঈশ্বর উপাসনা রইল না। কারণ ভক্ত আর নিরাকার ঈশ্বরের মাঝে এসে হাজির হলেন সাকার গুরু। ফলে বাংলার ফকিররা ইসলামের মূল নীতি থেকে সরে গেলেন। যে গুরু সুফিসাধনায় পরমার্থ বিষয়ে উপদেশদাতা বা অ্যাডভাইসর মাত্র ছিলেন, বাংলার মারফতি দেহসাধনায় সেই গুরু হলেন ঈশ্বর লাভের অনিবার্য অবলম্বন বা মেন্টর। বাংলায় এই গুরু বা মুরশিদ বা পিরের সম্মান এমন জায়গায় চলে গেল যে, নামাজের সময় মানসিক স্থৈর্য রাখার জন্য শিষ্য বা বায়েদকে আল্লার কথা স্মরণ না করে পিরের বা গুরুর মুখ স্মরণ করতে হয়।

এই যে বাংলার মারফতি দেহসাধক ফকিররা উত্তর ভারতীয় সুফি ঘরানা ছেড়ে বেরিয়ে এসে নিজেদের গুরুমুখী দেহসাধনার স্বাধীন ঘরানার পত্তন করলেন এর ফলে তাঁরা উত্তর ভারতীয় সুফিদের নজরে পতিত বা বিকৃত হয়ে পড়লেন, এরই সূত্রে পরবর্তীকালে প্রবল শরিয়তি ঘৃণার শিকার হয়েছেন, বাংলার পীর-মুর্শিদ-গুরু ধরা বাংলার ফকিররা। উনিশ শতকের কিছু আগে পূর্ব ও উত্তরবঙ্গের হাজার হাজার নিম্নবর্গের হিন্দু ও মুসলমানেরা ফকিরিমতে দীক্ষা নেয়। শরিয়তি সমাজ বা হিন্দু সমাজের চাপ থেকে বাঁচতে এঁরা উদার ও অসাম্প্রদায়িক জীবন-যাপনের আশ্রয় নিয়েছিল। এঁদের শায়েস্তা করতে রংপুরের মৌলানা রোয়াজউদ্দীন আহমদ *বাউল ধ্বংস ফৎওয়া* নামে একটি বই লেখেন। গোঁড়া শরিয়তিদের মধ্যে বইটি জনপ্রিয় হয় এবং ১৯২৫ সালে বইটির দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয়। এই বই থেকে জানা যায়, সেই সময় বাংলার ফকির বাউলদের সংখ্যা ছিল ষাট-সত্তর লক্ষ। এদের ওপরই নেমে আসে কট্টরপন্থীদের অত্যাচার। বলা যায়, গত একশো বছরেরও বেশি এই অত্যাচার বা তার রকমফের সহ্য করে বাংলার ফকিররা আজও টিকে আছেন।

১০.

পাঞ্জু শাহের আধ্যাত্ম সাধনার মূল বিষয় আত্মতত্ত্ব। তিনি মনে করতেন, অন্যান্য তত্ত্ব জানার আগে আত্মতত্ত্ব বা নিজেকে জানা প্রয়োজন। আত্মতত্ত্ব আসলে দেহতত্ত্ব। মানবদেহেই সব সত্য বা তত্ত্বের অবস্থিতি অর্থাৎ এই দেহভান্ডেই ব্রহ্ম আছেন। আমাদের এই শরীরের আঠারো মোকামের (দেহতত্ত্বের সাধকরা বলেন, মানবদেহের আঠারোটি মোকাম হল : বাবার কাছ থেকে পাওয়া চার মোকাম — হাড়, রগ, মণি, মগজ; মায়ের কাছ থেকে পাওয়া চার মোকাম — মাংস, মজ্জা, লোম, রক্ত; আর বাকি দশটি মোকাম হল — হস্ত, পদ, গুহ্য, লিঙ্গ/যোনি, চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক ও ব্রহ্মতালু) এক মোকামে স্রষ্টার অবস্থান। তাকে জানার জন্যই যত ব্যাকুলতা, অস্থিরতা। পাঞ্জুর গানে এই সূত্রেই প্রকৃতি পুরুষের দেহমিলনজনিত সাধনার কথা আছে, আছে শৃঙ্গার রস বা মধুর রসের কথাও।

মধুর রসের সাধনাই তাঁর প্রেম সাধনার মূল কথা। তিনি একটি গানে লিখেছেন, *মধুরভাবে বিলাসে মগন/ প্রয়োজন কি আর সাধ্য সাধন/ পঞ্চভাবে প্রেম প্রাপ্তি/ অধীন পাঞ্জুর মূঢ় মন*। সহজ সাধনায় মানুষই যে প্রধান, সেই উপলব্ধি থেকে পাঞ্জু লেখেন, *মানুষের করণ/ মানুষ ভিন্ন নয় ওরে মন* অথবা *মানুষ গুরু কল্পতরু/ বিশ্বাস হবে যার অন্তরে*। মরমিদের কাছে মুরশিদ বা গুরু হচ্ছেন শ্রেষ্ঠ মানুষ, তিনি ইনসান উল কামেল। আর মানুষ গুরুকে চিনতে পারলে বিশ্বপ্রেমিক হওয়া যায়।

পাঞ্জু শাহের গানে বৈষ্ণব কবিদের প্রভাব আছে। গৌরাঙ্গ ও তাঁর লীলা মাহাত্মের কথা ছাড়াও চণ্ডীদাস, রজকিনী, নিত্যানন্দ, রূপ, সনাতন ইত্যাদি মহাজনের উল্লেখও পাওয়া যায়। তাঁর আখড়া বাড়ির চারপাশে কীর্তনের আসর বসত। সেসব আসরে তিনি আমন্ত্রিত হতেন আর সেই কারণেই তাঁর গানেও ঐ ভাবধারার প্রভাব।

পাঞ্জু প্রসঙ্গ শেষ করার আগে তাঁর গানের আর একটি বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ করতে চাই। বৌদ্ধ সহজিয়া সাধকরা সিদ্ধাচার্য নামে পরিচিত। তাদের গানের ভাষা আর উনিশ শতকের ভাব সঙ্গীতের ভাষা এক নয়। যদিও উভয়ের গানের বিষয় দেহসাধনা। সিদ্ধাচার্য লুই পা-এর লেখা একটি চর্যাপদের প্রথম চারটি লাইন হল —

কা আ তরুবর পঞ্চবি ডাল।
চঞ্চল চি এ পইঠে কাল।।
দিঢ় করিঅ মহাসুই পরিমাণ।
লুই ভনই গুরু পচ্ছিঅ জাণ।।

পদটির অর্থ শরীর বৃক্ষ, পঞ্চ ইন্দ্রিয় তার পাঁচখানা ডাল। (ইন্দ্রিয়-দ্বারে রূপাদি প্রবিষ্ট হয়ে চিত্তকে চঞ্চল করে) চঞ্চল চিত্তে কাল প্রবিষ্ট হল। (কালের কবল থেকে নিষ্কৃতির জন্য) দৃঢ় মহাসুখ পরিমাণ কর। লুই বলেছেন, গুরুকে জিজ্ঞেস করে এটা অবগত হও।

আর আশ্চর্যজনকভাবে পাঞ্জুর একটি গানের ভাষা —

আগে দেহের খবর জানরে আমার মন।
দেহতত্ত্ব না জানিলে জনম যাবে অকারণ।।
দেহ বৃক্ষের পাঁচটি শাখা
দশ ডালে তার দশটি পাতা,
সেই না বৃক্ষে বসে আছে মহানন্দে মহাজন।।
বিষয় বিষে মন চঞ্চলা,
বিবাদী করে ছলাকলা,
মন বিবাগী বাগ মানে না, নষ্ট করে পিতৃধন।।
গুরু দাসী হও আগে,
প্রেমতরী বাও অনুরাগে,
পাঞ্জু বলে তবেই হবে মহাসুখের আগমন।।

পাঞ্জু শাহের লেখা কয়েকটি গান —

১

মালেক আল্লার আরশ কালেবেতে রয়।।
খুঁজে দেখলি না মন হায় রে হায়।।
আছে কালেবেতে কালুবালা কালামোল্লায় জানা যায়।।
কুলুবেল মোমেনীন বলে
কোরানে সাঁই খবর দিলে
দেখ না দুই নয়ন খুলে
ছাব্বিশ সেপারায়।

সফিনাতে দেখে শুনে
সিনার এলেম লেহ জেনে
সিনার এলেন সফিনাতে
জানবে কেনে দীনকানায়।।

নবি আদম বারিতালা
এক দমে হয় লীলাখেলা,
দলিলে বলেছে খোলা
রাসুল দয়াময়।।

নাফাকত ফিহে বলে
দেখ না হাদিস দলিলে
দীনকানার কথায় ঘুরে মলে
পেড়ো পীড়ে মদিনায়।।

আঠারো হাজার আল্লার আলম
আঠারো মোকামে মিলন
আরশ-কোরশ-লৌহ্-কলম
এই অজুদে সবায়

এই কালেবে মালেক আল্লা
চেঁচালে পুড়িবে গলা
পাঞ্জু তেমনি আলাঝালা
আসমানে চেয়ে খোদা চায়।।

২

নবি চেনা নবি চেনা হলো আমার ভার।
জেন্দায় যদি না পাই তারে মলে তো পাব না আর।।

খবর শুনি মদিনাতে দ্বীনের নবির এন্তেকাল
হায়াতুল মোরসেলিন বলে তবে লিখলেন কেন পরোয়ার।।

দেখে শুনে অনুমানে দেলে ধাঁধাঁ হয় আমার
মনে ভাবি নবি মলে দুনিয়া রইত না আর।।

আছে সত্য নবী বর্ত চিনে করো রূপ নেহার।
হিরুচাঁদের চরণ ভুলে পাঞ্জু হলো ছারখার।।

৩

গুরু রূপে নয়ন দেরে মন।।
গুরু বিনে কেউ নাই তোর আপন।।
গুরু রূপে অধর মানুষ দিবে তোর দরশন।।

পিতার ভান্ডে কীরূপ ছিলি
মায়ের গর্ভে কি রূপ হলি মন, মন।
পূর্বপরে নিরন্তরে গুরুরূপে নিরঞ্জন।।

রজ-বীজ মিলন কে করিল
কোথায় আছে তার আসন।
ব্রহ্মাণ্ডের গড়ন গড়ে সে কোন জন।।

কোথায় ছিলি, কার বা সাথে
ভবে এলি ওরে মন।
পাঞ্জু বলে গুরু ধরে কর তাঁর অন্বেষণ।

৪

চিনলি না মুরশিদ রতন, করলি না যতন
কিসে মন তুই হবি তারণ।।
তোরে আর কি বলব মন, গেল জনম
না করলি সে চরণ-সাধন।।

বলি মন ভবের কারণ
করে গুমান আর কত কাল রবে জীবন।
যেদিন আসবে শমন, করবে দমন,
লুটে নিবে মহারতন।।

সরলকে করলে গরল,
গরলকে করলে সরল, ওরে মনা।
চৌদিকে মহাগরল ও পাপী মন
কিসে পাবি চাঁদের কিরণ।।

পাঞ্জু কাঁদে পড়ে ফাঁদে ভব নদীর বিষম যাতন।
হিরুচাঁদ কাটে ফাঁদ, নিজগুণে দিয়ে চরণ।।

৫

গুরু বিনে মনের কথা বলব না।।
কারো বলব না, কিছু শুনব না।।
ব্যাথার ব্যথিত বিনে অন্যজনে বললেও কিছু হবে না।।
শোন ওরে আমার মন,
গুরু দিল পরম ধন,
নিজে না করিয়ে যতন করলি তারে বিতরণ।
কেন বেনাবনে মুক্ত ফেলে মন হলি তুই দীনকানা।।
না করে ভজন সাধন
যারে তারে বোলো না মন,
পাষাণ-দলন তোর কথায় মন হবে না।
কারো ঠেসেঠুসে ভজাইলে কখনো সে ভজবে না।।
এক কাঠুরে এক মানিক পেয়ে
বাজারেতে যায় গো ধেয়ে
দোকানেতে ফেলে দিয়ে মূল্য নিতে জানে না।
তেমনি অবোধ কাঠুরের হাতে মানিক কেহ দিও না।।
মন হয়েছে আলাঝালা
ভজন সাধন করলে ঘোলা,
সাঁই হিরুচাঁদের চরণ দুটি ভুলো না।
অধীন পাঞ্জু বলে মন রসনা পরের মজায় মজো না।।

৬

ত্রিবেণীর তিরধারে সুধার জোয়ার ভাসে।।
সুখ সাগরে মানুষ খেলে বেহাল বেশে।।
উতালে সুধাসিন্ধু
সুধারে সুধাবিন্দু
সুখময় সিন্ধুজলে ছলে সাঁতার খেলে।
জীব নিস্তারিতে জোয়ার এসে ভ্রমর মানুষ যায় গো ভেসে।।
অমাবস্যায় তিথি নাস্তি,
জোয়ারে তিথি উক্তি,

অমাবস্যা, প্রতিপদ, দ্বিতীয়া তিন দিনে চলে।
ধরবি যদি অধর মানুষ, থাক নদীর কূলে বসে।।
জোয়ারের ভাঁটা শেষে
মানুষ যায় অচিন দেশে
কিছুকাল গুমান করে গোপনে তিন মৌজা ফোটে।
সেদিন স্বরূপেতে কিরণ দিয়ে মানুষ যায় গোলোকে মিশে।।
অনুরাগী যে হইবে,
ত্রিবেণীর রূপ দেখিবে,
সহজে অধর ধরে যাবে ঐ চরণে মিশে,
হিরুচাঁদ কয় মানুষ খুঁজে পাঞ্জু মলি দেশ বিদেশে।।

৭

রসের ভাব জেনে না নিলে,
সাধন যাবে রে বিফলে।।
সুধা ভেবে গরল খেলে
মরবি রে প্রারে জ্বলে।।
যে রসে সাঁই বিরাজ করে,
তার ভেদ আছে গভীরে,
ভেদ জেনে রস সাধলে পরে,
রসিক তারে বলে।।
সাঁই গুপ্ত বেশে গোপনে বসে,
বিরাজ করে অমৃত রসে,
অমাবস্যা দ্বিতীয়াতে,
বর্ত হয় কমলে।।
যোগ ছেড়ে অযোগে সাধিলে,
বিপদ ঘটে জীবের কপালে,
পাঞ্জু বলে গোলমালে,
সাধন গেলাম ভুলে।।

৮

ভজন-সাধন করবি রে মন কোন রাগে।।
আগে মেয়ের অনুগত হওগে।।

জগত জোড়া মেয়ের বেড়া রে,
কেবল এক পতি সাঁইজি জাগে।।
মেয়ে সমান্যধন নয়,
জগত করছে আলোময়,
কোটি চন্দ্র জিনি কিরণ,
বুঝি আছে মেয়ের পায়।
মেয়ে ছাড়া ভজন করা রে,
হবে না কোনো যোগে।।

যদি রূপার টাকা পায়,
জীব কপালে ছোঁয়ায়,
রজত কাঞ্চন স্বর্ণ রূপা,
পতি দিচ্ছে মেয়ের পায়ে।
মেয়ে এমনি ধনী, নাহি চিনি রে,
জীব পড়বে রে পাপের ভাগে।।

মেয়ে মেরো না রে ভাই
মারলে গুরু মারা হয়,
আহ্লাদিনী নাম রেখেছেন
প্রভু চৈতন্য গোঁসাই।
যার দরশনে দুঃখ হয় রে
তার চরণে স্মরণ নাওগে।।

বলে হিরুচাঁদ আমার
মেয়ে অতি মনোহর
যার আকর্ষণে জগত-পতি
করে রাধার দাস স্বীকার।
পাঞ্জু ধরবি যদি গুরুর চরণ রে
মেয়ের চরণ ধর আগে।।

৯

ভেবেছ দিন এমনি যাবে।।
দিনে দিনে দিন ফুরালো, কয় দিন রবি ভবে।।
ধন-যৌবন জোয়ারের পানি, দেখতে দেখতে ভাটা হবে।।

যৌবন ভাটা হলে কে সুধাবে তোরে,
ভবের বন্ধু না চাহিবে ফিরে,
পিতৃধন সব ফুরালে শমন ধরিবে।।

স্বপ্নে দেখি লক্ষ চাঁদের জ্যোতি,
চেতন হয়ে পাইনে একটা বাতি,
অন্তিমকালে এ যৌবন তেমনি ফাঁকি দিবে।।

কর দিন থাকিতে গুরুর পদে মতি,
অন্তিমে ঐ চরণ হবে সাথের সাথী,
অধীন পাঞ্জু হলো মূঢ় মতি, কোনগুণে চরণ পাবে।।

১০

লোভের দেশে যেও নাকো।।
ফকিরি বেশ করে ধারণ জেন্দা মরা মরে থাকো।।

কাঁধে নিয়ে আঁচলা ঝোলা
হসনে রে তুই কাম উতলা
নিভাইয়ে তোর মদনজ্বালা
সদায় আল্লা আল্লা ডাকো।।

মরণ আসার আগেই মরো,
হাদিসের কথা স্মরণ করো,
সাধু গুরুর বাক্য এঁটে ধরো
তবেই পার হবি তুই চুলের সাঁকো।।

হিরুচাঁদ কয় বারে বারে
পাঞ্জুরে তুই ভুলিস নারে,
এ ভবের পাড়ি সেরে যা রে,
পদারবিন্দু গায়ে মাখো।।

গ্রন্থঋণ : ডক্টর খোন্দকার রিয়াজুল হক, *মরমি কবি পাঞ্জু শাহ : জীবন ও কাব্য*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯০।

রসিক মেয়ে ঘরে থাকে
ঘরে বসে জগৎ দেখে
সতী হয়ে ধর্ম রাখে
লয়ে উপপতি

আজকের বাংলাদেশে সাধক বাউল-ফকিরদের ভবিষ্যৎ অন্ধকার — তনভির মোকাম্মেল

তানভির মোকাম্মেল বাংলাদেশের ঢাকা শহরের বাসিন্দা। দীর্ঘদিন ধর চলচ্চিত্র নির্মাণের সঙ্গে যুক্ত। এক সময় বাংলাদেশের বামপন্থী আন্দোলনের প্রথম সারিতে ছিলেন। পরবর্তীকালে তা থেকে দূরে সরে যান। তনভিরের ছবি এশিয়া ও ইউরোপের বিভিন্ন দেশে প্রসংসিত হয়েছে। ২০১০ এর প্রারাম্ভকর এক গরমের দুপুরে কলকাতার বিক্রমগড়ে এক বন্ধুর ফ্ল্যাটে তনভির মোকাম্মেল আমন্ত্রণ করেন পার্থ মজুমদার আর সুরজিৎ সেনকে আলাপ করার জন্য। কথায় কথায় তাঁকে বলা হয় শক্তিগড়ের মাঠের বার্ষিক বাউল-ফকির উৎসবের কথা। দুপুরের আলাপ একসময় মধ্যাহ্ন ভোজনে জারিত হয়ে বিকেলের চায়ে উদ্বুদ্ধ হয়ে গিয়ে পৌঁছেয় সন্ধ্যার পানীয়ে। যদিও তনভির নিজে চা, সিগারেট, মদ কিছুই খান না, কিন্তু অতিথি সেবায় তিনি অক্লান্ত। সেই আলাপের কিছুটা এখানে প্রকাশ হল।

প্রশ্ন ১ বাউল-ফকির ধর্ম বা সংস্কৃতি বা দর্শন যাই বলুন না কেন — সে বিষয়ে আপনি দুটি ছবি করেছেন। স্বল্পদৈর্ঘ্যের তথ্যচিত্র *অচিন পাখি* ও পূর্ণদৈর্ঘ্যের কাহিনীচিত্র *লালন*। ছোটবেলা থেকেই কি আপনি এই সংস্কৃতির প্রতি অনুরক্ত ছিলেন? আপনার পঞ্চাশোর্দ্ধ জীবনে এই সংস্কৃতি ও দর্শনের অভিঘাতগুলো কিভাবে এসেছে তা বিস্তৃতভাবে জানার ইচ্ছে হয়।

উত্তর বাল্য-কৈশোরে ট্রেনে-বাসে বা নিম্নবর্গের মানুষদের মুখে এসব গান শুনতাম। খুলনার মতো মফস্বল একটি শহরে বেড়ে ওঠার ফলে এসব গান শোনার সুযোগ বেশী ছিল। তাছাড়া বাংলাদেশের বাউল-ফকিরদের প্রধান কেন্দ্র কুষ্টিয়া জেলা খুলনা থেকে বেশী দূরেও নয়। বাউল-ফকিরদের গান তাই অল্পবয়স থেকেই শোনা ও ভালো লাগা।

তবে খুব সচেতন আগ্রহটা সৃষ্টি হয় বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার সময়ে। বিশেষ করে, বিশ্ববিদ্যালয়-উত্তর জীবনে যখন রাজনৈতিক-সংগঠনের কাজে আমাকে কুষ্টিয়া-যশোর অঞ্চলে ও পদ্মার

চরগুলিতে ঘুরতে হয়েছে, তখনই আমি প্রত্যক্ষভাবে বাউল-ফকিরদের সংস্পর্শে এসেছিলাম। বুঝতে পারি যে, সমাজের নীচুতলার মানুষদের উপর তাঁদের গান ও দর্শনের প্রভাবটা কত গভীর। তাদের গানে প্রাতিষ্ঠানিক ঈশ্বর ও প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মগ্রন্থগুলির বিরুদ্ধে প্রতিবাদের উপাদানগুলি আমাকে খুবই আকর্ষণ করত।

আমার জীবনে যে কয়েকজন মানুষ আমাকে বাউল-ফকিরদের গানের গভীর তাৎপর্য, তাঁদের দর্শন ও সাধনার নিগূঢ় রূপটা বুঝতে সাহায্য করেছেন তাদের মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ছিলেন মহিন শাহ। মহিন শাহ ছিলেন লালন ফকিরের প্রশিষ্যের প্রশিষ্য। গভীর লোকজ প্রজ্ঞা ও সহজাত সঙ্গীতপ্রতিভার অধিকারী ছিলেন মহিন শাহ। আমি যখন *অচিন পাখি* ছবিটির গবেষণার কাজে কুষ্টিয়ায় যেতাম, তখন মহিন শাহর সঙ্গে, বয়সের ব্যবধানটা ছাপিয়েই, আমার এক গভীর সখ্য গড়ে ওঠে। ওঁর সঙ্গে পদ্মার চরে চরে আমি অনেক ঘুরে বেড়িয়েছি। মহিন শাহ আমাকে সঙ্গে করে নিয়ে গেছেন কুষ্টিয়া-চুয়াডাঙ্গা-মেহেরপুর এসব অঞ্চলে ছড়ানো ওঁর ভক্ত-শিষ্যদের বাড়ি। বাউল-ফকিরদের সঙ্গে একটা প্রত্যক্ষ সম্পর্ক তখন থেকেই আমার সৃষ্টি হয়েছে। ওঁদের গান ও সাধনার গোপন রহস্যগুলো বুঝতে সুবিধা হয়েছে। আরেকজন মানুষও আমাকে বাউলতত্ত্ব, ফকিরী মতবাদ, বিশেষ করে লালন ফকিরের জীবন ও দর্শন সম্পর্কে জানতে প্রভূত সহায়তা করেছেন। তিনি ছেঁউড়িয়ানিবাসী প্রবীন সাধক ফকির বাদের শাহ। লালনপন্থীরা যে মূলত ফকির, বাউল নন, একথা বাদের শাহ-ই আমাকে বারেবারে বুঝিয়েছেন।

আজ এই পঞ্চাশোর্ধ্ব বয়সে বাউল-ফকিরদের সম্পর্কে আমার উপলব্ধি হচ্ছে শিল্প-সাহিত্যে ভালো অবদান থাকলেও সাধারণভাবে বাঙ্গালীর দর্শনচিন্তা সীমিত ও দুর্বল। দর্শনের গভীর বিষয়গুলো নিয়ে উচ্চ ও মধ্যবিত্ত বাঙালী বুদ্ধিজীবীরা তেমন কোনো মৌলিক বা গভীর বক্তব্য তুলে ধরতে পারেননি। বাঙ্গালীর সংস্কৃতিতে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষাবঞ্চিত দরিদ্র এসব বাউল-ফকিররাই আসলে গভীরভাবে মানুষের সৃষ্টি, ঈশ্বরের অস্তিত্ব-অনস্তিত্ব, মানব-জীবনের এসব নানা মৌলিক ও নিগূঢ় বিষয় সম্পর্কে দার্শনিক প্রশ্ন তুলেছেন

এবং তাঁদের নিজেদের মতো করে এসব প্রশ্নের উত্তর দিতে চেয়েছেন। তাঁদের দর্শনের সঙ্গে কেউ একমত না হলেও এটা কেউ অস্বীকার করতে পারবেন না তাঁদের দর্শনটা বেশ মৌলিক এবং মানবদেহকে সবকিছুর কেন্দ্রে রাখার ফলে, গভীরভাবে মানবতাবাদী। ইউরোপীয় রেনেসাঁর প্রভাবমুক্ত এ এমন এক মানবতাবাদ যার অস্তিত্ব বাংলার লোকজ জীবনের গভীর শেকড়ে প্রোথিত। বাউল-ফকিরেরা বাঙ্গালী সংস্কৃতির এই গভীর ও প্রগাঢ় মানবতার দিকটির ব্যাপারে আমার চোখ খুলে দিয়েছেন। তার জন্যে আমি তাঁদের কাছে কৃতজ্ঞ।

তরুণ বয়সে আমি জীবন শুরু করেছিলাম একজন মার্কসবাদী হিসেবে। সব ধরণের ভাববাদের বিরুদ্ধে বস্তুবাদী দর্শনটাই ছিল আমাদের জীবনের অন্বিষ্ট। কিন্তু বাউল-ফকিরদের দর্শনের গভীরে ঢুকে ক্রমশঃ বুঝতে পারি যে তাঁরা সর্ব অর্থেই 'বস্তুবাদী'। এবং মানবদেহকেন্দ্রিক তাদের এই বস্তুবাদী দর্শনকে রক্ষার জন্যে যুগে যুগে রাষ্ট্রশক্তি ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানসমূহের হাতে তাঁরা কম লাঞ্ছিত হননি। তাঁদের মত করেই তারা বিপ্লবী — মানবতার বিপ্লবী। প্রকৃত বাউল-ফকির সাধকদের প্রতি তাই আমার গভীর শ্রদ্ধা রয়েছে।

আর লালন ফকিরকে যত জেনেছি ততই মুগ্ধ হয়েছি গভীর সব তত্ত্ব কথা খুবই সহজভাবে বলতে পারার ওঁর অসামান্য দক্ষতা এবং গান রচনার ওঁর সহজাত প্রতিভা দেখে। আমি মনে করি লালন ফকির হচ্ছেন বাংলার লোকজ সংস্কৃতির শ্রেষ্ঠ ফুল। রবীন্দ্রনাথের মতই লালনের গান, এই পরিণত বয়সে, আমার সর্বক্ষণের সঙ্গী। আমার নিজের জীবনে প্রেমে, দ্রোহে, বেদনায়, সঙ্কটে এঁদের দু'জনের গান থেকেই আমি অনুপ্রেরণা পাই। প্রথম দিকে লালন ফকিরের গানের প্রতি আমি আকর্ষিত হয়েছিলাম মূলত ওঁর গানের অসাম্প্রদায়িক চরিত্রের কারণে। বাংলাদেশের সমাজ ও রাজনীতিতে এই সাম্প্রদায়িক-অসাম্প্রদায়িক বিষয়টি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। দেশে অসাম্প্রদায়িকতা প্রতিষ্ঠার আমাদের সংগ্রামে লালন ফকিরকে হাতিয়ার হিসেবে পাওয়ার লক্ষ্যেই আমি তরুণ জীবনে লালনের

প্রতি আকর্ষিত হয়েছিলাম। পরে অবশ্য ওঁর গানের গভীরতর দিকগুলি ক্রমশঃ আমার কাছে ধরা পড়ে।

প্রশ্ন : ২ আপনার বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়ার সময় মনে হল, এখান থেকে কিছু একটা বের হতে পারে। আপনার কি সেই দিনটির কথা মনে পড়ে যেদিন আপনার একথা মনে হয়েছিল?

উত্তর সঠিক দিনটির কথা বলা কঠিন। তবে তরুণ বয়সের এটা এক উপলব্ধি ছিল যে বাংলার বাউল-ফকিরেরা এমন এক লোকজ ঐতিহ্যের অধিকারী যা সুগভীর ও শিল্পিত। তখনও কিন্তু তাঁদের সাধনার 'বস্তুবাদী' (!) করণ-কারণ সম্পর্কে আমার খুব একটা স্বচ্ছ ধারণা ছিল না। সেসব জানলাম যখন ওঁদেরকে নিয়ে ছবি তৈরি করার লক্ষ্যে ভালোভাবে গবেষণা শুরু করলাম।

প্রশ্ন : ৩ বাউল-ফকির নিয়ে ছবি করার কথা কবে কীভাবে প্রথম মাথায় এল?

উত্তর আগেই বলেছি যে আমি মার্কসবাদী হিসেবে জীবন শুরু করেছিলাম। সমাজ-বদলের রাজনীতি ছিল তরুণ বয়সে আমাদের সর্বক্ষণের ধ্যান-জ্ঞান। বাংলাদেশের প্রেক্ষিতে প্রগীতিশীল রাজনীতির প্রথম বাধাটাই আসে সাম্প্রদায়িক রাষ্ট্রশক্তি ও শাসকশ্রেণীর সাম্প্রদায়িক দর্শনের কাছ থেকে। তাই এই সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধির বিরুদ্ধে একটা পাল্টা দর্শন হিসেবে লালনকে তুলে ধরাটা ছিল বাউল-ফকিরদের নিয়ে আমার প্রথম ছবি *অচিন পাখি*-র প্রাথমিক উদ্দেশ্য। ধর্ম-বর্ণ-জাতি এসবের উর্ধ্বে সর্বমানবিকতার যে দর্শনটি বাউল-ফকিরদের আছে, সেটা তুলে ধরাটাই লক্ষ্য ছিল। কিন্তু গবেষণার আরো গভীরে ঢুকে এবং বাউল-ফকিরদের ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে এসে, বিশেষ করে মহিন শাহ-বাদের শাহ এসব তাত্ত্বিক গুরুদের সাহচর্যে থেকে আমি বুঝতে পারি যে অসাম্প্রদায়িকতাই লালন ফকিরের গানের একমাত্র প্রগতিশীল দিক নয়। লালন ফকিরের সাধনা ও দর্শন আরো অনেক গভীর। সৃষ্টিতত্ত্ব ও ঈশ্বরের অস্তিত্ব নিয়েই তাঁর নানা প্রতিবাদী জিজ্ঞাসা। এক গভীর লোকজ দার্শনিক তিনি। আর সে দর্শনের ভিত্তিটা হচ্ছে — দেহকেন্দ্রিক বস্তুবাদ। বাংলার মধ্যবিত্ত জগতে দর্শনচর্চার দৈন্যতা আছে। লালন

ফকিরের মত প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার বাইরের এক মানুষের মধ্যে সেই দর্শনচর্চার গভীরতা ও অর্জন দেখে আমি মুগ্ধ হই। তাই ঠিক করি, প্রথমে লালন ফকিরের জীবন ও দর্শন নিয়ে এই পরিচিতিমূলক প্রামাণ্যচিত্রটা বানাব — *অচিন পাখি* এবং পরে সময়-সুযোগ মতো ওঁকে নিয়ে একটা পূর্ণ দৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র তৈরী করব — *লালন*। *অচিন পাখি* ও *লালন* ছবি দুটির চিন্তাটা আমর মাথায় এভাবেই এসেছিল।

প্রশ্ন : ৪ আপনি বস্তুবাদী দ্বন্দ্ববাদে বিশ্বাস করতেন। আপনি যাঁদের কাছে গেলেন তাঁরাও বস্তুবাদী। তফাৎ কোথায়?

উত্তর বাউল-ফকিরদের বস্তুবাদী সাধনার মূল কথাটা হল — মানবদেহ। "*যা আছে ব্রহ্মাণ্ডে, তা আছে দেহভাণ্ডে*" — তাঁদের দেহতত্ত্বের মূল বিষয়টাই হচ্ছে মানবদেহের রসরতির নানা অনুষঙ্গ। মার্কসীয় বস্তুবাদী দর্শনেরও এক বড় কথা হচ্ছে শ্রমজীবী মানুষের বেচবার আর কিছু নেই, তাদের দেহজাত শ্রম ছাড়া। দুই ক্ষেত্রেই এই মানবদেহটাকেই গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে যে মানবদেহ সব বস্তুবাদেরই মূল নির্যাস বলে আমি মনে করি। একজন মার্কসীয় বস্তুবাদীও একজন ফকিরী মতবাদের বস্তুবাদী উভয়ের কাছেই এই মানবদেহ ও এই মানবজীবনের চেয়ে বড় কিছু নেই। ওই যে লালন বলেছিলেন, "*এমন মানবজনম কী আর হবে/ মন যা কর ত্বরায় কর এই ভবে*"। বাউল-ফকিরেরা অনুমানে বিশ্বাস করেন না। তারা বর্তমানপন্থী। বাউল-ফকিরেরা যে পরলোকের চেয়ে বর্তমান জীবনটার উপর গুরুত্ব দিয়েছেন, এই ইহলৌকিকতা, ইসলাম-প্রভাবিত বাংলাদেশের দরিদ্র মানুষদের জন্যে খুবই প্রয়োজনীয় একটা দিক বলে আমার কাছে মনে হয়েছে। কারণ বর্তমান জীবনটাকে তুচ্ছ করে পরলোককে গুরুত্ব দেওয়ার যে চেষ্টা ইসলামের ধর্মীয় এস্টাব্লিশমেন্ট করে থাকে তা আসলে দরিদ্র শ্রমজীবী মানুষকে ঠকানো ছাড়া আর কিছু নয়। মানবদেহ ও বর্তমান ইহজগতকে কেন্দ্রে স্থাপিত করে বাউল-ফকিরেরা সমাজ প্রগতির পক্ষে কাজ করছেন।

প্রশ্ন : ৫ সংগঠন কাকে বলে? গঠন আর সংগঠনে আপনি কোন তফাৎ পেয়েছেন? সেটা কি আপনি পেলেন কোনো বাউল-ফকিরের

মাধ্যমে?

উত্তর একটা সমাজবিপ্লব করে রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করার লক্ষ্যে আমরা সংগঠন গড়েছিলাম। সে কাজে আন্তরিকভাবে একশ' ভাগ নিয়োজিত থাকা সত্ত্বেও আমার মনে এই দোলাচলটা ছিল, হয়তো সংবেদনশীল ছিলাম বলে যে, কোথাও যেন একটা গলদ রয়ে যাচ্ছে। আমরা আমাদের মেধা ও সংগঠন দক্ষতা দিয়ে গরীব মানুষদের কেবল দলীয় রাজনীতির স্বার্থে ব্যবহার করছি না তো? একটা অপরাধবোধ আমার মধ্যে কাজ করত।

বাউল-ফকিরদের ব্যাপারটা আলাদা। তাদের গঠন আর সংগঠন, যাই বলুন, তা তো ক্ষমতায়নের পথে যায়নি। মানবপ্রেমের পথে গেছে। আর লালন তো কোনো সংগঠনও নিজের জন্যে গড়েননি। কোনো গুরুপাঠও তিনি গড়ে তোলেননি। তিনি ছিলেন মূলত একজন সাধক ও গীতিকার, একজন শিল্পী।

প্রশ্ন : ৬ একজন শিল্পী হিসেবে এই ছবি দু'টি করার সময় কি আপনার বিশেষ কোনো উদ্দেশ্য ছিল?

উত্তর দুটি ছবির ক্ষেত্রে উদ্দেশ্যে ব্যাপারে কিছু তারতম্য ছিল। বাংলাদেশের মধ্যবিত্তের কাছে নব্বই দশকের মাঝামাঝি পর্যন্ত লালন ফকির কেবল একটা নাম মাত্র ছিল। লালনের খুব অল্প সংখ্যক গানই সাধারণ মানুষ জানত। মূলত ফরিদা পারভীন যেসব গান রেডিও-টেলিভিশনে বা ক্যাসেটে গেয়ে জনপ্রিয় করেছিলেন। *অচিন পাখি* প্রামাণ্যচিত্রটি তৈরির সময় আমার একটা উদ্দেশ্য ছিল প্রকৃত লালন ফকিরকে জনগণের কাছে পরিচিত করানো, তাঁর জীবনের একটা রেখাচিত্র তুলে ধরা এবং লালন ফকির তথা বাউল-ফকিরদের দর্শন সম্পর্কে মানুষকে অবহিত করা।

আর *অচিন পাখি* প্রামাণ্যচিত্রটির প্রায় দশ বছর পরে যখন আমি *লালন* কাহিনীচিত্রটি তৈরি করতে নেমেছি ততদিনে গবেষণার ব্যাপারে আমি আরো অনেকটা এগিয়েছি। বাউল-ফকিরদের সঙ্গে আমার মেলামেশা ততদিনে আরো গভীরতর হয়েছে। আরো অনেককিছুই জেনেছি, নতুন করে কিছু বিষয় বুঝতে শিখেছি। এই সময়কালের মধ্যে লালন তথা বাউল-ফকিরদের নিয়ে বেশ কিছু

ভাল গবেষণাকাজও বেরিয়েছিল। যেমন, সুধীর চক্রবর্তীর কাজ, শক্তিনাথ ঝা'র কাজ, ক্যারল সালমন, জ্যাঁ ওপেনশ বা বাংলাদেশের আবুল আহসান চৌধুরীর কাজ। এসব গবেষণা কর্ম আমাকে লালন ফকিরের জীবন, তাঁর সময় ও সে যুগের প্রধান প্রধান দ্বন্দ্ব, লালনের অন্তর্নিহিত বেদনা ও ক্ষরণ — এসব বুঝতে অনেকটা সহায়তা করেছে। বেশ কয়েকটা গানের ইঙ্গিতপূর্ণ দ্যোতক অর্থ আমার কাছে আরো পরিষ্কার হয়েছে। তাছাড়া যেহেতু *লালন* একটা কাহিনীচিত্র, ফলে লালন ফকিরের সঙ্গে লালনের সমসাময়িকদের আন্তঃসম্পর্ক, যেমন দুদ্দু শাহ ও কাঙাল হরিনাথের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক, ঠাকুর পরিবার, বিশেষ করে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের সাথে তাঁর সম্পর্ক, মীর মোশারফ হোসেনের সাথে ওঁর সম্পর্ক — এসব বিষয় নিয়েও আমাকে গবেষণা করতে হয়েছে এবং ছবিটিতে সেসব চরিত্রকে দেখাতে হয়েছে। ফলে *অচিন পাখি* ও *লালন* ছবি দুটি নির্মাণের পরিপ্রেক্ষিত ও উদ্দেশ্যের ক্ষেত্রে কিছুটা ভিন্নতা ছিল।

প্রশ্ন : ৭ এই বিষয়ে ছবি করার সময়ে আপনি গবেষণার কোন্ কোন্ ক্ষেত্রের ওপর বিশেষভাবে নজর দিয়েছিলেন?

উত্তর বাউল-ফকিরদের ব্যাপারে আমার আগ্রহের মূল বিষয়টি ছিল — দর্শনগত। আগেই বলেছি মানবদেহকেন্দ্রিক তাঁদের বস্তুবাদী দর্শনটি আমার বিশেষ আগ্রহের ক্ষেত্র ছিল। এছাড়া বাংলার সামাজিক ইতিহাসে বাউল-ফকিরদের স্থান এবং সবরকম ধর্মীয় ভেদ ও সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে বাউল-ফকিরদের বলিষ্ঠ অবস্থানের দিকটিতেও আমার কৌতূহল ছিল। আর একজন শিল্পী হিসেবে আমার বিশেষ, বিশেষ আগ্রহ ছিল, তাঁদের গানের ব্যাপারে। বাউল-ফকিরদের গানের সম্ভার বাঙ্গালীর সংস্কৃতির এক সমৃদ্ধ সম্পদ। কোনো কোনো পদকর্তার, বিশেষ করে লালন ফকিরের গান রচনার সহজাত দক্ষতাটা আমাকে সবসময়ই গভীরভাবে মুগ্ধ করেছে। কি অবলীলায়, কি অব্যর্থ সব শব্দ প্রয়োগ, যেমন ধরেন *নিঃশব্দ শব্দে সজোরে। খাবে* বা *আঁখির কোণে পাখির বাসা* — এ ধরণের বৈদগ্ধ্য তো আমরা অনেক সুশিক্ষিত কবিদের মাঝেও পাই না।

আবার কত সহজ-সরল লোকজ সব চিত্রকল্পের মাধ্যমে লালন তাঁর দর্শনের গভীরতম দিকগুলিও ফুটিয়ে তুলতে জানতেন।

ভাষায় একান্ত গ্রামীণ কিন্তু চেতনায় গভীর দ্ব্যর্থবোধক নানা প্রতীক-উপমা ব্যবহার করে বাউল-ফকিরেরা তাঁদের গানকে দ্বি-স্তরবিশিষ্ট করতে জানতেন। এ সঙ্গীতপ্রতিভা আমি বলব গোটা বিশ্বেই বিরল। ছবি দুটির গবেষণার ক্ষেত্রে তাই বাউল-ফকির তথা লালনের গানের বিষয়টি আমার বিশেষ অন্বিষ্ট ছিল। লালনের গানের মধ্য দিয়েই আমি লালন ফকিরকে বুঝতে চেষ্টা করেছি। *লালন* ছবিটির চিত্রনাট্য লেখার সময় আমি লালন ফকিরের গানকেই তাই নানাভাবে ব্যবহার করেছি। কখনো গান হিসেবে, কখনো সংলাপের অংশ হিসেবে। আসলে লালন তো তাঁর জীবনদর্শনের কোন লিখিত রূপ রেখে যাননি। তাঁর জীবন কাঠামোটাও কিছুটা ধোঁয়াশা। ফলে লালনের মনোজগতকে বুঝতে তাঁর গানই ছিল আমার কাছে একমাত্র উপাদান। ফলে ছবিটা তৈরির সময় লালনের কয়েক'শ গানকেই আমি আমার গবেষণার ক্ষেত্রে বিশেষভাবে গুরুত্ব দিয়েছি।

প্রশ্ন : ৮ উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য, আমাদের মতে, সকলের আগে বাউল-ফকির দর্শনের একটা জায়গাতে পৌঁছেছিলেন। উপেন্দ্রবাবুর কাজ কি আপনাকে কোনোভাবে প্রভাবিত করেছে?

উত্তর বাউল-ফকিরদের নিয়ে গবেষণা শুরুর ক্ষেত্রে আমি প্রথম যে বইটি পড়ি তা উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্যের *বাংলার বাউল ও বাউল গান*। পরে হয়তো ওঁর বইয়ের চেয়ে বস্তুনিষ্ঠ ও তথ্যবহুল বই আরও বের হয়েছে। কিন্তু ভুলে গেলে চলবে না, উপেন্দ্রনাথ বাবুই বাংলার বাউল-ফকিরদের প্রতি এদেশের শিক্ষিত-সচেতন মানুষদের দৃষ্টি ফেরাতে পথপ্রদর্শকের ভূমিকা পালন করেছিলেন। ওঁর কাজের ব্যাপ্তি ও পরিধিটাও ছিল বিশাল। ব্যক্তিগতভাবে আমি তাঁর বই পড়ে উপকৃত হয়েছি।

প্রশ্ন : ৯ আর কাদের কাদের লেখা আপনাকে অনুপ্রাণিত করেছিল?

উত্তর বাংলায় যাঁরা লিখেছেন, যেমন সুধীর চক্রবর্তী, শক্তিনাথ ঝা, আবুল আহসান চৌধুরী। বিদেশীদের মধ্যে ক্যারল সালমন ও জ্যাঁ

ওপেনশ'র লেখা আমাকে অনুপ্রাণিত করেছে। আশ্চর্য হলেও সত্য, লালনের কিছু গানের অর্থ বিদেশী গবেষকদের হাতেই বেশী পরিষ্কারভাবে ফুলে উঠেছে। ওঁদের গবেষণার প্রণালী বিজ্ঞানসম্মত এবং ওঁদের মেধা, শ্রম ও আন্তরিকতা প্রশ্নাতীত।

এছাড়া রয়েছেন লন্ডনপ্রবাসী বাউল গানের সংগ্রাহক রঙ্গন মোমেন। উনি নিজে কিছু লেখেননি, কিন্তু বাঙ্গালীদের মধ্যে বাউল-ফকিরদের সম্পর্কে সবচেয়ে তত্ত্বজ্ঞ একজন মানুষ হচ্ছেন রঙ্গন মোমেন। প্যারিসের দেবেন ভট্টাচার্যের পরেই যাঁর রয়েছে বাউল-ফকিরদের গানের সবচেয়ে বড় সংগ্রহশালাটি। রঙ্গন মোমেনের সঙ্গে বাউল-ফকিরদের দর্শনতত্ত্ব ও গান নিয়ে বিভিন্ন সময়ে আলাপ করে আমি খুবই উপকৃত হয়েছি।

প্রশ্ন : ১০ বিদেশীরা দূর থেকে দেখছেন বলেই কি বুঝতে পারছেন বেশি?

উত্তর দূরত্ব এক ধরনের নৈর্ব্যক্তিকতা দেয়, ভালো গবেষণার জন্যে যে নৈর্ব্যক্তিকতাটা প্রয়োজনীয়। তাছাড়া এটা আমার অভিজ্ঞতা যে পশ্চিমীরা যে কোনো গবেষণা খুব গভীরে গিয়ে ও নিবিড়ভাবে করে। ওঁরা খুবই পরিশ্রমী এবং ওঁদের পদ্ধতিগুলিও বেশ বৈজ্ঞানিক।

প্রশ্ন : ১১ যেসব বাউল-ফকিরের সঙ্গে আপনি কথা বলেছিলেন, তাঁদের কথা যদি সবিস্তারে বলেন।

উত্তর অনেক বাউল-ফকিরের সঙ্গেই আমি কথা বলেছি। অনেকের সঙ্গে ই দীর্ঘ আলাপ-আলোচনা হয়েছে। তবে যাঁর নাম সর্বাগ্রে বলতে হয় তিনি — ফকির মহিন শাহ। আগেই বলেছি মহিন শাহ ছিলেন লালন ফকিরের প্রশিষ্যের প্রশিষ্য। দেশে-বিদেশে অনেক বিদগ্ধ বুদ্ধিজীবীর সাথে আমার মেশার সুযোগ ঘটেছে, কিন্তু মহিন শাহর মতো এরকম মেধাবী ও জীবনরসিক মানুষ আমি খুব বেশী দেখিনি। অথচ যাকে বলে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা তা তাঁর ছিল না। কিন্তু মহিন শাহর মধ্যে আমি খুঁজে পেয়েছি বাংলার লোকজ প্রজ্ঞার শ্রেষ্ঠ এক প্রকাশকে। লালন ফকিরের গভীরতা ও মেধার পরিমাণ দেখে মাঝে মাঝে আমার মনে বিস্ময় জাগতো যে এ কী করে সম্ভব? কোনো রকম প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা ছাড়াই, মেধার এমন বিকাশ ও

প্রকাশ কীভাবে সম্ভব? মহিন শাহকে দেখে আমি বুঝেছি যে তা খুবই সম্ভব। যে গভীর প্রজ্ঞার তাঁরা প্রতিনিধিত্ব করেন তা হাজার বছরের লোকজ বাংলার প্রজ্ঞারই এক ধারাবাহিকতা। এর সঙ্গে মেকলে সাহেব প্রণীত প্রাতিষ্ঠানিক 'শিক্ষা' (!)-র কোনো সম্পর্ক নেই।

তো মহিন শাহর সঙ্গে আমি অনেক সময় কাটিয়েছি। উনি আমাকে খুব স্নেহ করতেন। ওঁর সঙ্গে আমি পদ্মার চরে চরে অনেক ঘুরেছি। কুষ্টিয়া জেলায় বিভিন্ন অঞ্চলে ওঁর শিষ্য-শিষ্যাদের বাড়িতে গেছি, থেকেছি। ওঁর সঙ্গে একাধিক সাধুসঙ্গে অংশ নিয়েছি। যেহেতু উনি আমাকে স্নেহ করতেন এবং কুষ্টিয়া-ফরিদপুর অঞ্চলের বাউল-ফকিরেরা মহিন শাহকে মানতেন একজন পরমশ্রদ্ধেয় গুরু হিসেবে, ফলে অন্যান্য বাউল-ফকিরদের কাছেও আমার দ্বার ছিল উন্মুক্ত। মহিন শাহ ঢাকায় এসে আমার বাড়িতেও থেকেছেন। ঘরে, ট্রেনে, বাসে, নৌকায়, গরুর গাড়িতে বাউল-ফকিরদের তত্ত্ব ও সঙ্গীত নিয়ে মহিন শাহর সঙ্গে আমার অনেক অনেক দিন আলাপ হয়েছে। কোনোদিন কথা বলতে বলতে গভীর রাতও হয়েছে। আমার হাজারো প্রশ্নের জবাব দিতে উনি ছিলেন অক্লান্ত। অল্প কথায় কোনো গভীর জিনিস খুব সহজে বোঝাতে পারতেন। কোনো তর্ক-বিতর্কেই উত্তেজিত হতেন না। প্রশ্নের জবাবে কেবল হয়তো একটা প্রবাদ বা প্রবচন বলতেন। কিম্বা স্মিতমুখে একতারাটা টেনে নিয়ে, ওটা ওঁর হাতের কাছেই সবসময় মজুত থাকত, কখনো লালনের, বা কখনো অন্য কোনো পদকর্তার, একটা চরণ গেয়ে আমার প্রশ্নের জবাব দিতেন। অসামান্য মেধাবী, ব্যতিক্রমী এক মানুষ ছিলেন মহিন শাহ। ওঁকে দেখেই আমি বুঝেছি লালন ফকির কেমন ছিলেন।

বাউল-ফকির দর্শনের আরেকজন তত্ত্বগুরু যাঁর সঙ্গে আলাপ করে আমি বিশেষ উপকৃত হয়েছি, তিনি বৃদ্ধ ফকির বাদের শাহ। ছেঁউড়িয়ানিবাসী বাদের শাহ লালনের আশ্রমের পাশেই থাকতেন। আজন্ম তিনি লালন ফকিরের গান ও তত্ত্ব নিয়ে সাধনা করে গেছেন। ওঁর অনেক ভক্ত রয়েছে। মাঝে মাঝে ভক্তদের নিয়ে সাধুসঙ্গ করতেন। আমি সেসব সাধুসঙ্গে অংশ নিয়েছি। বাদের শাহ

আমাকে লালন ফকিরের জীবনী ও লালনের কিছু গানের অন্তর্নিহিত অর্থ সম্পর্কে এমন কিছু জানিয়েছেন যা আমি অন্য কোথাও পাইনি।

আরেকজন হচ্ছেন ফকির আনোয়ার হোসেন মন্টু শাহ। মন্টু শাহই প্রথম লালনের গানের তিনটি সংকলন বের করেন, যেখানে লালনের প্রাপ্ত গানগুলি রয়েছে। মন্টু শাহ ঠিক সঙ্গীতজ্ঞ নন, নিজে গান করেন না। তবে উনি বাস করেন ছেঁউড়িয়ার, লালনের মাজারের পাশে এবং ওঁর গোটা জীবনটাই কেটেছে লালনচর্চায়। ফকির মন্টু শাহ আমার ঘনিষ্ঠজনদের একজন। ওঁর সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করেও লালন ফকির সম্পর্কে অনেককিছু জেনেছি। লালনের গান সংগ্রহের জন্যে ফকির মন্টু শাহ কুষ্টিয়া, যশোর, পাবনা, রাজশাহী, ঢাকা, ফরিদপুর বা খুলনার এমন কোনো জায়গা নেই যেখানে যাননি। চেনেন প্রায় সব বাউল-ফকিরদেরই। ওঁর মাধ্যমে আমি বাংলাদেশের বাউল-ফকিরদের অনেককেই ব্যক্তিগতভাবে চিনেছি। লালন-চর্চার মূল মূল ব্যক্তি ও কেন্দ্রগুলি সম্পর্কে জানতে পেরেছি।

অচিন পাখি ও *লালন* — এই দুটি ছবির ক্ষেত্রেই বাউল-ফকিরদের নানা বিষয় সম্পর্কে জানা-বোঝার ব্যাপারে বাংলাদেশের এই তিনজন প্রবীন লালনপন্থীর কাছ থেকে আমি অনেক উপকার পেয়েছি। তরুণদের মধ্যে ফকির বলাই শাহ আমাকে লালনভক্তদের অনেকের সঙ্গে যোগাযোগ করিয়ে দেবার ক্ষেত্রে সহায়তা করেছেন। পশ্চিমবঙ্গের ক্ষেত্রে যেটা করেছেন কার্তিক দাস বাউল। কার্তিক বাউল আমাকে বীরভূম ও নদীয়ার বিভিন্ন অঞ্চলের ও আড়ংঘাটার বাউল-ফকিরদের আস্তানাগুলিতে নিয়ে গেছেন।

প্রশ্ন : ১২ এই ঐতিহ্যের মধ্যে বহু আঞ্চলিক বৈচিত্র নজরে আসে। আপনি গবেষণার ক্ষেত্রে কি কোনো অঞ্চলের উপর জোর দিয়েছিলেন? দিয়ে থাকলে কি কারণে দিলেন?

উত্তর আমি গবেষণার যত গভীরে গেছি ততই অনুধাবন করতে পেরেছি যে বাংলার বাউল-ফকিরদের মূলতঃ তিনটি কেন্দ্র রয়েছে। প্রথমতঃ বীরভূমকেন্দ্রিক একটা ধারা, যেখানে দেহকেন্দ্রিক বৌদ্ধ তান্ত্রিকতার একটা ছাপ রয়েছে। আরেকটি ধারা হচ্ছে নদীয়াকেন্দ্রিক, যেখানে

শ্রীচৈতন্য বা ভক্তিবাদী আন্দোলনের ফলে স্বাভাবিক কারণেই সহজিয়া বৈষ্ণববাদের প্রভাবটা বেশী। আর একটি কেন্দ্র বাংলাদেশের কুষ্টিয়ায়, মূলতঃ লালন ফকিরের আশ্রম ছেঁউড়িয়াকেন্দ্রিক। জনসংখ্যার মধ্যে মুসলমান বেশী বলেই হয়তো এখানে সুফী মতবাদের প্রভাবটাই বেশী।

আসলে বাংলার বাউল-ফকিরদের দর্শন তো এই তিনটি মতবাদেরই এক সংমিশ্রণ — বৌদ্ধ তান্ত্রিকতা, বৈষ্ণব সহজিয়া ও ইসলামী সুফীবাদ। তো গবেষণার কাজে আমি এই তিন অঞ্চলেই অনেক ঘুরেছি। বাউল-ফকিরদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করেছি। তাঁদের গান বারবার শুনেছি। তবে যেহেতু আমার দুটি ছবিরই বিষয়বস্তু মূলতঃ লালন ফকির, ফলে যে দুটি অঞ্চলে লালনের প্রভাব সবচেয়ে বেশী, সেই কুষ্টিয়া-যশোর-ফরিদপুর অঞ্চল এবং পশ্চিমবঙ্গের নদীয়া-কৃষ্ণনগর-চব্বিশ পরগণা এসব অঞ্চলেই আমি বেশী কাজ করেছি। *অচিন পাখি*-র শুটিং বাংলাদেশের কুষ্টিয়া ও পশ্চিমবঙ্গের নদীয় জেলার বিভিন্ন অঞ্চলে হয়েছে। তবে *লালন* ছবির ক্ষেত্রে শুটিং মূলতঃ বাংলাদেশের কুষ্টিয়া-যশোর অঞ্চলেই করা হয়েছে।

প্রশ্ন : ১৩ আপনি আমাদেরকে সিলেট, নেত্রকোনা এসব ভাটি অঞ্চলের বাউল-ফকিরদের সম্পর্কে কিছু বলবেন কি?

উত্তর সিলেট ও নেত্রকোনার ভাটি অঞ্চলে মরমি গানের এক বিশাল ঐতিহ্য রয়েছে। এ ধারার এক বড় প্রকাশ আমরা দেখি হাসন রাজার মধ্যে। এছাড়া রয়েছেন রাধারমণ এবং ফকির শাহ আবদুল করিম। এঁদের কাজ আমাকে অনুপ্রাণিত করে।

নেত্রকোনার হাওড় অঞ্চলের পুরোটাই মরমি গানের এক উর্বর ক্ষেত্র। রয়েছেন সাধক জালাল খাঁ, উকিল মুনশি, সাধক দ্বীন শরত বা অন্ধ সাধক তৈয়ব আলী। এঁদের সবার কাজই মনোযোগের দাবী রাখে।

প্রশ্ন : ১৪ যে অঞ্চলগুলিতে আপনার ছবি দুটির শুটিং হয়েছিল, সেসব জায়গার লোকদের কি ছবি দুটি দেখানোর কোনো ব্যবস্থা আপনি করতে পেরেছিলেন? হলের দর্শকের বাইরে স্থানীয় মানুষদের প্রতিক্রিয়া কী আপনার জানার সুযোগ হয়েছিল?

উত্তর যেহেতু লালন ফকিরের আশ্রম কুষ্টিয়ায় এবং বাংলাদেশের লালনবাদীরা মূলতঃ কুষ্টিয়াকেন্দ্রিক, ফলে আমার দুটি ছবিই *অচিন পাখি* ও *লালন* কুষ্টিয়াতে দেখানো হয়েছে। এ অঞ্চলের মানুষেরা ছবি দুটি সহজেই বুঝতে পেরেছেন এবং উপভোগ করেছেন। তবে বাংলাদেশের অন্যান্য অঞ্চলে, যেখানে লালন ফকির, বা সামগ্রিকভাবে বাউল-ফকিরদের সম্পর্কে জানাশোনা কম, সেসব অঞ্চলে ছবি দুটি হয়তো তেমন অভিঘাত সৃষ্টি করতে পারেনি। অনেক কিছুই তাঁদের বোঝার বাইরে রয়ে গেছে। একই বিষয়টা ঘটেছে ঢাকাকেন্দ্রিক ধনী ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীগুলোর ক্ষেত্রে। লালনের গান বলতে বাংলাদেশের মুসলিম সুবিধাভোগী শ্রেণীটা মূলত বোঝেন মন-উদাস-করা এক রকম গান যেগুলো ফরিদা পারভীন ও অন্যান্য মধ্যবিত্ত শিল্পীরা রেডিও-টেলিভিশন বা ক্যাসেট-সিডির মাধ্যমে জনপ্রিয় করেছেন। লালন ফকির তথা বাউল-ফকিরদের বিচিত্র জীবনদর্শন সম্পর্কে এসব দর্শক-শ্রোতা সামান্যই জানেন। আমাদের ছবিতে সেসব দেখে তাঁরা কিছুটা ধাক্কা খেয়েছেন। আসলে এসব গানের প্রকৃত গভীরতা অনুধাবন করার মানসিক বিকাশের পর্যায়ে এখনও বাংলাদেশের উঠতি ধনিকশ্রেণীটা নেই। শ্রেণীটা এখনও ধনসম্পদ সংগ্রহ বা গড়ে ওঠার প্রক্রিয়ায়। মাঝে মাঝে লালন বা হাসন রাজার মন-উদাস-করা গান তাদের ভালো লাগে বটে, তবে লালনের গানের বাণীর গভীরে ঢোকার মেধা ও মানসিকতার ঘাটতি আছে তাদের মধ্যে।

অজানার ব্যাপারটা পশ্চিম বাংলার দর্শকের ক্ষেত্রেও ঘটতে পারে। 'বাউল' সম্পর্কে বাঙ্গালী মধ্যবিত্ত মানসে যে একটা রোমান্টিক নির্মাণ রয়েছে, যা সৃষ্টিতে প্রথম জীবনের রবীন্দ্রনাথেরও কিছুটা ভূমিকা রয়েছে, বাস্তবের বাউল-ফকিরেরা তো সেরকম নয়! তাঁদের সঙ্গে যাঁরাই ঘনিষ্ঠভাবে মিশেছেন, তাঁরাই সেটা জানেন। তাঁদের 'বস্তুবাদী' দর্শন মধ্যবিত্তদের সংবেদনশীলতাকে বরং আঘাতই করে। তাছাড়া আমার *লালন* ছবির ফকিরেরা সব সাদা পোশাক পরে। ছেঁউড়িয়ার লালনপন্থীদের এটাই রীতি। ভেক-খিলাফত নেবার পর সবার পোশাকই সাদা বা কাফনের কাপড়ের রং। এখন পশ্চিম বাংলার দর্শকেরা যেসব বাউলদের দেখতে

অভ্যস্ত তারা তো উজ্জ্বল রঙীন কাপড় পরে। ছবিটার ক্ষেত্রে এই পোশাকের ব্যাপারটাও পশ্চিমবঙ্গের দর্শকদের সাথে একটা দূরত্ব সৃষ্টি করতে পারে। তাছাড়া সুফী মতবাদ প্রভাবিত ফকিরদের আচার-অনুষ্ঠানের কিছু ভিন্নতা রয়েছে পশ্চিম বাংলার বাউলদের আচাররীতির সঙ্গে এবং পশ্চিমবঙ্গের দর্শকেরা সেসব আচাররীতির সঙ্গে তেমন পরিচিত নন।

প্রশ্ন : ১৫ আজকের বাংলাদেশে বাউল-ফকির সমাজের ভবিষ্যৎ কি? তাদের উদ্বেগ বা আশার কারণগুলি কি কি?

উত্তর সত্যি বলতে কি, আজকের বাংলাদেশে গায়ক বাউল-ফকিরদের কিছুটা ভবিষ্যৎ থাকলেও, সাধক বাউল-ফকিরদের ভবিষ্যৎ অন্ধকার। বিগত কয়েক বছর ধরে বাংলাদেশের সমাজে ইসলামীকরণ যেভাবে বেড়েছে, ইসলামী মৌলবাদী ধ্যান-ধারণা ও ওয়াহাদীদের প্রাতিষ্ঠানিক শক্তিগুলো যেভাবে মসজিদকেন্দ্রিক গ্রাম-বাংলায় জেঁকে বসেছে, তাতে বাউল-ফকিরদের প্রতিষ্ঠানবিরোধী জীবনচর্চা ক্রমশই আক্রান্ত হতে থাকবে। মূলত এ আক্রমণটা আসছে, আসবে, শাসকশ্রেণীগুলো থেকে বা রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানসমূহ থেকে। ফলে তার বিরুদ্ধে প্রকৃত সাধক-বাউল ফকিরদের টিকে থাকাটা কঠিন হবে।

তাছাড়া অতীত যুগে গ্রাম-বাংলার সমাজ নানা দান-অনুদানের মাধ্যমে এসব বাউল-ফকিরদের লালন করত। বাংলাদেশের মসজিদকেন্দ্রিক সুন্নী ইসলাম প্রভাবিত গ্রামসমাজ, এখন আর সেই মানসিকতায় নেই। বাংলাদেশের বাউল-ফকিরদের নিয়ে আমি তাই কিছুটা উদ্বিগ্ন।

আর রেডিও-টেলিভিশন এসবের কারণে যেসব গায়ক বাউল-ফকির ক্রমশ জনপ্রিয়তা পাচ্ছে, তারা ধণিক শ্রেণী বা শহুরে মধ্যবিত্তদের মধ্যে হয়তো প্রতিষ্ঠা পাবে, কিছু অর্থ-যশ, বিদেশ ভ্রমণ এসবও হয়তো জুটবে, তবে এর ফলে তাদের গ্রামীণ শেকড়ের সঙ্গে বিচ্ছিন্নতা বাড়তে বাড়তে তারা একসময় পরিণত হবে কেবলই জনপ্রিয় লোকগায়কে। বাউল-ফকিরদের প্রকৃত সাধনা ও জীবনচর্চার সঙ্গে তাদের আর সম্পর্ক রইবে না। যেরকম কিছু উদাহরণ আমরা পশ্চিমবঙ্গে হয়তো ইতিমধ্যেই দেখেছি।

বাংলাদেশেও সেটা ঘটছে। তবে যেহেতু এই দর্শনটি বা এই ধারাটি বাঙ্গালী সংস্কৃতির গভীরতর উপাদানগুলির সঙ্গে জড়িত, ফলে বাউল-ফকিরেরা কোনোসময়েই একেবারে হারিয়ে যাবে না।

প্রশ্ন : ১৬ ঢাকা শহর কি আসলে 'ঢাকা শহর'? মানে আমাদের প্রশ্ন এরা কিভাবে থাকবেন?

উত্তর বছর বিশেক আগেও ঢাকা ছিল মফস্বলী এরুটা বড় শহর। কিন্তু একটা স্বাধীন দেশের রাজধানী হওয়াতে ও সাম্প্রতিক বিশ্বায়নের প্রভাবে শহরটি জনসংখ্যা ও আকারে অত্যন্ত দ্রুতগতিতে বাড়ছে। প্রায় ডায়নোসরের আকারেই তার বৃদ্ধি ঘটছে! শহরটির নিজস্ব সাংস্কৃতিক চরিত্র তাই বেশ বড় ঝুঁকির মধ্যে রয়েছে। শহরটিতে একটা জঙ্গমতা রয়েছে এবং এখানে বৈষয়িক সমৃদ্ধি কিছু বাড়লেও সূক্ষ্মতার চর্চা বেশ কমে গেছে। বাউল-ফকিরেরা এখানে অপাংক্তেয় না হলেও তাদের অবস্থানটা হয়ে পড়ছে অনেকটা শো-পীসের মতো। ঢাকা শহরের এলিট ও ক্ষমতাবানদের এখন যে মানসিকতা তা ঠিক বাউল-ফকিরদের ধারণ করার অনুকূলে নয়। তবে এ শহরের মধ্যবিত্ত তরুণ এবং বুদ্ধিজীবী-শিল্পী-সাহিত্যিকদের মধ্যে বাউল-ফকিরদের গানের একটা ভালো গ্রহণযোগ্যতা রয়েছে।

প্রশ্ন : ১৭ যেহেতু আপনি এপার বাংলায় নিয়মিত আসা-যাওয়া করেন, তাই জিজ্ঞেস করি পশ্চিম বাংলার অবস্থা কি কোনোভাবে আলাদা?

উত্তর বেশ আলাদা। আমি যেসব জায়গায় গেছি, বীরভূম বা নদীয়ার গ্রামাঞ্চলে, সেখানে লক্ষ করেছি যে পশ্চিমবঙ্গের গ্রাম-বাংলার সমাজ এখনও বাউল-ফকিরদের ধারণ করতে ইচ্ছুক ও সক্ষম। তাছাড়া কলকাতার বিদগ্ধজনদের মধ্যে অনেক মানুষ আছেন যাঁরা বাউল-ফকিরদের দর্শন ও জীবনধারণ সম্পর্কে যথেষ্ট জানেন এবং তাদের দ্ব্যর্থবোধক গানের অর্থ তাঁরা বোঝেন ও উপভোগ করেন। বাংলাদেশে অবস্থা ঠিক তেমনটি নয়। তাছাড়া পশ্চিমবঙ্গের সমাজে ধর্মনিরপেক্ষতার বোধ বাংলাদেশ থেকে অনেক গভীর। ধর্মীয় মৌলবাদ পশ্চিমবঙ্গে দুর্বল। ফলে পশ্চিমবঙ্গে বাউল-ফকিরদের গ্রহণযোগ্যতা বেশী এবং তাঁদের টিকে থাকার ও বিকশিত হবার সম্ভাবনাও অনেক বেশি।

তুমি দেখা দিয়ে নিদয় হলে
কোথায় লুকালে গৌরহরি
জাত গেল পেট ভরল না গো
ওগো নাগরী .

বাংলার বাউল তথা অন্যান্য দেশজ ও লোকগান চর্চার আধুনিক ইতিহাস : একটি উদ্ধৃতি সংকলন

সাত্যকি বন্দ্যোপাধ্যায়

'পূর্ব ও পশ্চিমবঙ্গের বিরাট ফকির সম্প্রদায় ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইয়া নিশ্চিহ্ন হইবার মুখে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে, বৈষ্ণব-বাউলের সংখ্যা হ্রাস পাইতেছে। উভয় বঙ্গে তাহাদের অবস্থা অনেক বছর ধরিয়া যাহা লক্ষ্য করিতেছি, তাহাতে আশঙ্কা হয়। আগামী পঁচিশ বৎসরে ইহাদের আর কোন অস্তিত্ব থাকিবে না, তাই সর্বধ্বংসী কালের হাত হইতে এই ধর্ম সম্প্রদায়ের ভাব ধারার নিদর্শন এই গানগুলি এবং এই ধর্মের তত্ত্ব, দর্শন ও সাধনা সংক্রান্ত মোটামুটি একটা বিবরণ সংগ্রহ করিয়া রাখিয়া গেলাম ভাবীকালের বাঙালী অনুসন্ধিৎসুদের জন্য। যদি ইহার কোন প্রয়োজন উপলব্ধি না হয়, তবে ইহাও এই সম্প্রদায়ের মত অতীতের বিস্মৃতির তলে সমাহিত হইয়া যাইবে, কাহারো কিছু বলিবার থাকিবে না।

উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য
বাংলার বাউল ও বাউলগান
প্রথম সংস্করণের ভূমিকা ১৩৬৪

ইতিহাস তরঙ্গ বিক্ষুব্ধ লোকসঙ্গীত সম্পর্কিত লেখনী ও জবানী উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য মহাশয় বর্ণিত এই 'প্রয়োজন উপলব্ধির' ফলকথা ব্যক্তকরণেই কালে কালে অবয়াবিত। তার উপযোগিতা, সারমর্ম, স্মৃতি-বিস্মৃতির মধ্যাবর্ত্তে উপস্থিত সূক্ষ্ম ঐতিহাসিক বিভাজনে বিরাজিত। 'সর্বধ্বংসী কালের হাতে' শুধু এই বিশেষ গান ও তার গাহক সম্প্রদায় নয় তার তত্ত্ব-তালাশকারী ইতিহাস-এরও 'অতীতের বিস্মৃতির তলে সমাহিত' হওয়ার সম্ভাবনা এক ও অভিন্ন সূত্রে গ্রথিত। সূক্ষ্ম তথা ভাবার্থে 'মীন ও জল' সম্পর্কিত সংশয় চেতনা পূর্ব বা আগত কোন ভাবীকালেই অভাবী নয়। এই সব ভাবের ভাবী অতীতের গবেষণা-বৈতরণী সারণি কালে কালে বিভিন্ন ইতিহাস ধারাস্রোতে তার কাণ্ডারীদের অভীষ্ট লক্ষ্য ও তরঙ্গাদিষ্ট-নির্দিষ্ট গতিপথ অক্ষে প্রবাহিত। ভিন্ন ভিন্ন কাল পারাপারে এই যাত্রাপথে আন্দোলিত নানারূপ স্ববিশেষ স্বকীয় জলোচ্ছ্বাস প্রদর্শনই আমার লক্ষ্য। এই লক্ষ্যে আমি আক্ষরিক ভাবেই

কাণ্ডারীদের মুখাপেক্ষী। তাদের মুখ ও লেখনী নিঃসৃত বাণীধারার অবগাহন পিয়াসে চাতকী।

প্রদর্শিত উদ্ধৃতি সংকলন বাংলার লোকসঙ্গীত তথা দেশীয় গানের, আধুনিক চিন্তা-চেতনার দিকনির্দেশকারী স্থপতি বিশেষ ব্যক্তিত্ব তথা মনীষীগণের (সম্পাদিত) বক্তব্য অংশ স্মরণার্থে নিবেদিত। আসল লেখ-পরিসর বাংলার সংকীর্ণার্থে 'লোক' ও (ব্যাপকার্থে) 'দেশীয় গান' এর আধুনিক চিন্তক, গবেষক, সংগ্রাহক তথা সংকলকদের চেতনাদর্শ ও কর্ম নির্ধারণকারী সূত্রের ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট তাদের কথনানুসারে উদ্‌ঘাটন প্রয়াসী। তাদের বিভিন্ন গীত সংগ্রহণ-সংকলন এর বিষয় অবতারণায়, উপক্রমণিকায়, ভূমিকায়, মুখবন্ধে, আত্মপক্ষে বা গবেষণায় উদ্ভূত বিভিন্ন স্তরে, উক্ত ভাবনা সকল, যা তাদের চর্চার উৎস সন্ধান জ্ঞাপক, তাদের কর্মযজ্ঞের গৌণার্থ নিরূপক, তাকে উপজীব্য করাই আমার এই সংকলনের মুখ্যার্থ। যদিও এই সংগ্রহ ও তার সংকলকের আন্তঃসম্পর্ক অনেকাংশেই মহাজনী পদাবলী ও তার কীর্তনকারী সাধক, ভক্ত, ক্ষেপা, শিল্পীর সম, তবুও স্বনির্যুক্ত কার্যের স্বতন্ত্র দেশ-কাল-পাত্র যৌক্তিকতা বিচার পেশ করা আমার একান্ত ইচ্ছা। এই পেশকারীতে আমি মূলত বয়নের কাজই করব নিজেকে যতদূর সম্ভব পরোক্ষ ও অনুচ্চারিত রাখব। গান বলার সুর-তাল-ভাব-ঝোঁক এর বিচার (এই বিশেষ রীতি অনুসারে) শিল্পীর একান্ত স্বাধীন, স্বতন্ত্র, মুক্ত, স্বকীয় নিবেদন ভঙ্গীমার মূর্ত সাক্ষর, গ্রাহকদের ব্যক্তি দ্বারা বা (হেমাঙ্গ বিশ্বাস সংজ্ঞায়িত, বর্ণিত) তার 'বাহিরানা'র (অর্থাৎ মার্গীয় সংগীত-ঘরানার লোক সংস্করণ) দ্বারা বহুলাংশে নিয়ন্ত্রিত। এই সহজ সত্য নিম্নোক্ত সংগৃহীত উদ্ধৃতাংশ বা তার উপক্রম রচনার এক অবশ্য নিয়ামক বিধি। বিশেষ ক্ষেত্রে, সীমায়িত পরিসরে শিল্পীর স্বাধীনতা মহাজনী পদের সমৃদ্ধি দানে একান্ত সহায়ক কিন্তু সীমাসীম বোধ পতিত হলে তা ভক্তি নিবেদনার্থে বিচ্যুত হয়। অর্থাৎ শিল্পীর ভাব, স্বাধীনতা ও তার ভক্তি পারম্পর্যে, দীনতাবোধের আন্তঃসম্পর্ক সম্বন্ধীয় যথোপযুক্ত বোধ সফল বন্দন-কীর্তনে আবশ্যক। এই সংকলন অনেকাংশেই আমার শ্রীগুরুপদবন্দনা-স্বরূপ, নিজের সুরে বা বিভিন্ন 'বাহিরানা'র (এ ক্ষেত্রে প্রাতিষ্ঠানিক ঐতিহাসিক বিভিন্ন সিদ্ধান্ত বিশেষের) ধার করা সুরে বাঁধলেও তাকে স্বেচ্ছাচারী ও স্বকীয় মলিনতা থেকে যথাসম্ভব পবিত্র রাখাই আমার দীনতা নিদর্শনকারী কর্তব্য। বাউল-ফকির উৎসব মহাসমারোহের প্রারম্ভে এ আমার গুরুপদে অধিষ্ঠিত মহামান্য পূর্বজ-অগ্রজদের উদ্দেশ্যে নিবেদিত নাগরিক উপায়কৃত চরণবন্দনা।

গান বাংলার আবহমান বাঙ্ময় সত্তা তার চিন্ময়ী প্রতিমূর্তি। বাংলার ইতিহাস সংগীতমুখর, তার সংগীতচেতনা ইতিহাসমনস্ক। অবশ্য স্মরণীয় তার ইতিহাসমনস্ক সংগীতচেতনাও ইতিহাসলব্ধ, ইতিহাসফলিত। এই চেতনাকে তার পূর্ণ ও স্থায়ী অবয়ব প্রদান করতে বিশেষতর যুগ-ধর্ম-আদর্শের গুরুত্ব ও প্রভাব অনস্বীকার্য। বাংলার লোক তথা দেশীয় সংগীত এর আধুনিক চর্চা, গবেষণা ও অধ্যয়নের সূচনা হয় মূলত উনবিংশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে। এই চর্চায় সংগীত সংগ্রহ ও সংকলন এক ব্যাপক তথা বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করে। অধুনা বিভিন্ন সাহিত্য তথা সংগীত গবেষক যথা অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, সুধীর চক্রবর্তী এ বিষয়ে ঐক্যমত পোষণ করেছেন। এই শতকে ব্রিটিশ শাসন প্রবর্তিত রাজধানী মহানগরী কলকাতায় বাংলা গানের সংগ্রহ ও সংকলনের ব্যাপক প্রক্রিয়াকে সুধীর চক্রবর্তী মহাশয় 'প্লাবন'-সম রূপে অভিহিত করেছেন (বাংলা গানের সন্ধানে) দেশীয় গানের ক্ষেত্রে এই বিষয়ক 'প্লাবন' আগামী শতকের প্রথমার্ধে স্বদেশী যুগ সংগীত আন্দোলন কেন্দ্রিক সাংস্কৃতিক বহিঃপ্রকাশের আলোকে উজ্জ্বল হলেও, উনবিংশ শতকেই মূলত ঈশ্বর গুপ্তর প্রবর্তনায় তার বাঁধ ভাঙার শতোচ্ছ্বাস দৃশ্যমান হয়। সূচিত উচ্ছ্বাস এর ঐতিহাসিক কার্যকারণ অনুসন্ধিৎসাই আমাকে এই উদ্ধৃতাংশ সংকলন কার্যে ব্রতী করেছে।

এই বিষয়ানুসন্ধান প্রকল্পে কিছু প্রযুক্তিগত (অর্থাৎ মুদ্রণ যন্ত্রের ব্যাপকতর উপস্থিতি ও উনবিংশ শতকের ঔপনিবেশিক রাজধানীতে তার বৈপ্লবিক প্রভাব) ও যুগাদর্শগত (আধুনিক মর্যাদাসম্পন্ন ঐহিক, মানবিক বোধ ও গরিমামণ্ডিত ব্যক্তিকেন্দ্রিক চেতনা) মীমাংসা আছে যা দেশীয় সংস্কৃতির অসংরক্ষিত, সৃষ্টিচর্চার অকাতর, অবাধ বিচরণ কাল ও তার ঐশ্বর্য্যমণ্ডিত মূল্যবোধ সম্পর্কে সচেতন সংরক্ষণশীল যুগের মধ্যেকার যুক্তিশূন্য কালক্ষেপকে পরিপূর্ণ করে। এই সব সমাধান ব্যতিরেকে আমি কিছু বিশেষ মীমাংসার দিকে পাঠকবর্গের দৃষ্টি আকর্ষণ করব। দেশীয় সংগ্রহ/সংকলন সর্বার্থে ব্যক্তিবিশেষের অন্তরঙ্গ খেয়ালখুশির মোহে বা তার নির্বিশেষ, নির্বিকল্প উদ্দেশ্যে প্রণীত হয়নি। উনবিংশ শতকের ইংরাজ শাসনতান্ত্রিক প্রয়োজনীয়তা 'নবজাগরণশীল' বঙ্গবাসীর বৌদ্ধিক-সাংস্কৃতিক আন্দোলন তথা সাংস্কৃতিক জাতীয়তাবাদী চেতনার সাথে এই ভাবনার যোগ ছিল প্রত্যক্ষ। জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের সাংস্কৃতিক চেতনার প্রথম উচ্চারণের সাথে সম্পৃক্ত এই কর্মপ্রয়াস কোন 'ধর্মনিরপেক্ষ' প্রক্রিয়া নয় এ কথা সর্বোপরি ও শিরোধার্য। লোকসঙ্গীত না হোক, ব্যাপকতর লোকচর্চার আধুনিক ভারতবর্ষের অগ্রণী ব্যক্তিত্ব Rev. James Long-এর প্রবাদ-প্রবচন

সংগ্রহণ ও পর্যবেক্ষণ এর সূক্ষ্ম ও স্থূল উপযোগিতা সম্পর্কিত বক্তব্য এখানে স্মরণীয়।

"Some will say cui bono? What have proverbs to do with the lucubrations of learned societies? They relate only to the common people, the villagers, the ignavumapecus, they contain much that is frivolous, and superstitious, and absurd the dreamy notions of the ignorant! Very ture. Admitting this – but they are Paroimiai, wards of the way-side, like foundlings, no one knows the date of their birth. They relate however to the masses, to those whose views and opinions in these days of extended suffrage are cropping up, and gradually controlling the upper strata of society. As Lord Shaftesbury said, indefence of mass education we must educate our masters and we must therefore know their views and opinions. We do, I remember, in the height of the Indian Mutiny, Loard Canning sending for me at Calcutta to consult on the best method of getting at native opinion a very vital one for maintaining good rule in India. His Lordship remarked to me "We have certain Chiefs on our side but how are we to know regarding what the people feel?" I pointed out the clues the Native Press gave on this difficult subject, and the result-was, the government took action and instituted the important department of Reporters of the Native Vernacular Press of India. This department diving down in to the undercurrents of native opinion has been very useful to Government like that of India, a small body of on foreigners located among an oriental race, whose stand point is so very different from the European ... Proverbs which are probably coeval with the discovery of writing, surviving the overthrow of empires and the desolation brought by conquerors; they leave their ripples on the sand of time; they are like wild flowers, which outlive ruin and mark the flora of the district. When we consider that many of the Indian proverbs are 1000 years old, and when we look at the difficulty of tracing the past in India, an auxiliary like proverbs ought not to be despised; from the strong impression they have left on the memory in their poetic form, they survive where history perishes. The Eastern people, especially the Hindus, are anti-historic. We have therefore few historical documents, and have

to explore the dim recesses of the past by the dim lights of ruin, coins, inscriptions, which perish by time. What an auxiliary, then, are proverbs, which give the history, not merely of kings and conquerors, but of the people, in their inner most thoughts in the domestic hearths ..... The Indian prouerbs show how deeply the village and patriarchal system has engrafted Into the Indian mind in contrast to the feudal one introduced by the Mohammedans and the English."

James Long

Oriental Proverbs

In Their Relations to Folklore, History, Sociology with Suggestions for their colletions, 1875

অপরদিকে ঐশ্বর্য বিনষ্ট, গরিমাহৃত যে জন-জাতি-দেশ-শ্রেণীর গৌরবান্বিত অধ্যায়ে, তার রত্নসম স্মরণোজ্জ্বল অতীত অক্ষর সকলকে মুদ্রণযন্ত্র অক্ষয় করে তার সংজ্ঞা দেশ-কাল-পাত্র বিশেষে পরিবর্তনশীল। পরিবর্তনশীল সংগ্রহকৃত সংগীত সকলের সংজ্ঞা, পরিবর্তনশীল তার সঙ্গে তা কর্ত্তনকারী জনজাতি সমষ্টির আন্তঃসম্পর্ক, এই দুইয়ের যুগপৎ ও গবেষকের সঙ্গে তার সম্পর্ক, তার ঐতিহাসিক ভিত্তিভূমির আধারে স্বততঃ পরিবর্তনশীল। উদাহরণস্বরূপ দ্রষ্টব্য যে ঈশরচন্দ্র গুপ্ত নন্দিত সাধক রামপ্রসাদের 'সুধাধারবদন বিনির্গত সঙ্গীত সুধা' প্রত্যক্ষকারী 'সত্যকালের' সাধুবাদপ্রাপ্য পন্ডিতমণ্য সাধুসমাজের সাথে হেমাঙ্গ বিশ্বাস বর্ণিত লোকসংগীত জন্মদাত্রী ''শ্রেণী সমাজের দারিদ্র্যগর্ভ'' বা সমকালীন গবেষক সুধীর চক্রবর্তী উত্থাপিত ''গ্রাম সমাজ সংহতি'' দেহতত্ত্ব গানের রূপক-প্রতীক ভেদে সক্ষম, আপন জীবনযাপন দিয়ে গানের সার অনায়াসোপলব্ধি প্রাপ্ত নাগরিক সুশিক্ষিত ভাববাদী সমাজের প্রান্তে অবস্থিত 'জৈবিক সমাজ' বা 'কম্যুনিটি', এই সকল চর্চা তথা প্রয়াসের কার্য পরিমাণগত বা উদ্দীপন ভাবগত সাদৃশ্য থাকলেও এ সকল সংগ্রহণ চেতনা কার্যকারণগত সমীকরণে ভিন্ন, আদর্শগত সাযুজ্যরহিত। এই অধ্যায়-অন্তর এর বিশ্লেষণে (পূর্বোক্ত একক ব্যক্তি-কেন্দ্রিক আধুনিক) বিমূর্ত দর্শন তত্ত্বের নিরাবয়ব সহায়তা গ্রহণ অনেকাংশেই অকৃতকারী, কারণ তা প্রাক্-আধুনিক তথা আধুনিক মননের গোত্রিক অন্তর নির্ধারণে সক্ষম হলেও এই বিশেষ বিষয়ে আধুনিক ইতিহাসের গহ্বর মধ্যেই ভিন্ন ভিন্ন কালীক পর্যায়ে যে ভিন্ন ভিন্ন ভাবনা-ভাবুক-ভাব-বৈচিত্র্য বর্তমান তার ব্যবহারিক, বস্তুগত বা সময়োপচিত কারণ অনুসন্ধানে অপারগ।

ঔপনিবেশিক ও জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের ধারাপথের বিভিন্ন পর্যায়ে, স্বাধীনতা-উত্তর, দেশভাগ-উত্তর, উত্তর-উপনিবেশ, উত্তর-আধুনিক নবরাজনীতি, নবসাংস্কৃতিক রাজনীতি (বিশেষতর)-জাত নব নব সন্দর্ভের, বিতর্কের আকরে এই গবেষণার ঐতিহাসিক অবস্থিতি নির্ণয় করাই আমার উদ্দেশ্য, সংকলন সম্পাদনায় এই বিশিষ্টার্থ উদ্দিষ্ট লক্ষ্যই আমাকে পরিচালিত করেছে। এই প্রকার গবেষণার সমকালীন গুরুত্ব আরোপ করে সদ্যপ্রয়াত প্রখ্যাত সংগীত ইতিহাসবিদ্ Gerry Farrell বলেছেন :

"In recent decades ethnomusicologists have shown an increasing interest in historical data evident in the publication of several major collections of essays that address the historical dimension of ethnomusicology. This interest in history is driven in part by the apparently ongoing need for ethnomusicologists to construct a longer and more coherent history of their own discipline or even, still to define where exactly they stand in the fields of ethnomusicology and anthropology, but it is also part of a wider movement of ideas concerned with post colonial cultural critique and discussions of western views of the other in music and other cultural frames ..."

Gerry Farrel; Neil Sorrell

(Colonialism, Philology and Musical ethnography in the Nineteenth Century India : The Case of S.W. Fallon.
MUSIC & LETTERS, 2002

এই (উদ্ধৃতি-অংশ অভিযোজনে দর্শিত) ইতিহাস নির্মাণ প্রবর্তনায় আমি উপস্থিত সংগ্রাহকদের ব্যাপক সংখ্যাগুণকে বিনয়পূর্বক গৌণতা প্রদর্শনে, তাঁদের ভাবনাকল্পের গুণগত বৈচিত্র্যকেই প্রাধান্য প্রদান করেছি। যে সকল সংগ্রহ তথা গবেষণায় যুগাদর্শ প্রতিফলিত তার স্থানই সংরক্ষিত করেছি। ব্যাপকতর প্রেক্ষিতে বিচরণকারী সংগীত সংগ্রাহক গবেষকদের সংস্থাপন আমার লক্ষ্য, যুগাদর্শের নিয়ামকে এই লক্ষ্যপথ চারণ, এই গবেষণার ঐতিহাসিক ক্রম-বিবর্তন, নির্ণয়নই আমার প্রচেষ্টিত নিবেদন,সংগ্রহণ, সংকলন ও সংরক্ষণের মানস 'আলোকপ্রাপ্ত' চেতনায় উৎপন্ন, আলোকপ্রাপ্তির স্বতোচ্ছ্বাসে উৎসারিত। চর্চিত শতকে বিভিন্ন আমদানীকৃত নবোপলব্ধ জ্ঞান-বিজ্ঞানের বীক্ষণে দেশ তথা দেশীয়/লোক সমাজকে পর্যবেক্ষণ করার এক অন্যতম উপাদান। দেশজ সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন

হয়ে যাওয়া সম্পর্কশূন্য 'আলোকপ্রাপ্ত' ভদ্রশ্রেণীর শিকড়ের সাথে সংযোগ স্থাপন কল্পে এক অনন্য প্রচেষ্টা। এই প্রচেষ্টা ব্যাপৃত অনুশীলনে অন্তরের ও বাইরের দুই তাড়নাই সমভাবে বর্তমান। এই আকর্ষণের যে বহিরাগত দিকটি বর্তমান, তার অন্তরতর নিভৃত ক্ষেত্র ব্যতিরেকে, তারই পরিবর্তনশীল আধারে গবেষণার যে প্রেক্ষিত রচিত হয় আমার উদ্ধৃতাংশ সংকলন তারই সব রূপটি উদ্‌ঘাটিত করতে সংকল্পবদ্ধ। অন্তরের আকর্ষণ ও বাইরের তাড়নার সমানুপাত সম্পর্কই ঐতিহাসিক বিচার-বিশ্লেষণে কার্যকারী। অন্তরের আকর্ষণ ও তার অন্তরতর মনস্তত্ত্ব, এ পরিসরে সচেতনভাবেই উপেক্ষিত। বিচ্ছিন্ন জীবন, জগৎ এবং শিক্ষিত পরিশীলিত আলাপচারিতার নিদর্শনবাহিত এই সকল গবেষণায়, গবেষিত সমাজের সাথে সামাজিক, সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক তথা বৌদ্ধিক সম্পর্কচ্যুতি এবং বিভিন্ন কারণে তার পূর্ণসংযোগস্থাপন প্রাথমিক ও নিঃসন্দেহে (আধুনিকতাজাত) অভিনব এক উৎপাত্তরূপে বিরাজমান। এই পূর্ণসংযোগ চুক্তির শর্তাবলি বহুলাংশেই শিক্ষিত গবেষকগণকৃত তাঁদের মানসলোক উপপাদিত। এই সিদ্ধান্তে, যে ব্যাপক রাজনৈতিক পরিসরে তার বিশেষ কর্মপ্রয়াস, বিস্তৃত বৌদ্ধিক আন্দোলনের যে অধ্যায়ে তার ঐতিহাসিক স্থিতি (যা বহুলাংশেই তার গবেষিত সমাজের নির্ধারিত, নির্ধারণ ক্ষমতার বাইরে বিধৃত) তার যোগাযোগ প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষরূপে তার অন্তরের আকর্ষণকে প্রবর্তিত করে। এই চর্চার সাথে নাগরিক সমাজ ও তার জীবন-জগৎ নির্ধারক দণ্ডমাত্রার যোগ তার গবেষিত লোকসমাজের থেকে অনেকাংশেই গুরুত্বপূর্ণ। অন্তত আমার বিষয়াবতারণায় গবেষকদের এই ভূমিকাকেই গুরুত্ব আরোপ করতে প্রবৃত্ত।

এই গুরুত্ব আরোপণে আমি মূলত দুটি কারণ উল্লেখ করে আমার পেশকারী সমাপ্ত করব। প্রথমত, দেশীয় সমাজ বা লোক সমাজ ও নগরকৃত সংগ্রহ সংরক্ষণ কার্য সম্বন্ধে তাদের অজ্ঞতা। উদাহরণস্বরূপ ক্ষিতিমোহন সেন মহাশয়ের 'বাংলার বাউল'-এ (লীলা বক্তৃতা, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৪৯) উদ্ধৃত একটি ঘটনা স্মরণীয় :

"বাউলদের কাছে কোন প্রশ্ন করিলে তাহারা কথায় বড় একটা উত্তর দেন না উত্তর দেন গানে ...

... এইসব বহু গানে ভণিতা নাই। অনেক গানে গানের রচয়িতার নামও জানা নাই, এ কথা আমি এক বৃদ্ধ বাউলকে জিজ্ঞাসা করিলাম "এরূপভাবে রচয়িতাদের কথা ভুলিয়া যাওয়া কি ভাল?"...

তিনি তখন কিছু বললেন না, একটু পরে খাল ও নদীর দিকে দেখাইলেন। তখন ভাঁটা খালে জল খুব কম, কাদায় সব নৌকা ঠেকিয়া আছে। দুই একখানা ঠেক নাও ঠেলিয়া ঠেলিয়া নেওয়া হইতেছে, অথচ তখন পদ্মার বুক দিয়া ভরা জলে ভরা পালে নৌকা চলিয়াছে।

আমাকে দেখাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "এই যে নদী নাও ভরা পাল চলিয়াছে ইহাদের কি পথ-চিহ্ন কিছু আছে? আর এই খালের ঠেকা - নাওর পথই কাদায় কাদায় আঁকা রহিল। ইহার কোনটি সহজ ও স্বাভাবিক? আমরা এই কৃত্রিম পথ চিহ্ন রাখিয়া যাওয়াকে বড় মনে করি না" ভাবিয়া দেখিলাম, আমাদের ইতিহাসই বা কি? মানব সমাজ রচয়িতাদের আমরা জানি না। জানি বড় বড় সংহারকদের পরিচয়, আমাদের শাস্ত্র ও জ্ঞান সবই কৃত্রিম, সহজ সত্য তাহাতে ধরা পড়িবে কেন?..." ক্ষিতিমোহন সেন, 'বাংলার বাউল'

এখানে অবশ্য খেয়াল রাখা কর্তব্য যে ক্ষিতিমোহন সেন মহাশয় এখানে (হারামণি সংকলক) মৌলবী মুহম্মদ মনসুরউদ্দীন-এর অভিযোগের উত্তরদানের উপক্রমে এই ঘটনা উল্লেখ করেছেন। বাউল গান সংগ্রহে তার প্রচারবিমুখ মনোভাবকে 'অতিশয় কৃপণ' বিশেষণে বিশেষায়িত (মুহম্মদ মনসুউদ্দীন এর)-করণের বিরুদ্ধে তাঁর যৌক্তিক কাঠামো নির্মাণ করেছিলেন। এ বিষয়ে তাঁর সংগ্রহকার্যকে তাঁর ব্যক্তিগত আধ্যাত্মিক অভাব ও ক্ষুধার উপশমরূপে চিহ্নিত করে বলেছেন "আমি তো সাহিত্যিক হিসাবে এই বাউল সংগ্রহে প্রবৃত্ত হই নাই ..."। তাঁর সংগ্রহণ ভাবনাকে প্রকৃত বাউল-সাধক-মহাজনদের উত্তরাধিকার সমরূপে বিবেচনা করেছেন এবং তাঁর স্ব-অবস্থান স্বকীয়তাকে "গবেষণা করণেওয়ালা ডক্টরেট্ প্রার্থী বিদ্বজ্জনের" থেকে পৃথক করেছেন যাদের অত্যাচারে বিব্রত হয়ে কেন্দুলীর নিত্যানন্দ দাস একদিন তাঁকে বলেছিলেন "বাবা বৎসরান্তে এখানে আসিতাম। কিন্তু তোমাদের পিস্তলের মত পেন্সিল ওঁচানো দেখিয়া স্থানটা ছাড়িতে হইল"। এ মত পীড়নে পীড়িত বাউলদের ও তার নিজস্ব সংগ্রহ প্রচারকার্যের অবস্থানগত সাজুয্য দর্শাতে তিনি এক বাউলের উদ্ধৃতিই দৃষ্টান্তস্বরূপ উল্লেখ করেছেন "বাবা ইহা তো সাহিত্য নয়। ইহা আমাদের অন্তরঙ্গ প্রাণবস্তু, আপন আত্মজা, যদি কেহ আমার কন্যাকে এই বলিয়া প্রার্থনা করেন যে তাহাকে লইয়া আমি গৃহী হইব, তবে সে ক্ষেত্রে আমার দেওয়াই উচিত, সেই দেওয়াতে আমি ধন্য, তিনি ধন্য, আমার আত্মজাও ধন্য, কিন্তু কোন লোক শুধু রসাস্বাদন — সুখের জন্য যদি আমার আত্মজাকে চাখিয়া দেখিতে চাহেন তবে প্রাথয়িতাও অধন্য, আমিও অধন্য, আত্মজাও অধন্য। এই

সব বাণী সাহিত্য রসের আস্বাদনের জন্য নহে। ইহা সাধনার জন্য হয়তো ইহাতে সাহিত্য রসও আছে। কিন্তু তাহা তো মুখ্য লক্ষ নহে। তাই ইহা আমরা প্রচার করিব না, তবে সাধনার্থী জন সাধনার জন্য চাহিলে কখনো প্রত্যাখান করিব না। কিন্তু দেখিয়া লইব তাহার প্রার্থনা সাচ্চা কিনা ..." ক্ষিতিমোহন সেন, 'বাংলার বাউল'

এই উদ্ধৃতি সমাপনে নিজের অবস্থান ব্যক্ত করেছেন এই বলে, "এই সব কারণে বহু স্থানে সংগ্রহ করিলেও আমি বাণীগুলি প্রকাশের অনুমতি পাই নাই ..."

অতএব এই পাত্র বিশেষের ভূমিকা, সংগ্রহ সংকলন ইতিহাসে তার অবস্থান একান্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। ক্ষিতিমোহন সেন মহাশয় এর 'সংক্ষেপে কাজ সারতে উদ্যত' নাগরিক শিক্ষিত বিদ্বৎসমাজ এর প্রতি সমালোচনা 'মুহম্মদ মনসুরউদ্দিন সাহেবের হারামণির সাথে তাঁর বক্তৃতার অন্তর্বয়ান সম্বন্ধে, তার অভিযোগ খণ্ডন ইত্যাদি সকল যে চালিকাশক্তিগুলি তার গবেষণার (এই বিশেষ) যুক্তি কাঠামো তৈয়ারে সহায়ক আমার উপপাদ্য বিষয় ব্যাপকার্থে তারই সাথে সম্পৃক্ত। বহু ঘটনার মধ্যে কোন কোন বিশেষ ঘটনার উল্লেখ, কোন কোন বিশেষ সাক্ষাৎকারের অবতারণা, একান্তই গবেষকের ইচ্ছা প্রসূত সম্পাদনার ফলাফল যা তার ভাবনার অথবা যে সকল ভাবনা তার বিশ্বাসকে স্থাপন করেছে, তাকে আশ্রয় প্রদান করেছে তার সাক্ষর বহনকারী আত্মার চিন্তা এ সকল নাগরিক গবেষণা উৎস সন্ধানে। এ সবের সঙ্গে 'লোক সমাজের' যোগ থাকলেও তার প্রত্যক্ষ সম্বন্ধ যোগ তার ভিন্ন (নাগরিক) প্রেক্ষিতে সন্ধান করেছি। (দেশীয়) গান সংরক্ষণ চেতনার সাথে নাগরিক জীবনের রাজনৈতিক বাস্তবতা ও তার বৌদ্ধিক তথা সমাজ জীবনের জটিলতর 'সরলরেখা' অন্বেষণে নিয়োজিত হয়েছি।

ক্ষিতিমোহন সেন এর ব্যক্তিগত আধ্যাত্মিক অবস্থানকে দৃঢ়তর করতে যে 'পিস্তলের মত পেন্সিল ওচাঁনো', 'সংক্ষেপে কাজ সারতে' উদ্যত 'ডক্টরেট্ প্রার্থী' গবেষকদের ভিড় দেখানো হয়েছে বিব্রত বাউলের বক্তব্যের মাধ্যমে তা কিন্তু 'লোক মানসে' (অন্ততপক্ষে তৎকালীন) লোক চেতনায় তার নাগরিক উপায়কৃত সংরক্ষণ প্রক্রিয়া সম্বন্ধে শুধুমাত্র নিস্পৃহতাই নয় অনেকাংশে বিরুদ্ধাচরণও ব্যক্ত করে। অপরদিকে এ বক্তব্যও স্থিরকৃত করে যে লোক সংস্কৃতির বা দেশীয় সমাজের সংজ্ঞা, বর্ণনা, তার দর্শন, চেতনা তার প্রচারযোগ্য উপকরণসমূহ সবই 'আলোকপ্রাপ্ত' পরিশীলিত অনুশীলন দ্বারা নির্বাচিত ও নিয়ন্ত্রিত। তার সংকলন ও প্রচারের মাধ্যমে বহুলাংশে এই 'সমাজ' ও তার 'সভ্যতার' পরিচয় 'সভ্য জগৎ দৃষ্টিপটে নির্মিত হতে থাকে, কালক্রমে নির্মিত

পট পরিবর্তিত হতে থাকে। গবেষক এর জ্ঞাত, অজ্ঞাতসার তার পারিপার্শ্বিক নাগরিক সমাজ জীবন তার রাজনৈতিক তথা (শিক্ষিত) বৃহত্তর যাপনের মতাদর্শ, তার জীবনোপযোগী সত্যতা, তার সীমাবদ্ধ চেতনা দূরে অদূরে অবস্থিত সমাজ, সংস্কৃতি, সভ্যতার মূল্য নির্মাণ ও নির্ধারণে ক্রিয়াশীল ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়।

দ্বিতীয়ত আমার অনুসন্ধানকল্পের আরেকটি সূত্রসার হিসেবে উল্লেখ্য যে সচরাচর সংগ্রহকার্যের উদ্যোগ ভার নাগরিক গবেষক এর হাতে ন্যস্ত থাকে, কিন্তু পারতপক্ষে তার অন্যথা হলে দেশজ সহায়ক এর সাথে তার সম্পর্কের অবদমনমূলক না হলেও প্রতিনিধিত্বমূলক ক্ষেত্র অনুশীলন যোগ্য (অর্থাৎ "রাজ ভাষায়" যাকে the relation of control and representation বলে অভিহিত করা হয়ে থাকে)। দীনেশ চন্দ্র সেন মহাশয় সংকলিত 'মৈমন সিংহ গীতিকা (১৯২৩)'র সংগ্রাহক চন্দ্রকুমার দে কে প্রেরিত নিয়ন্ত্রণ সূচক নির্দেশাবলী, সংগ্রহসকার্যে ও তার নির্বাচনে নাগরিক গবেষক ও দেশীয় সংগ্রাহক এর মধ্যে রক্ষিত অন্তরকে সুস্পষ্ট করে। ব্যাপকার্থে 'মৈমনসিংহ গীতিকা' তার কোন সাংস্কৃতিক উৎকর্ষের বিচারে সুসভ্য জগৎ এর কাছে পরিচিত হবে তার গুণগত মাত্রা বিশেষ জ্ঞাপন করে, তার শর্তাবলীর পরিচয় বহন করে। দীনেশ চন্দ্র সেন মহাশয় এর নিজস্ব ভাষায়ই তার অবস্থানবিধি জেনে নেওয়া যাক —

"প্রথমত চন্দ্রকুমার মৈমন সিংহ জেলার কবিগণের লিখিত বিশুদ্ধ কাব্যগুলির প্রতি বেশী মনোযোগী হইয়াছিলেন, মুক্তরামের 'দুর্গা পুরাণ' রামকান্তের 'মনসা ভাসান', 'উমার বিরহ', 'শিব দুর্গার কলহ', 'দুব্বাসার পারণ', 'দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণ' এবং 'নরমেধ যজ্ঞ' প্রভৃতি বিষয়ক কবি সংগীতগুলি পাছে নষ্ট হইয়া যায়, এই আশঙ্কা করিয়া তিনি আমাকে পুনঃ পুনঃ পত্র লিখিয়াছে। এইরূপ পুস্তকের উপরই তাহার বেশী ঝোঁক ছিল। যদিও পল্লীর ছড়াগুলিকে ইনি অন্তরের ভালবাসা দিয়াছিলেন, তথাপি সংস্কৃত শব্দবহুল কাব্যগুলির পার্শ্বে সেগুলি সময়ে সময়ে তাঁহার চক্ষে ম্লান বোধ হইত, এ জন্যে সেই পাড়াগেঁয়ে জিনিসগুলোকে বুকে তুলিয়া আদর করিতে তিনি মাঝে মাঝে ভয় পাইতেন, পাছে সাহিত্যের আসরে সভ্যগণ তাঁহাকে জাতিচ্যুত করিয়া বসেন, বানিয়াচঙ্গ, জঙ্গলকারী, রোয়াইল বাড়ী প্রভৃতি নানা স্থানের ছড়াগুলির সংগ্রহ সম্বন্ধে তিনি একবার আমাকে লিখিয়াছিলেন এগুলি এত প্রাচীন ও ইহাদের ভাষা এমন পাড়াগেঁর যে শুনিলে হাসি পায় ... পয়ারের শেষভাগে প্রায় মিল নাই, এগুলি সংগ্রহ করিব কি? অন্য একবার গ্রাম্য ভাষার কিছু নমুনা দিয়া

লিখিয়াছিলেন, "এই ভাষার কবির কি না আমাকে সত্বর লিখিয়া জানাইবেন ..." কিন্তু তিনি আমাকে পুনঃ পুনঃ মৈমনসিংহে প্রচলিত রাধাকৃষ্ণ এবং উমা-মেনকা সম্বন্ধীয় কবিগণের প্রাচুর্যের ব্যাখ্যা করা সত্ত্বেও তাহার এই উৎসাহ আমি খুব সতেজ হইতে দেই নাই। সে যে 'অবজ্ঞাত' অশিষ্ট ভাষায় অনাড়ম্বর সরলতায় পল্লী প্রজা লক্ষ্মীর প্রাণটি ধরা দিয়েছে, সেই ছড়াগুলির উপরেই আমার লোলুপ দৃষ্টি ছিল। যেহেতু কৃত্রিম ভাষার সোনার পিঞ্জরে তোতা পাখীর স্থান হইতে পারে, কিন্তু বৃষ্টি-বাদলে আকাশে মুক্ত আঙিনায়ই কোকিলের পঞ্চম স্বর পৃথিবী ছাপাইয়া উঠে ..."

তাঁর প্রদত্ত লোলুপ দৃষ্টির বিশিষ্টতর ব্যাখ্যার্থ, সমর্থনে বলেছেন —

"পৌরাণিক উপাখ্যান বিষয়ক কাব্যকথা তো প্রাচীন বঙ্গ সাহিত্যে ঝুড়ি ঝুড়ি পাওয়া যাইতেছে বিজয়গুপ্ত, নারায়ণ দেব, বংশী দাস ও কেতকা দাসের 'মনসামঙ্গল' এর পরে রামকান্তের একখানি 'পদ্মপুরাণ' না পাওয়া গেলেও বঙ্গসাহিত্যের বিশেষ শ্রীহীন হইবে না, ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দরের পরে কবি কঙ্কন 'বিদ্যাসুন্দর' না পাওয়া গেলেই বা বিশেষ ক্ষতি কি? ভাষা ও সাহিত্যে ইহাদের অবশ্যই কিছু মূল্য আছে কিন্তু 'মহুয়া', 'মলুয়া' বঙ্গের অন্যত্র কোথায় পাইব? 'দেওয়ানা মদিনা', 'ফিরোজ খাঁ' প্রভৃতির পালা যে বঙ্গ সাহিত্যের একটা নূতন দিকের উপর আলোকপাত করিতেছে এই অপূর্ব জিনিস বঙ্গ সাহিত্যে দুর্লভ, বঙ্গ সাহিত্য, পৌরাণিক উপাখ্যানগুলিতে সংস্কৃত শব্দের সোনালী চুমকি দেওয়া বেনারসী চেলী পরিয়া ঝলমল করিতেছে কিন্তু পাড়াগাঁয়ের এই সকল সরল কথা যাহাতে সংস্কৃতের একটু ধার করা শোভা নাই যাহা নিজ স্বাভাবিক রূপে অপূর্ব সুন্দর তাহার নমুনা আমরা কোথায় পাইতাম? ..." দীনেশচন্দ্র সেন, 'মৈমনসিংহ গীতিকা', ১৯২৩

সহজেই অনুমেয় যে, সভ্যজগতে 'এবাংলার' এহেন 'পাড়াগাঁয়ের' রূপ দীনেশচন্দ্র মহাশয়-এর নির্বাচন, নির্ধারণ ও প্রতিনিধিত্বের রূপকল্পেই উপস্থিত হবে, 'পাড়াগাঁয়ের' লোক চন্দ্রকুমার দে মহাশয়-এর নয়। সভ্যজগৎ কখনোই (দীনেশচন্দ্র মহাশয় বর্ণিত) চন্দ্রকুমারের অন্তরের ভালবাসার 'বাহ্যত-দৃশ্যত' উপস্থিত ব্যাখ্যা, তার নির্বাচনের কার্যকারণ, তার মুখ থেকে শুনতে পাবেন না।

ক্ষিতিমোহন সেন ও দীনেশচন্দ্র সেন, এই দুজনের প্রদর্শিত দৃষ্টান্ত থেকে (পূর্বোক্ত) দুই সিদ্ধান্তে আমরা উপনীত হতে পারি যে লোকচেতনা তার সংস্কৃতির 'ভরা পাল, ভরা জলের' সহজ (নদী) পথে কোনপ্রকার চিহ্ন রাখতে

উৎকণ্ঠিত নয় অর্থাৎ নগরকেন্দ্রিক সংরক্ষকদের ভূমিকায় নিস্পৃহ। দ্বিতীয়ত, 'পাড়াগেঁয়ে পল্লী সমাজ' প্রতিফলিত হয়, সভ্য-শিক্ষিত জগৎ-এ পরিচিত হয়, তার নিজস্ব গর্ভে লালিত সন্তান দ্বারা নয় বরং তার থেকে দূরে অবস্থিত সুশিক্ষিত গবেষণাকৃত নগরসন্দর্ভে।

সমসাময়িক গবেষক সুধীর চক্রবর্তী মহাশয় তাঁর সম্পাদিত 'বাংলার বাউল ফকির' (১৯৯৯) গ্রন্থে এক জায়গায় উল্লেখ করেছেন, ''বাউলদের নিয়ে গত এক শতক বাঙালির ভাবালুতার শেষ নাই ...'' এই সকল ভাবালুতার অনুসন্ধানে এই জগতের সাধু-গুরু-মহাজন মারফৎ প্রেরিত জবানবন্দি প্রদর্শনই আমার কাম্য। তার অন্তরে নিহিত দেশ-কাল-পাত্র ভেদ, তাদের বক্তব্য মারফৎ নির্ধারণেই 'লোকচর্চা' ইতিহাসের যে 'ঐতিহাসিক' জঙ্গমতা তার শরিক হওয়াই আমার বিধেয়। 'নিরপেক্ষ' ঐতিহাসিক প্রেক্ষিত অপেক্ষা কোন নির্মোহ সত্যের (উদাহরণস্বরূপ 'লোক সমাজের' স্বরূপ সত্যতা, যেমন সুধীর চক্রবর্তী মহাশয় দর্শিয়েছেন ''সরেজমিন গবেষণায় গ্রামে গ্রামে ঘুরলে দেখা যাবে মৌলবাদের শাসানি এবং ফকির ও বাউল নিগ্রহ, গড় বাউলের চরম দারিদ্র্য, অনুগ্রহ ও সরকারি অনুদানের জন্য বাউলের নির্লজ্জ লোভ, গোপ্য সাধনার নামে কোথাও কোথাও মাত্রাহীন যৌনতা ...'') আলোকবর্ত্তিকায় এই সকল সংকলনের অন্তর্নিহিত নিরাবয়ব চেতনার সত্যাসত্য বিচার আমার কর্তব্য নয়। সেই সকল চিন্তা থাক তাদের যারা লোকসঙ্গীতের ইতিহাস অনুসন্ধানে ব্যাপৃত। এই গবেষণার পর্যবেক্ষকতার দ্বারা পর্যবেক্ষিত ক্ষেত্র, ও তার উপকরণসমূহের মূল্যায়ণ পরিবর্তনশীল মূলত গবেষক ও (তার জ্ঞানচর্চার প্রেক্ষাপট) তার পর্যবেক্ষণক্ষেত্র অনুযায়ী যা স্থিতিশীল নয়, ঐতিহাসিক কালক্ষেপে স্বততঃ পরিবর্তনশীল। কালচক্রের ঘূর্ণাবর্তে এ ক্ষেত্রে তাই নির্মোহের মোহভঙ্গই একমাত্র সত্যতা, ভাবালুতাই এক্ষণে শিরোধার্য।

উদ্ধৃতি সঙ্কলন

কালীকীর্ত্তন ব্যাবসায়ী গ্রাহক যে কয়েকজন দৃষ্ট হয় তাহাদের উচ্চারণনেভিজ্ঞতা ও সামান্যতো অজ্ঞতা প্রযুক্ত গীতকর্ত্তার অনভিপ্রেত রস ভাবার্থ ব্যতিক্রমজন্য-রসভঙ্গ হওয়াতে শ্রবণ কালে মনে সুখোদয় না হইয়া বরং ক্ষেদোদয় হয় এবং এই পরকীয় দোষে গ্রন্থকর্ত্তার দোষানুমান হওয়াতে তাঁহার এই মহাকীর্ত্তি সুধাকরের কলঙ্কোদয় সম্ভাবনা হইলেও হইতে পারে। অতএব পূর্বের নানা দোষ পরিহারার্থে এবং এই অপূর্ব গীতগ্রন্থের অবৈকল্যরূপে ও প্রাচুর্যরূপে বহুকাল স্থায়িত্বার্থ আমি আকরস্থান হইতে মূল পুস্তক আনয়ন পূর্ব্বক

সংশোধিত করিয়া কালীকীর্ত্তন পুস্তক মুদ্রিত করণে প্রবৃত্ত হইয়াছি ইহাতে সাধুসদাশয় মহাশয়েরা নয়নাস্তপাত করিলে তাঁহাদের মনে কালীভক্তি কল্পলতা অঙ্কুরবুদ্ধি ও পরগুণ গ্রাহিতা প্রকাশ হয় এবং গ্রন্থকর্ত্তার মহাকীর্ত্তি চিরস্থায়িত্ব হয় এবং আমার এ তাবৎ পরিশ্রমের সুফলসিদ্ধি হয়।

কালীকীর্ত্তন, ১৮৩৩

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত

এই প্রেমভক্তি পরিপুরিত পীযূষময় সাধুসঙ্গীত শ্রবণ করিয়া তৎকালে সকলেই সাধু সাধু শব্দ উচ্চারণ পূর্ব্বক মোহিত হইলেন। আহা! এই স্থলে তাঁহারদিগেই সাধু সাধু বলিয়াই সাধুবাদ প্রদান করিব যাঁহারা সাধু সাধক সেনের সুধাধার বদন বিনির্গত সঙ্গীত সুধা পান করত তৃপ্তচিত্ত হইয়াছিলেন। অপিচ কি পরিতাপ! আমরা এই সুখময় অদ্ভুত ভূতকালে ভূতরূপে উক্ত মহাভূতের অলৌকিক কার্য সকল সাক্ষাতে দর্শন করিতে পারি নাই। সেই কাল প্রকৃত সত্যকালের ন্যায় কাল ছিল; যদিও এই কাল সেই কাল বটে তথাচ এ কালের সহিত সে কালের তুলনা কোন মতেই হইতে পারে না, কারণ এ কাল কি কাল এবং কোন্‌কালে কোন কালের সঙ্গে এই কালের উপমা হইবে তাহারো নিশ্চয়ত করা দুঃসাধ্য হইতেছে। আমরা যে কালে মনুষ্যরূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছি সে কাল আমারদিগের পক্ষে কালস্বরূপ হইয়াছে। এই কাল রাঙ্গার পক্ষে পক্ষ হইয়া কালোর দেশের আলো নির্ব্বাণ করিয়াছে। সে স্বাধীনতা কোথা? সে সুখ কোথা? সে ধর্ম্ম কোথা? সে কর্ম্ম কোথা? সে বিদ্যা কোথা? সে চালনা কোথা? সে পাণ্ডিত্য কোথা? সে কবিত্ব কোথা? সে সমাদর কোথা? সে সম্মান কোথা? এবং সে উৎসাহ ও অনুরাগই বা কোথা? স্বাধীনতা সঙ্গে সঙ্গেই কাল সমস্ত উদরস্থ করিয়াছেন। আমরা অধুনা রঘুকুলতিলক ভগবান রামচন্দ্রের কথা উল্লেখ করিতে ইচ্ছা করি না। দ্বারকাধিপতি ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এবং হস্তিনাধিপতি পাণ্ডুকুল প্রদীপ মহারাজ যুধিষ্ঠিরের প্রসঙ্গ করিতে চাহি না। নবরত্ন সভার অধীশ্বর মহারাজ বিক্রমাদিত্যের নাম উচ্চারণ করিব না, কেবল নবদ্বীপাধিপতি মহরাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের সময়কেই স্মরণ করিতেছি। ঐ সময়ে যে যে ব্যাপার হইয়াছিল বর্তমান কালে তাহার শতাংশের একাংশ থাকিলেও কত সুখের ব্যাপার হইত। উক্ত মহারাজ নানা শাস্ত্রালঙ্কৃত পণ্ডিত ও সজ্জনের হৃদয়পদ্ম প্রকাশকারি রবি স্বরূপ কবিগণকে সাতিশয় সমাদর করিতেন, গৌরব পূর্ব্বক গুণের পরীক্ষা করিয়া উৎসাহ বর্দ্ধনার্থ সর্ব্বদাই পারিতোষিক ও বৃত্তি

প্রদান করিতেন। তৎসমকালে এই বঙ্গদেশে যে সকল ধর্নাঢ্য ভূম্যধিকারি মহাশয়েরা সজীব ছিলেন তাঁহারা ও তাঁহার দৃষ্টান্ত অনুসারে কর্তব্য কর্ম সাধন করিতেন, অর্থাৎ তাবতেই পণ্ডিত অনুসারে কবিদিগ্যে যথাসাধ্য সম্ভব মত সাহায্য করত সম্যক প্রকারেই অনুরাগের পুরিস্কৃত করিতেন। এই কালে সেই কালের চিহ্ন কিছুই নাই। এইক্ষণেও অনেক সুপণ্ডিত ও সুকবি হইতেছেন, কিন্তু কি আক্ষেপ! কেহই তাঁহারদিগ্যে আদর করেন না, উৎসাহ দেন না, গুণের পুরস্কার করা দূরে থাকুক, একবার আহ্বান করিয়া জিজ্ঞাসাও করেন না। অধ্যাপক পণ্ডিতেরা কোনরূপ পাণ্ডিত্য প্রকাশ করিলে এবং কোন কবি কবিত্ব দর্শাইলে যত্ন পূর্ব্বক তাহার মর্ম্ম গ্রহণ করা চূলায় পড়ুক, বরং বিপরীত ভাবে হাস্য পরিহাস করিয়া সেই সকল প্রকৃষ্ট পদার্থকে রসাতলে নিক্ষেপ করেন। সম্প্রতি দেশ-কাল-পাত্র সকলই সমান হইয়াছে, সুতরাং যথার্থরূপে গুণের সৌরভ ও গুণির গৌরব প্রকাশ হইতে পারে না। জগদীশ্বর যাহার দিগ্যে ধনী করিয়াছেন তাঁহারদিগের মধ্যে অত্যল্প মহাশয় ব্যতীত প্রায় তাবত্যেরই ধনী বলিয়া কেবল এক ধ্বনি মাত্র রহিয়াছে, ধ্বনির কার্য প্রায় কাহারো নাই শুদ্ধ ধনীর কর্মই দেখিতে পাই। শাস্ত্রালাপে একেবারে লোপ হইয়া গেল, অধিকাংশ মহাশয় শুদ্ধ অলকীমোহে কাল হরণ করিতেছেন। প্রাচীন বা আধুনিক সুকাব্য লইয়া আমোদ করা অভ্যাস নাই, যেহেতু তাহার বিন্দুমাত্র বুঝিতে পারেন না, মনে বড় উল্লাস হইলে একরাত্রি বন্ধুবান্ধবকে নিমন্ত্রণ করিয়া যাত্রা দিয়া বসিলেন যাত্রাওয়ালা "ফেলুয়া, ভুলুয়া" সং আনিয়া উপস্থিত করিল, তাহার বহুবিধ অঙ্গভঙ্গী ও রঙ্গভঙ্গ করিয়া গীত ধরিল।

... মনেতে করেছ বঁধু ফেলে পালাব, পায়ে শিকলি লাগাব,
আঁকা বাঁকা কোরে পানের খিলি বানাব, প্রাণনাথকে খাওয়াব,
আর তোমায় আমায় কর্ব্ব মজা নিজপতি ঘুম্ গেলে।

কি করা যায়? সকলি কালের ধর্ম্ম, সকলি কালের কর্ম্ম, এই কালের মর্ম্ম বুঝিয়া যিনি শর্ম্ম-গ্রাহী হইতে পারিলেন এই জগতে তিনিই ধন্য হইলেন। সম্প্রতি সর্ব্বত্রই শুদ্ধ ছলের বাজার ও খলের বাজার বসিয়াছে, কোন খানেই একখানা ফলের দোকান দেখিতে পাই না। যেখানে সেখানে দলের আঁটাআঁটি, বলের আঁটাআঁটি কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না। এই সমস্ত দেখিয়া শুনিয়া এবং হতাদর হইয়া পণ্ডিত ও গুণিলোকেরা আপনারাই অভিমানে মনে মনে ম্লান হইতেছেন। যে দেশের লোকেরা বস্ত্র পরিধান করে না সে দেশে রজকের অন্ন কখনই হইতে পারে না, গুণগ্রাহি না থাকিলে গুণের বিচার কে করে? যদি ভাগ্যধরেরা এ পক্ষে

কিঞ্চিৎ অনুরাগী ও মনোযোগী হয়েন তবে এ পরাধীন অবস্থাতেও দেশের এত দুরবস্থা হয় না; অনায়াসেই সর্ব্বতোভাবে সুখ সৌভাগ্যের আধিক্য হইতে পারে। কর্ত্তারা তাহা না করিয়া "মোসাহেব" নামধারী কতকগুণীন চমৎকার চিত্ত অবতারদিগ্যে আদর পূর্ব্বক পূজা করিয়া থাকেন, সেই মা লক্ষ্মীর বরমাত্র মহাপাত্র মহাশয়দিগের মহিমার কথা বর্ণনা করিতে হইলে লেখনীর মুখ আরষ্ট হইয়া যায়। তাঁহারা না পারেন ও না করেন এমন কর্ম্মই নাই। আহা! যখন আমরা কোন ধনীর সভায় গমন করিয়া তাঁহার সভাসদ ও পারিষদ সকলকে বিদ্যা, বুদ্ধি, সভ্যতাশীলতা, সৌজন্য প্রভৃতি সমুদয় গুণসম্পন্ন দেখিতে পাই তখন আমারদিগের অন্তঃকরণ আহ্লাদে স্ফীত হইতে থাকে আমরা কত সুখী হইয়া সৌভাগ্য স্বীকার করিতে থাকি, যদি প্রত্যেক স্থানেই এইরূপ দেখিতে পাই তবে আর সুখের পরিসীমা থাকে না, এক কালেই দুঃখের অবসান হইয়া যায়। কিন্তু আমারদিগের দুর্ভাগ্যক্রমে বঙ্গদেশে এরূপ সুখের স্থল অতি বিরল। দুই এক স্থানে এতদ্রূপ সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠান ব্যতীত প্রায় সর্ব্বত্রই কেবল সৎকার্য্যের সৎকার্য্যই দেখিতে পাই।

সংবাদ প্রভাকর, ১৮৫৩

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত

রামপ্রসাদ সেনের জীবন বৃত্তান্ত অতি সংক্ষেপে বর্ণনা করিলাম। তথাচ অদ্যতন পত্রের নিয়মিত স্থানে তাহা সম্পন্ন হইল না ... এই সঙ্কল্পিত কল্পে কৃতকার্য হইতে পারিলে একটা প্রধান কর্ম্মই করা হয়, অতএব সর্ব্বসাধরণনে বিনয় পূর্ব্বক নিবেদন করিতেছি, যদি কেহ এ বিষয়ে অসমদ্যদিগকে যথাযোগ্য সাহায্য করিতে সমর্থ হয়েন তবে যেন তাহাতে সম্ভাবিত কৃপাবিতরণে কৃপণতা না করেন। তাঁহারদিগের নিকট এতদ্রূপ আনুকূল্য প্রাপ্ত হইলে আমরা শ্রম সাকল্য সাফল্য জ্ঞানে যাবজ্জীবন মহোপকার স্বীকার পূর্ব্বক কৃতজ্ঞতা ঋণে বদ্ধ রহিব, ইহাতে শুদ্ধ আমরাই উপকৃত হইব, এমত নহে, দেশ শুদ্ধ সমস্ত লোকেই তাহার সমান অংশ প্রাপ্ত হইবেন, সুতরাং এই স্থলে অধিক লেখা বাহুল্য মাত্র এই দেশহিতকর কর্ত্তব্য কার্য্য সাধনে সাধ্য সত্ত্বে কেহ যেন আলস্য পরবশ না হয়েন, ইহাতে আমারদিগের উপকার করিতে ইচ্ছা না হয় আপনারা স্বতন্ত্ররূপে করুন, তাহাতে হানি কি।

সংবাদ প্রভাকর, ১৮৫৩

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত

'স্বর বোধ ইংরাজেরা আমারদিগকে হাজার "Lovers of Tom Tom" অর্থাৎ ঢাকবাদ্য প্রেমিক বলিয়া উপহাস করুন কিন্তু যথার্থ বিবেচনা করিয়া দেখিলে স্বরানুমেলকতা অনুভাবে আমারদিগের দেশীয় লোকেরা অতিশয় ক্ষমতাবান তথাপি ও যদ্যপি ইয়ংবেঙ্গল বাবুরা সাধ করিয়া বেসুরা ও বেতালা হইতে চাহেন, হউন, তাহাতে ক্ষতি কি? ...

... ভারতচন্দ্র রায়ের গাথায় শ্বাস প্রবহন এবং ভাবজালে অনল প্রভবন হইয়াছে কিনা তাহা রতিবিলাপ এবং বিদ্যাসুন্দরের পূর্ব্বরাগ অর্থাৎ প্রথম মিলনের পূর্ব্বাবস্থা পাঠ করিলেই প্রমাণীকৃত হইবেক, আমারদিগের ইয়ংবেঙ্গল বাবুরা যদি বিলাতীয় বিজাতীয় কুসংস্কার এবং দ্বেষ মৎসরতা পরিত্যাগ পূর্ব্বক উক্ত বর্ণনা সকল পাঠ করেন, তবে তত্তাবতে লার্ড বাইরনের ন্যায় প্রখর ভাবসমূহ দেখিতে পাইবেন। কবিকঙ্কনের ন্যায় ভারতচন্দ্র রায় যে সময়ে ছিলেন, সেই সময়ে প্রচলিত দেশাচার প্রভৃতি যথার্থরূপে বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন, তাঁহার কাব্য সকলের বয়ঃক্রম অদ্য একশত বৎসর পূর্ণ হয় নাই, তথাচ এই শতাব্দের মধ্যে অস্মদ্দেশের আচার ব্যবহার কিরূপ পরিবর্ত্তন হইয়াছে, তাহা মনে করিলে নয়নপথে অশ্রুধারার শেষ হয় না।

রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়,
"বাঙ্গালা কবিতা বিষয়ক প্রবন্ধ"
বীটন সোসাইটি, ১৮৫২

Two great objects have been kept in view throughout. First, to exhibit irrefragable evidence of the real feeling of the mass of people, and thus enable Europeans to see them as they are. Second, to draw public attention to a great body of excellent vernacular literature, in the hope that other persons, far better qualified for the task than myself, will follow the enquiry and publish critical editions and translations of the great ethical works of the Dravidian Augustan period. It is almost impossible now to obtain a printed copy of any early Tamil book that has not been systematically corrupted and mutilated, to meet the views of those whose livelihood depends on the rejection by the public of Dravidian literature and its acceptance of Puranic legends ... This is no unimportant matter looking to the necessity that the governing race should not be disqualified from performing its noble task by labouring under a complete mistakes as to that nationality, aspirations, feeling and errors

of the people its rules : seeing that the Dravidian peoples distinctly claim unity of race and origin with the yet more cultivated Sanscrit Nation that has settled among them. ... The contents of the following pages will give samples of almost every kind of songs that catch the public ear and dwell in the national heart. The only exception of which I am aware are the episodes of the great epics and the erotic chapters which I dare not translate. Neither belong to our subject, for both are purely Brahminic, entirely foreign to the Dravidian literature and mind .... There is a great mass of noble writing ready to hand in Tamil and Telegu folk literature, especially in the former. Total neglect has fallen upon it. Overborne by Brahminic legend, hated by Brahmanas it has not had a chance of attaining notice it so much deserves. The people cling to their songs still and in every school the Pupils learn the strain of Trovalluva, Auveiyar, Kapila, ... To raise these books in public estimation to exhibit the true products of the Dravidian mind, would be a task worthy of the ripest Scholar and the most enlightened government. 'It may not be considered a digression to protest against the 'Christian mutilation to which the Tamil classics are now liable, an offence not inferior in demerit to that Brahmanic mutilation which has been so frequently referred to in text... It has been said that there is no better way of knowing the real feelings and ideals of a people than that afforded by the songs that pass from lip to lip in their streets and markets. None know from whence they come. Verses are added to or subtracted from them as new ideas came in or old ones pass away. Thus they keep up to date, as it were, the expression of those inner feelings which never rise to the surface of a set literature but are in reality the very essence of popular belief. Their satire is often sharp and never fears to attack shames, however venerable that may be. Such satire in often the only means left to the illiterate and obscure of showing that the priest craft, the outer polish, the grosser abuses as well as the showier fabrics, which to outsiders seem to be the life of nation, are in no sense the life or even portion of the life of the millions who in reality forms the mass of the nation, but who are far too often utterly forgotten by those who judge a people by its upper ten thousand. It will be

seen, however, that while the philosophy of the schools is unknown to the crowd, the strong tendency of the popular mind is towards monotheism of a character not unlike that of Visishta Advaita School ... European mind, because, as such works went through the press, they were accompanied and much more than outnumbered, by other books on India – chiefly written by missionaries. The later dilated upon the enormities of vulgar Hinduism, its millions of deities, the obscenities, quarrels, defeats and victories of the gods ... clubbing these together under the shade of the old proverb "as are their gods so are the people" – these authors have ascribed utter abominations to the mass of the people, until it has become the general idea that all under the ranks of higher Brahmans is one of seething mass of impurity, polytheism and the grossest superstition ... More were they driven to abhor the religious system that stood in their way that is the puranic ritual ...

... They naturally looked to the priests and temples as representing Hinduism ... close observation for several years and the extended friendship with Hindus with which I have been honoured, have long shown that in all matters of daily life the popular Hinduism of the priests is not found among the lower castes. If such an illustration may be permitted it might be said that Modern Hindu life in Southern India much resembles that of Europe just before the reformation. ... The people of India are not accurately described from Brahman sources and that in thought and habit they are in a marked way different from the sacred caste ... No one can fail to be struck with the sadness that prevails .... It is inexpressibly saddening again and again to note such songs as these, and know that they represent the inmost feelings of the betterpart of a Great Nation ... It is not hard to find the cause of so much sorrow. To the great mass of the nation there is positively no way open towards religious peace, except in the hardest of all courses – abstract faith in an abstract deity. Virtue is its own reward it is true, but sin has its pleasures as well, and they are near. Who knows what is virtue's reward in a Hindu country? Brahmanism has little hold of the national mind in Dravida. The Brahmans are foreigners their doctrines or rather legends, as tought in the

temples are repulsive are else vicious, and no man can rest a troubled heart in them. The philosophical systems of the thoughtful. Brahmans' are jealously kept from the masses, what then have they? ... Many of the songs would seem to show that the crowd lean tenderly towards the Buddhist doctrine of absorption and annihilation.

CHARLES E. GOVER

THE FOLK SONGS OF SOUTHERN INDIA, 1871

"Many of these songs and hymns and ethical epigrams strung together into chants and poems breathe a spirit of the highest morality, purity and toleration. The genuine outpourings of the popular mind and heart, as expressed in such portions of the true indigenous literature as can be separated from the corruptions and mutilations to which they have been subjected from Puranic legends and the lower class of Brahmanas and temple priests, are pure and simple, and they have sometime a higher aim."

S.W. Fallon

Proceedings of the Government of Bengal
In the education Dept., 1873

Each one of the countless ever-changing conditions by which humanity is impressed, has its own reflex expression, and it is fitting that every note of the great complex organ, the human heart, should unite in producting its full swell of rich and varied harmony. Lying from their associates among the dead leaves of a Dictionary, a great many of the yet unwritten wards and phrases of the so-called vulgar tongue may have no meaning for European and native scholars who have not heard them from the mouths of the people. But no one who has listened to and marked these same words, as they are used in combination in the proverbs and songs which are habitually quoted and sung by the people in their homes, in the streets, and on festive occasions, can fail to be impressed with their powerful significance and the stronghold they have on the affections of the people ...

... In the speech of the women of India moreover is mirrored the very image of the thoughts and feelings by which humanity is moved, with the burning words which are wrung from the

sharper sufferings of the weaker vessal. The songs composed by women are distinguished by a natural charm and simple pathos which make way to the hearts of the people. There is the natural language of the emotions; for they have not learnt from books-false copies mostly and always wanting in vividness and accuracy of direct impressions on the hearing ear and the reflex expressions of the living voice which we call speech ..... The only national speech is that which bears the people's stamp and in this category the first place must be assigned to the language of women ..."

S.W. Fallon
A new Hindustani-English
Dictionary with illustrations
From Hindustani Literature and Folk lore 1879

ব্যক্তিবিশেষ সম্বন্ধে যাহা খাটে, জাতি সম্বন্ধেও তাহাই খাটে। চারিদিক দিয়া দেখিয়া শুনিয়া আমার মনে হয় যে, বাঙালি জাতির যথার্থ ভাবটি যে কী তাহা আমরা সকলে ঠিক করিতে পারি নাই — বাঙালি জাতির প্রাণের মধ্যে ভাবগুলি কিরূপ আকারে অবস্থান করে তাহা আমরা ভাল জানি না। এই নিমিত্ত আধুনিক বাংলা ভাষায় সচরাচর যাহা কিছু লিখিত হইয়া থাকে, তাহার মধ্যে যেন দেখিতে পাই না। পড়িয়া মনে হয় না, বাঙালিতেই ইহা লিখিয়াছে, বাংলাতেই ইহা লেখা সম্ভব এবং ইহা অন্য জাতির ভাষায় অনুবাদ করিলে তাহারা বাঙালির হৃদয় জ্ঞাত একটি নূতন জিনিস লাভ করিতে পারিবে। ভালো হউক, মন্দ হউক আজকাল যে সকল লেখা বাহির হইয়া থাকে তাহা পড়িয়া মনে হয়, যেন এমন লেখা ইংরাজিতে বা অন্যান্য ভাষায় সচরাচর লিখিত হইয়া থাকে বা হইতে পারে। ইহার প্রধান কারণ এখানো আমরা বাঙালির ঠিক ভাবটি ঠিক ভাষাটি ধরিতে পারি নাই। সংস্কৃত বাগীশেরা বলিবেন, ঠিক কথা বলিয়াছ আজকালকার লেখার সমাস দেখিতে পাই না, বিশুদ্ধ সংস্কৃত কথার আদর নাই, এ কী বাংলা। আমরা তাঁহাদের বলি তোমাদের ভাষাও বাংলা নহে আর ইংরাজিওয়ালাদের ভাষাও বাংলা নহে।

আমরা আজকাল ইংরাজি ভাবের ভাষাকে বাংলায় অনুবাদ করিতেছি - মনে করিতেছি ইংরাজি ভাবটি বুঝি ঠিক বজায় রাখিলাম - কিন্তু তাহার প্রমাণ কি? আমাদের সাহিত্যে এখন ইংরাজি-ওয়ালারা যারা লেখেন, ইংরাজি-ওয়ালারা তাহা পড়েন, ভাবগুলিকে মনে মনে ইংরাজিতে অনুবাদ করিয়ালন — তাঁহাদের যাহা কিছু ভাল লাগে, ইংরাজির সহিত মিলিতেছে মনে করিয়া ভাল লাগে।

কিন্তু যে ব্যক্তি ইংরাজি বুঝে না সে ব্যক্তিকে এই লেখা পড়িতে দাও, কথাগুলি প্রাণের মধ্যে যদি প্রবেশ করিতে পারে তবেই বুঝিলাম যে, হ্যাঁ, ইংরাজি ভাবটা বাঙ্গালা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। নাহলে অনুবাদ করিলেই যে ইংরাজি বাংলা হইয়া যাইবে এমন কোন কথা নাই।

অতএব, বাঙ্গালা ভাব ও ভাবের ভাষা যতই সংগ্রহ করা যাইবে ততই যে আমাদের সাহিত্যের উপকার হইবে তাহাতে আর সন্দেহ নাই। এই নিমিত্তই সংগীত সংগ্রহের প্রকাশক বঙ্গসাহিত্যানুরাগী সকলেরই বিশেষ কৃতজ্ঞ ভাজন হইয়াছেন।

আমরা কেন যে প্রাচীন ও ইংরাজিতে অশিক্ষিত লোকের রচিত সঙ্গীত বিশেষ করিয়া দেখিতে চাই তাহার কারণ আছে। আধুনিক শিক্ষিত লোকদিগের অবস্থা পরস্পরের সহিত প্রায় সমান। আমরা সকলেই একত্র শিক্ষালাভ করি, আমাদের সকলের হৃদয় প্রায় এক ছাঁচে ঢালাই করা। এই নিমিত্ত আধুনিক হৃদয়ের নিকট হইতে আমাদের হৃদয়ে প্রতিধ্বনি পাইলে আমরা তেমন চমৎকৃত হইনা। কিন্তু প্রাচীন সাহিত্যের মধ্যে যদি আমরা আমাদের প্রাণের একটা মিল খুঁজিয়া পাই, তবে আমাদের কী বিস্ময়, কী আনন্দ। আনন্দ কেন হয়? তৎক্ষণাৎ সহসা মুহূর্তের জন্য বিদ্যুতালোকে আমাদের হৃদয়ের অতি বিপুল স্থায়ী প্রতিষ্ঠাভূমি দেখিতে পাই বলিয়া। আমরা দেখিতে পাই ভগ্নতরী হতভাগ্যের ন্যায় আমাদের এই হৃদয় ক্ষণস্থায়ী যুগবিশেষের অভ্যাস ও শিক্ষা নামক ভাসমান কাষ্ঠ খণ্ড আশ্রয় করিয়া ভাসিয়া বেড়াইতেছে না। অসীম মানব হৃদয়ের মধ্যে ইহার নীড় প্রতিষ্ঠিত। ইহা দেখিলে আমাদের হৃদয়ের উপরে আমাদের বিশ্বাস জন্মে। আমরা তখন যুগের সাথে যুগান্তরের গ্রন্থন সূত্রে দেখিতে পাই। আমার এই হৃদয়ের পাণীয় কি আমার নিজেরই হৃদয়স্থিত সংকীর্ণ কূপের পঙ্ক হইতে উত্থিত, না, অভ্রভেদী মানব হৃদয়ের গঙ্গোত্রী শিখর নিঃসৃত, সুদীর্ঘ অতীত কালের শ্যামল ক্ষেত্রের মধ্যে দিয়া প্রবাহিত, বিশ্বসাধারণের সেবণীয় স্রোতস্বিনীর জল, যদি কোন সুযোগে জানিতে পারি শেষোক্তিটিই সত্য, তবে হৃদয়ে কি প্রসন্নতা হয়। প্রাচীন কবিতার মধ্যে আমাদিগের হৃদয়ের ঐক্য দেখিতে পাইলে আমাদের হৃদয়ে সেই প্রসন্নতা লাভ করে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
বাউলের গান
সংগীত সংগ্রহ, বাউলের গাথা
ভারতী, ১৮৮৩

বাংলা দেশের হিন্দু মুসলমানের মনকে সমগ্রভাবে জানতে হলে লোকসাহিত্যের চর্চা বিশেষ প্রয়োজনীয়। বাংলা দেশের অধিবাসী হিন্দু মুসলমান খৃষ্টান প্রভৃতি নিয়ে! নানা জাতের লোক : দ্রাবিড়, কোল, মোঙ্গল, আর্য ইত্যাদি বাংলা দেশের লোক ধারা সৃষ্টি করেছে। এই সকল লোকদের পূর্ব্ব ইতিহাস, জানতে পারা যায় না। আর তাছাড়া নানা যুদ্ধ বিগ্রহের জন্য অখণ্ড জাতিত্ব দীর্ঘকাল একভাবে থাকেনি, অর্থাৎ সংমিশ্রণ হয়ে গেছে, হিন্দু-মুসলমানেরও মিল ঘটেছে। এই সকল মিলনের স্পষ্ট ছাপ দেখতে পাওয়া যায় বাংলা দেশের লোকসাহিত্যে ...

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

লোকসাহিত্য

আমাদের দেশের ইতিহাস প্রয়োজন এর মধ্যে নয় মানুষের অন্তরতর গভীর সত্যের মধ্যে মিলনের সাধনাকে বহন করে চলেছে - বাউল সাহিত্যেও সম্প্রদায়ের সত্যের মধ্যে মিলনের সাধনা দেখি এ জিনিস হিন্দু-মুসলমান উভয়ের, একত্র হয়েছে অথচ কেউ কাউকে আঘাত করেনি এই মিলনে সভা-সমিতির প্রতিষ্ঠা হয়নি। এই মিলনে গান জেগেছে, সেই গানের ভাষা ও সুর অশিক্ষিত মাধুর্য্যে সরস। এই গানের ভাষায় হিন্দু-মুসলমানের কণ্ঠ মিলেছে ... এই মিলনেই ভারতের সভ্যতার সত্য পরিচয় ... বাঙলা দেশের গ্রামের গভীর চিত্তে উচ্চ সভ্যতার প্রেরণা ইস্কুল-কলেজের অগোচরে আপনা-আপনি কি রকম কাজ করে এসেছে .. হিন্দু মুসলমানের জন্যে এক আসন রচনার চেষ্টা করেছে ... এই বাউল গানেই তার পরিচয় পাওয়া যায় ..."

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

হারামণি ২য় খণ্ড

অধিকাংশ আধুনিক বাউলের গানের অমূল্যতা চলে গেছে তা চলতি হাটের শস্তা দামের জিনিস হয়ে পথে পথে বিকোচ্ছে। তা অনেক স্থলে বাঁধি বোলের পুনরাবৃত্তি এবং হাস্যকর - উপমা তুলনার দ্বারা আকীর্ণ - তার অনেক গুলোই মৃত্যুভয়ের শাসনে মানুষকে বৈরাগী দলে টানবার প্রচার গিরি। এর উপায় নেই, খাঁটি জিনিসের পরিমাণ বেশী হওয়া অসম্ভব মাটির জন্য অপেক্ষা করতে ও তাকে গভীর করে চিনতে যে ধৈর্য্যের প্রয়োজন তা সংসারে বিরল। এইজন্য কৃত্রিম নকলের প্রচুরতা চলতে থাকে। এই জন্য সাধারণতঃ যে সব বাউল গান যেখানে-সেখানে পাওয়া যায়, কি সাধনার কি সাহিত্যের দিক থেকে তার দাম

বেশী নয়। তবু তার ঐতিহাসিক মূল্য আছে। অর্থাৎ এর থেকে স্বদেশের চিত্তের একটা ঐতিহাসিক পরিচয় পাওয়া যায়।

... যে সব উদারচিত্তে হিন্দু-মুসলমানের বিরুদ্ধ ধারা মিলিত হতে পেরেছে সেই সব চিত্তে সেই ধর্ম্ম সঙ্গমে ভারতবর্ষের যথার্থ মানস তীর্থ স্থাপিত হয়েছে। সেইসব তীর্থ দেশের সীমায় বদ্ধ নয়, অন্তহীন কালে প্রতিষ্ঠিত। রামানন্দ, কবীর, দাদু, রবিদাস, নানক প্রভৃতি চরিত্রে এইসব তীর্থ চিরপ্রতিষ্ঠিত হয়ে রইল ...

আমাদের দেশে যাঁরা নিজেদের শিক্ষিত বলেন তাঁরা প্রয়োজনের তাড়নায় হিন্দু মুসলমানের মিলনের নানা কৌশল খুঁজে বেড়াচ্ছেন। অন্য দেশের ঐতিহাসিক স্কুলে তারা শিক্ষিত ... ... শিলাইদহে অঞ্চলের এক বাউল কলকাতায় একতারা বাজিয়ে গেয়েছিল ...

কোথায় পাব তারে
আমার মনের মানুষ যে রে।
হারায়ে সেই মানুষে তার উদ্দেশে
দেশ বিদেশে বেড়াই ঘুরে ...

... এই কথাটির উপনিষদের ভাষায় শোনা গিয়েছে - "তং বেদ্যাং পুরুষং বেদ মা বো মৃত্যুঃ পরিব্যথাঃ" — যাকে জানবার সেই পুরুষকেই জানা নইলে যে মরণ বেদনা। অপণ্ডিতের মুখে এই কথাটি শুনলুম তাঁর গেঁয়ো সুরে, অন্ধকারে মাকে দেখতে পাচ্ছে না যে শিশু, তারই কান্নার সুর তার কণ্ঠে বেজে উঠেছে "অন্তরতর যদয়মাত্মা" উপনিষদের এই বাণী এদের মুখে যখন 'মনের মানুষ' বলে শুনলুম, আমার মনে বড় বিস্ময় লেগেছে ..."

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

(সংগৃহীত) হারামণি, ২য় খণ্ড, ১৯৪২

আমি আজ তোমাদের দেশের সারস্বত বর্গের নামে আহ্বান করিতেছি ভোগের পথে নহে, ভিক্ষার পথে নহে, কর্মের পথে, দেশের কাব্যে, গানে, ছড়ায়, প্রাচীন মন্দিরের ভগ্নাবশেষে, কীটদষ্ট পুঁথির জীর্ণপত্রে, গ্রাম্য পার্বণ, ব্রত কথায়, পল্লীর কৃষি কুটিরে প্রত্যক্ষ বস্তুকে স্বাধীন, চিন্তা ও গবেষণার দ্বারা জানিবার জন্য শিক্ষার বিষয়কে কেবল পুঁথির মধ্যে হইতে মুখস্থ না করিয়া বিশের মধ্যে তাহাকে সন্ধান করিবার জন্য তোমাদিগকে আহ্বান করিতেছি।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

'ছাত্রদের প্রতি সম্ভাষণ'

বঙ্গদর্শন (১৩০২, বৈশাখ)

স্বরলিপি লেখক মহাশয়দিগের প্রতি সানুনয় নিবেদন এই শ্যামা বিষয়ক গান, কৃষ্ণ বিষয়ক গান, বাউলের গান, কীর্তনের গান, যাত্রার গান, থিয়েটারের গান, হাসির গান, হিন্দুস্থানী গান প্রভৃতি বিবিধি প্রকার গানের মধ্যে, যিনি যাহা জানেন, তার স্বরলিপি করিয়া যদি তাঁহারা অনুগ্রহ করিয়া পাঠাইয়া দেন তবে বড়ই ভাল হয়। হিন্দু সঙ্গীত লিপিবদ্ধ করিয়া উহার স্থায়িত্ব বিধান করাই বীণাবাদিণীর মুখ্য উদ্দেশ্য।

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর
সম্পাদকের নিবেদন
বীণাবাদিনীর, আশ্বিন ১৩০৪

যে সব প্রাচীন পুঁথি পাওয়া যাইতেছে তাহার সমস্তই প্রকাশিত হওয়া আবশ্যক তন্মধ্যে কোন কোন পুস্তকের কবিত্ব সুন্দর তাহা কীর্তি স্বরূপ সুপ্রতিষ্ঠিত হইবার যোগ্য; কিন্তু প্রাচীন সমস্ত পুস্তকই ভাষা ও ইতিহাসের পর্যালোচনার জন্য প্রয়োজনীয় হইবে। ..... উপসংহারে বক্তব্য, প্রাচীন বঙ্গসাহিত্য সম্বন্ধে এখনও শিক্ষিত সম্প্রদায় একরূপ উদাসীন আছেন। আয়েম্বিক্ ও ট্রকেয়িক প্রভৃতি ছন্দের মনোহারিতেব প্রীত যুবকগণ অবিরত পয়ার ও দীর্ঘ ছন্দে বিরক্ত হইয়া পড়েন, Paradise Lost কিম্বা টাস্কের অবতারণিকায় যাঁহারা কল্পনার স্তোত্র পড়িয়া সুখী তাঁহারা প্রাচীন
বঙ্গীয় কবিগণের লম্বস্থূল কলেবর ইত্যাদি রূপ গণেশ বন্দনা পড়িতে সহিষ্ণুতা রক্ষা করিতে পারেন না। তাঁহারা জুলিয়েট ও এন্ড্রোমেকি প্রভৃতি নামের পক্ষপাতী কিন্তু বেহুলা, লহনা কাণড়া প্রভৃতি সেকেলে নাম শুনিয়া প্রীত বোধ করেন না। প্রাচীন সাহিত্য পড়িতে কতকটা ধৈর্য ও ক্ষমা চাই; আমরা সাহস সহকারে বলিতে পারি, পয়ারছন্দ ও গণেশ বন্দনা উত্তীর্ণ হইয়া যাহারা প্রাচীন বঙ্গ সাহিত্য অধ্যাবসায়ের সঙ্গে আলোচনা করিবেন, তাঁহাদের পরিশ্রম ব্যর্থ হইবে না, অন্ততঃ বাঙ্গালী পাঠক তাহাতে বিশেষরূপ উপভোগের সামগ্রী পাইবেন, কারণ বাঙালীর মন যে উপাদানে গঠিত, সেই উপাদানে কাব্যগুলিও গঠিত। আমরা এই স্থলে মোক্ষমূলারের এই কয়েকটি বহুমূল্য বাক্য উদ্ধৃত করিয়া ভূমিকার পরিসমাপ্তি করিতেছি "যে দেশের লোকবৃন্দ স্বীয় প্রাচীন ইতিহাস ও প্রাচীন সাহিত্য স্মরণ করিয়া গৌরবান্বিত না হয়, তাহারা জাতীয় চরিত্রের প্রধান অবলম্বন শূন্য হইয়াছে, স্বীকার করিতে হইবে।" যখন জার্ম্মেনী রাজ্য রাজনৈতিক অবনতির নিম্নতর গহ্বরে পতিত হইয়াছিল তখন তদ্দেশীয় লোকবৃন্দ স্বদেশের প্রাচীন সাহিত্যের আলোচনায় নিযুক্ত হইয়াছিলেন; এবং প্রাচীন

সাহিত্য পাঠে ইহাদের হৃদয়ে ভাবী উন্নতির নূতন আশা সঞ্চারিত হইয়াছিল।

শ্রী দীনেশচন্দ্র সেন
বঙ্গভাষা ও সাহিত্য
প্রথম সংগ্রহের ভূমিকা, ১৮৯৬

নানা দিক দিয়া এই সকল পল্লী ভাষায় খাঁটি বাঙ্গালী জীবনের অফুরন্ত সুধা, অচিন্তিত-পূর্ব্ব মাধুর্য্য ঝড়িয়া পড়িতেছে। ইহা স্বর্গ হইতে আহৃত অমৃত-ভান্ড নহে, ইহা আমাদের দেশের আম গাছের মৌচাক, এজন্য এই খাঁটি মধুর আস্বাদ আমাদের নিকট এত ভালো লাগিয়েছে। চন্দ্রকুমার বঙ্গসাহিত্যের নিজ ভাঁড়ার ঘরের সন্ধান দিয়াছেন উহা হোটেলের মশলা দেওয়া মুখরোচক বিলাস খাদ্য সম্ভার নহে। উহা আমাদের পল্লী অন্নপূর্ণার শ্রীকরকমলের দান জীবন দায়ী অন্ন ব্যঞ্জন। এগুলি জানিতাম না বলিয়া আমরা এতকাল শুধু সীতা সাবিত্রীকে লইয়া গৌরব করিয়াছি, এখন আমরা মলুয়া, মদিনা ও কমলাকে লইয়া তা অপেক্ষা বেশী গৌরব করিতে পারিব যেহেতু তাহারা ঘাগড়া পরা বিদেশিনী নহে, শাড়ী পড়া আমাদেরই ঘরের মেয়ে। ....

.... এই পল্লী গাথার আবিষ্কার আমার চক্ষে খুব বড় রকমের একটা জাতীয় ঘটনা। ইহা আমাদের অন্ধচক্ষে দৃষ্টি দান করিতে পারে। এই পালাগুলিতে দেখা যায়, আমরা যে সতীত্বে বড়াই করিয়া থাকি তাহার জন্ম আইন-কানুনে এবং আচার্য্যের মস্তিষ্কে নহে, তাহার জন্ম প্রেমে তাহা নিজের বলে বলীয়ান। বাহিরের শক্তি যে পাতিব্রত্যকে রক্ষা করে তাহার শক্তি দুর্ব্বলতার ছদ্মবেশ মাত্র, কিন্তু প্রেম যাহাকে জন্ম দিয়াছে, প্রেম যাহাকে রক্ষা করিতেছে তাহা ঋষি বচনের প্রতীক্ষা করে না, তাহা হিন্দু সমাজের নিজস্ব নহে, তাহা সমস্ত মানবজাতির আরাধনার ধন। সমাজ তাহাকে রক্ষা করে না, সমাজকেই তাহা রক্ষা করে ...

... বৈষ্ণব কবিতার বঙ্গ রমনী সমাজ দ্রোহী, পরিজনের প্রতি উপেক্ষাময়ী, দুর্জয় দর্পশীলা, কিন্তু এই সকল গাথায়, তিনি গৃহের গৃহ লক্ষ্মী, সমাজের নিকট নত শিরা, তাঁহার দর্প অভিমান নাই, লজ্জার অবগুণ্ঠন তিনি টানিয়া ফেলিয়া রাজপথে বাহির হয়েন নাই; কিন্তু তথাপি অনুরাগের ক্ষেত্রে তিনি জগজ্জয়ী কুটিরে থাকিয়াও তিনি স্বর্গের বৈভব দেখাইতেছেন। সমাজের অনুশাসনে ধরা দিয়াও, তিনি চিরমুক্ত, আত্মার অটল বল প্রকাশ করিতেছেন। সমাজের ভ্রুকুটিতে

তিনি মর্মপীড়া পাইতেছেন সত্য, কিন্তু তাঁহার অনুরাগ সেই বাধায় আরও উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে।

শ্রী দীনেশচন্দ্র সেন
ময়মনসিংহ গীতিকা, ১৯২৩

Let me conclude, therefore, with a plea for the serious study of the Indian vernacular literature by all interested in our great eastern possessions, whether as administrators or as missionaries. Practically nothing is known about it. Its extent is so great that one or two students can make no impression upon it. Unfortunately it is not fashionable. Fashionable decrees that we must study Sanskrit or else books written by scholars, great scholars I freely admit, whose linguistic horizon is bounded by that language. Sanskrit has a noble past, but it belongs to that past. From it little can be learnt of the hopes and fears of the beliefs and superstitions which build up the character of the modern Hindu ... Believe one who has tried it, that the quotation of a single verse of Tulsi Dasa or of a pithy saying of the wise old Kabir will do more to unlock the hearts and gain the trust of our eastern fellow subjects than the most intimate familiarity with the dialectics of Sankara or with the daintiest verses of Kalidasa. A knowledge of the old dead language will, it is true, often win respect and admiration but a very modest acquaintance with the treasures and they are treasures – of Hindi literature endows its possess or with the priceless gift of sympathy and gain for him, from those whose watchword is bhakti, their confidence and love.

George Abraham Grierson
"Modern Hinduism and its Debt to the Nestorians"
Journal of the Royal Asiatic Society, 1907

In continuation of my previous papers on the folk songs from the districts of Barisal and Pabna in eastern Bengal I publish below the texts in Devanagari script and the translations into English, of Eleven archaic folk songs which were brought to light a few years ago in the district of Chittagong in Eastern Bengal. These songs are about 75 years old, for, the manuscripts, wherein they have been found recorded, bears the date of the year 1207 of the Maghi Era

which corresponds circ A.D. 1846. The gentleman, who has collected these songs, says that from the style of the handwritings, the shape of the letters, the appearance of the paper in which the manuscript is written, and other evidence, these folk songs to be the much older than 75 years.

These folk songs have for their theme the pathetic incident of the Ramayana, namely, the exiling into the forest of Sita by her husband Rama, the king of Ayodhya ...

... These eleven archaic folk songs are important both philologically and ethnographically. Their importance a philological point of view will appear from the numerous linguistic peculiarities of their text which have set forth in Appendix. A. of this paper, as also from the numerous archaic wards which have been used thessin which are mentioned in Appendix B here of ...

From an ethnographical point of view also these folk songs are noteworthy in as much they illustrate the ideals which a faithful Hindu wife in Ancient India set before herself and which are described below.

Sarat Chandra Mitra
On Some Archaic Folk-Songs From
The District of Chittagong in
Eastern Bengal, 27th August, 1919

The ancestors of the majority of the Musalmans of Eastern Bengal appear to have been Hindus who were forcibly converted to Islam during the Mohommedan regime. This is evidenced by the fact that their latter day descendents still retain some of the customs and usages of Hindu their forbears. Their personal names are composed partly of Hindu and partly of Mahommedan congonemes. Their boys are not only taught the tenets of Koran, but are also instructed in the legends of the Ramayana and the Mahabharata. Their widows wear the unbordered saris and cut their hair short just like the Hindu widows, and object to cow killing. Their houses are adorned with Hindu mythological picture. Those among them who are gifted with the poetic compose vein songs not only about

Hindu mythological subjects but sometimes also in honour and praise of the Hindu gods and goddesses. This will be apparent from the folk-songs Nos 2 and 3, from the district of Barisal in Eastern Bengal which I have published elsewhere. The Chittagong folk-songs No 2 and 4 which are published below, also testify to the same fact.

The four Musalmani folk-songs published here in below have been collected from the district of Chittagong in Eastern Bengal, where they are stated to be current among, and sung by Mahommedan folk.

Sarat Chandra Mitra
On Four Mussalmani Folk-songs
From the District of Chittagong
In Eastern Bengal, 1926

মুর্শীদা কান্নার গান, চোখের জলের বাঁধন হারা ধারায় সিক্ত এর সুর। গেঁয়ো কৃষকের কাঁদনে ধোঁয়া কণ্ঠে এর স্থিতি। কত যুগ যুগান্তরের কান্নাই না চলিয়া গিয়াছে গ্রামের উপর দিয়া, কত বেহুলার নয়ন গলানো প্রেমে সাংকুড়ের আকাশ ছোঁয়ান তরঙ্গে ভেলা ভাসায়ইয়া মরা পতিকে জিয়াইয়া আনিয়াছে, কত আমীর সাধুর বিরহী সারিন্দা দূরদেশে অপহৃত বেলোয়া সুন্দরীর জন্য কাঁদিয়া গুমরিয়া মরিয়াছে। গ্রাম কেবল দেখিয়াছে আর কাঁদিয়াছে, তার সাপলা ভরা বিলের ধারে কলসী ভরিয়া কত গ্রামের মেয়ে আকাশের পানে চাহিয়া চাহিয়া দূরদেশে পতির উদ্দেশ্যে চোখের জল ফেলিয়া গিয়াছে। গ্রাম তার সেই কান্না ভোলে নাই। রাখালী, কেচ্ছা ও বারমাসীর গানে গ্রাম তা বুকে আঁকিয়া রাখিয়াছে। এই সব গান কান্নার হইলেও গ্রামের তৃপ্তি হইল না। বাহিরের এই কান্নার সাধনা যেদিন তাঁর অন্তরের ঠাকুরকে জাগাইয়া তুলিল, সেদিন বাউল কবির এক তারায় নতুন সুর বাজিয়া উঠিল।

তুমি দ্যাও দেখা সোনার চাঁনরে আমার
তুমি কও কথা দয়াল চাঁনরে আমার
তোরে না দেখিলে প্রাণ আমার বাঁচে নারে।

বাহিরে যে কান্না শুধু রাখালী ও বারমাসী গানে বাজিয়া উঠিত সেই কান্নাই যে দিন দয়াল চাঁনকে ডাকিয়া আনিল, আর এই দয়ালচাঁন যে গ্রামকে কে দেখা

দিয়া কথাও কহিয়াছিল তাহা যাহারা একবার ও কোন মুর্শীদা গানে যোগ দিয়াছেন তারাই সাক্ষ দিবেন। ...

... কাঁদিয়া কাঁদিয়া বাউল এ গান গাহিয়াছে আর কাঁদিয়া কাঁদিয়া গ্রাম এ গান শুনিয়াছে। তাই কথা এ গানে নাই আছে শুধু সুর আর কান্না। কবে এই গান প্রচলিত হয়েছিল বলা যায় না। তিনশত বৎসর পূর্বেও এ গান ছিল তাহা অনুমান করা যায়। ....

... ইহা বোধহয় আমাদের দেশে বৌদ্ধ ধর্মের শেষ নিদর্শন। আমাদের গ্রামের লোকেরা বহুদিন পর্যন্ত বৌদ্ধ ছিল। পরে মুসলমান ও হিন্দু হইয়া ইহাদের অনেকেই বাহিরের কাঠামোটি বদলাইলেও অন্তরের বৌদ্ধ ভাবটি ছাড়তে পারে নাই। আর যাহারা হিন্দু ছিল তাহারাও মুসলমান হইয়া হিন্দু ভাব অনেকটাই বজায় রাখিয়াছে। তাই বহু মুর্শীদা গানেই বৌদ্ধদের মায়াবাদের নিদর্শন পাওয়া যায়। জগৎটা যে কিছুই নয়, ছাড়িয়া যাইতে হইবে এরূপ কথা অনেক মুর্শীদা গানে আছে। ...

... মুর্শীদা শব্দের অর্থ গুরু। যে গানে গুরু প্রশংসাদি আছে তাই মুর্শীদা গান। কেবল নিছক মানুষের ভজনের জন্য আর কোন গানই আমাদের দেশে নাই। বৌদ্ধরা যে নানারূপ অনুষ্ঠান করিয়া প্রেত আনয়ন করিতেন এ বোধহয় তাহারই একটি নিদর্শন। কারণ এখনও অনেকের এ গান গাহিয়া এবং তাহাদের উপর দেবতা আসিয়া নানারূপ কথা বলিয়া যায়। ... হিন্দুকেও আমরা মান্দার, ফাতেমা ও আল্লাজীর চরণ বন্দনা করতে দেখিয়াছি আবার মুসলমানকেও রাধাকৃষ্ণের নাম লইয়া চোখের জল ফেলিতে দেখিয়াছি। ফলকথা যে গানে ভাব আসে সে গানই তারা গায়। তা সে গান কৃষ্ণের হউক আর আল্লাজীরই হউক। এক কথায় বলিতে গেলে ইহারা ভাবের উপাসক। এই গানের একটা প্রধান বিশেষত্ব এই যে, ইহা নিখুঁত পূর্ববঙ্গের ভাষায় বিরচিত। পূর্ববাংলার কথা এমন মিষ্টি ভাবে আর কোন গানেই সংযোজিত হয় নাই। ইহার কোন পদ সাধু ভাষায় রূপান্তরিত করিলে আর ইহার লালিত্য থাকে না। .... ফলকথা মুর্শীদা গান গ্রামের সকল গান ছাপিয়া অমৃতের খনি, সুর ও কান্না কথা এই গানের সার। এই সুর ও কান্না বাদ দিয়া শুধু কথা প্রকাশের সঙ্কোচ আমরা কিছুতেই ত্যাগ করিতে পারিতেছি না। তবে এক আশা এই সব কথা শুনিয়া যদি কেহ এই গান, সুর শিখিতে চান। কারণ আমাদের গ্রাম্য গানগুলি ক্রমেই লোপ পাইতেছে। প্রাচীনকালে সুন্দর সুন্দর সুর ছিল, এখন তাহা কেহই গানে না।

... মুর্শীদা গান আর বিচ্ছেদ গান উভয়েই মানুষের মনে ভাব উদ্রেক করে। তবে রাধাকৃষ্ণ গানে মাঝে মাঝে স্থূল দৈহিক ভালবাসার কথা পাওয়া যায় কিন্তু মুর্শীদা গানে তাহা নাই ...

... মুর্শীদা গানে যেমন পৃথিবীর অনিত্য বিষয়ক বহু গান পাওয়া যায়। বৈষ্ণব পদাবলীর মত কোন বিচ্ছেদ গানেই জীবনের অনিত্যতা লইয়া কোন উল্লেখ নাই। মুর্শীদা ফকিরের মত 'দুবলার শীষে যেমন নিহারে পানি, কোনজনা বেইমানে কইছে এই দেহ হাপানি" মনে করিয়া বিচ্ছেদ গানের কোন কবি চোখের জলে বুকে ভাসান না।

... বাউল গান এক রকমের তত্ত্বমূলক গান, সৃষ্টিতত্ত্ব, দেহতত্ত্ব, নবীতত্ত্ব, নারীতত্ত্ব প্রভৃতি লইয়া বাউল গানের কারবার। এইসব বিষয়ে সম্যক জ্ঞান লাভ করিয়া গুরুর উপদেশ অনুসারে বাউলেরা সাধনা করিয়া থাকে। বাউল গানকে কোথাও বিচার গান, নাউয়া গান অথবা মারফতি গান বলে। ময়মনসিংহ জেলার কোথাও কোথাও এই সব তত্ত্বমূলক গানকে মুর্শীদা গান বলা হয় কিন্তু মুর্শীদা গান আর বাউল গান এক নয়। তান্ত্রিক সহজিয়া এবং বৈষ্ণব সহজিয়াদের কাছ হইতে বংশ পরম্পরায় প্রাপ্ত বংশ তত্ত্ব বস্তুর সঙ্গে সুফী [১] তত্ত্ববস্তু মিশিয়া বাউল গানে এক দুর্বোধ্য ও জটিল তত্ত্ববস্তুর সমন্বয় হইয়াছে। ...

... হিন্দু সমাজ হইতে প্রাপ্ত তত্ত্ববস্তুর উপর মুসলমানী ছাপ লাগাইবার এখানে অক্লান্ত পরিশ্রম। ... বস্তুত বাউলেরা বা সাঁই দরবেশরা ভাবে বিভোর হওয়াকে খুব উচ্ছে স্থান দেন না। কিন্তু এক জায়গায় বাউল ও মুর্শীদা ফকিরদের মধ্যে মিল রহিয়াছে। ঐ পৃথিবী যে অনিত্য, এখানে কিছুই যে চিরস্থায়ী নয় এ কথা বাউল ও মুর্শীদা ফকির দুজনই বলে। ...

... বাউল গানের প্রধান উদ্দেশ্য তাহাদের গোষ্ঠীর গোপনতত্ত্ব আকারে ইঙ্গিতে প্রকাশ করা, যেখানে বাউলেরা তর্ক করে, বিচার করে, সেখানে মুর্শীদা ফকিরেরা ভাবে বিভোর হইয়া গান গায়।

... রবীন্দ্রনাথ হইতে আরম্ভ করিয়া বহু চিন্তাশীল লোকই বাউলদিগকে কবি বলিয়া আখ্যা দেন, রবীন্দ্রনাথের গান "বাদল বাউল বাজায় বাজায় রে' অথবা নজরুল ইসলামের 'আমি ভাই ক্ষ্যাপা বাউল, আমার দেউল আমারই এই মানব দেহ' কিন্তু আমরা বলিব বাউলেরা কবি নন তার্কিক, দার্শনিক, যুক্তিবাদী। নদীয়াতে এক সময় নব্য ন্যায়ের খুব চর্চা হইত। বড় বড় শ্রাদ্ধে অথবা ধর্মীয়

অনুষ্ঠানে ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরা মতামত লইয়া তর্ক বিতর্ক করিতেন। মুসলমান মৌলানারাও সে বিষয়ে কম যাইতেন না। ...

... এই তর্ক যুক্তিগুলির প্রভাব গ্রামগুলিতেও পড়িয়াছিল। নব্য ন্যায়ের দেশ নদীয়া জেলায় যে লালন ফকীরের আবির্ভাব তাহার মতবাদ ও এই তর্ক যুদ্ধের প্রভাব কি না কে বলিবে।

... কিন্তু মুর্শীদাপন্থী ফকিরেরা সত্য সত্যই কবি, তাহারা অত তত্ত্ব বস্তু বোঝেন না। চোখের পাণিতে আপন মনের মানুষের সন্ধান করাই তাহাদের উদ্দেশ্য। বাউলদের নানা প্রকার গোপন সাধন প্রণালী আছে। গুরুর কাছে দীক্ষা লইয়া দেহতত্ত্বের ভেদ জানিয়া সেই সাধনা করিতে হয়। মুর্শীদা ফকিরের কোন গোপন সাধনা নাই। চোখের পাণিই তাহাদের সাধনার একমাত্র বস্তু। সেই চোখের পাণি লইয়া মুর্শীদা ফকিরেরা অন্তরের দরদীর সন্ধানে ফেরে। পৃথিবীতে ভাবুক লোকের সংখ্যা কম। তাই মুর্শীদা গানেরও সমঝদারের সংখ্যা কম। যাহারা গানের মধ্যে বস্তু খোঁজে, যুক্তি তর্ক দিয়া গান বুঝিতে চাহেন তাহারা সবাই বাউল বা মারফতি গানের সন্ধান করেন। ...

... জমিদার মহাজন নিপীড়িত, নানা রোগ শোক অভাব দুর্ভিক্ষ জর্জরিত বাংলার জনসাধারণের এই দুঃখের গানগুলি সব চাইতে মুধরতম গান। একে অপরের সঙ্গে দেখা হইলে কুশল প্রশ্ন করে না অভাব অভিযোগের কথা বলে। দুঃখের কথা বলিয়া কপালে করাঘাত করে।

চাতক রইল মেঘের আশে
মেঘ ভাইস্যা যায় অন্য দেশ

এই যে মেঘ ভাসিয়া অন্য দেশে যায় এমন তো গ্রাম দেশে অহরহ হইতেছে। মহাজন আসিয়া ঘরের গরু ক্রোক করিয়া লইয়া যাইতেছে, বর্গাদার আসিয়া ক্ষেতের অর্ধেক ধান কাটিয়া লইয়া যাইতেছে। সরকারী তহশিলদার আসিয়া খাজনার দায়ে ঘটি-বাটি নিলাম করিতেছে। ইহার উপর বন্যা আছে, ওলাওঠা, বসন্ত রোগ আসিয়া কোলের ছেলেকে লইয়া যাইতেছে। দুঃখের গান ইহারা গাহিবে না তো কাহারা গাহিবে? তাই আল্লা তালার কাছে হউক অথবা গুরুর কাছেই হউক গ্রামবাংলার মর্মান্তিক দুঃখের কাহিনীতেই ভরা এই গানগুলি।

জসীমউদ্দীন
মুর্শীদা গান
প্রথম প্রকাশক 'ভারতী'
৪৮শ বর্ষ, ১৩৩১

With each passing day the villages in our state appear to gather God's curses. The abundant joy of the Gazi and Jari songs, of the Tarja and other verse recitals, of Jhumur and Tumvi dances is slowly disappearing. According to many this has been due to economic reasons. But that is only a part of the truth. We find that in the villages football clubs are daily growing in number, more and more theatre stages are being constructed, the sale of gramophone records runs to thousands. If there is money for these entertainments then why should people be reluctant to spend for the traditional rural entertainments which costs far less? ...

.... Popular tastes has undergone a transformation. We have become captive to the glitter of foreign tinsel neglecting the treasure of our own riches. Present day civilization is becoming urban centred with the help of and along the pathways of foreign steamers, railways, telegraph and post offices the cheap foreign goods bring along with them vulgar and crude tastes into Indian towns and from there spread to villages. The latter accept whatever comes from the cities, be they articles of use or cheap fashion, be they thoughts and ideas. The villages, on their part, send only raw materials, which the cities utilize according to their own needs and wishes. The villages, as a result, are becoming urbanised but the cities are not acquiring the characteristics of the villages.

Those who go from the villages to the towns are unable to shape or influence urban tastes in any manner. When they go they do not take with them the festivities or entertainments of villages they lose their personality amidst fashionable entertainments of the cities ... They lead busy lives and whatever leisure they get they spend it in the so called entertainments that the cities provide ...

... It is doubtful if foreign domination has harmed any province more than Bengal. Calcutta, Bengal's capital, is a city built by foreigners. It does not reflect of Bengal's art and music in any manner as do the capitals of other provinces. The other provincial capitals, if they are old towns have bases of arts, music and dances of the country around. British rule has, it is true, somewhat weakened them but has not destroyed them

altogether. Moreover the older towns or capitals enjoyed, in many instances, the patronage of the rajas and nawabs which encouraged and thereby helped the traditional music and other age old artistic avocations to survive. This explains how the singers and dancers of other provinces, who are comparatively well off because of feudatory or princely patronage, have been able to come too far away from Bengal and even influence her distinctive music. Denied such opportunity, the folk singers of Baul, Bhatiali or Kirtan have not been able to spread any influence in Calcutta ...

... Many persons desirous of learning the song of Bengal are unable to do so because of lack of opportunity. There is hardly any arrangement in the towns for teaching Baul, Kirtan or Bhatiali. And who will take the trouble of going round the villages and taking pains to learn them? ..... Most of those belonging to the cities who sing folk songs make many mistakes. This I have found out from personal experience while trying to teach folk music to a few such singers. For one thing, they are not sufficiently respectful towards the subject they wish to learn ...

... Recently one does find people who are eager to listen to folk songs. But they are being duped by the adulterated product which, like Khaddar made in Japan, is turned out by an admixture of a few Baul and Bhatiali tunes in the hybrid songs of the cities ... If a few well chosen accomplished singers from the villages are given a little instruction as to the ways and tastes of urban audience it may help the popularisation of folk music. Gramophone companies and the radio authorities can also be of help in this respect. In fact Hindustan Company has taken some steps in this direction. With their help and encouragement we recorded a flute recital by a peasant boy from a village. If in this manner some place is found for folk music in the cities, it may be possible to prevent the extinction of festivals and entertainments ...

..... About one hundred and fifty years ago the Muslims of our country were affected by a wave of revival and regeneration. This was the Wahabi Movement which, like the Protestant Movement, reshaped Muslim society. As a result of

this movement the influence and power of the priest increased considerably. They pronounced anathema on songs, music and dances. In the name of Holy Quran – where, incidentally, there is no injunction against music – they spread their hold over the ignorant common people to such an extant that musicians gone beaten up and were socially boycotted .....

... Sri Dinesh Chandra Sen has written in the preface of his Mymensingh Gitika that the Brahminic influence has harmed the folk music of Bengal considerably. Sri Chaitanya's influence did the same to many kinds of folk songs. Formerly Gajan festivals were celebrated at every nook and corner of Bengal. To the accompaniment of the grave rhythm of the drums the Gajan Sangans used to sing the astagans of Chaitra puja. After they became Vaishnavas the people have given up observing these festivals ..... Because of recent communal animosity at some places the Muslims have boycotted the fairs connected with Hindus festivals ...

... Then again, the folk singers used to get encouragement from the landlords and other rich people... Besides the above, the absence of competent composers has also been responsible for the decline of folk songs. Formerly, highly educated persons used to compose folk songs as can be seen from Kabikankan's Chandi or Bijoy Gupta's Padma Puran. Now a days the songs written or composed by the educated have hardly any connection with folk music ...

... There is yet another reason. Most of our songs are associated with one kind or other of religious rites. At present people are losing their faith in such rites. In fact those who observe or have belief in them are looked down upon in modern society as have, for example, been the cases of Bairagi's, Bauls and Nera Fakirs.

Jasimuddin

Decline of folk songs

Taken from (Folk Music and Folklore : An anthology, Vol. 1, 1967)

First published in Magazine, Bichitra, 1933

বস্তুতঃ বাংলার জাতীয় ইতিহাসের লুপ্ত অধ্যায় আবিষ্কার করিতে হইলে এই সকল উপাদান অপরিহার্য। দেশের সত্যকার জীবনধারার সহিত অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধে যুক্ত যে সকল গান, কবিতা, ছড়া, ব্রতকথা, রূপকথা এবং প্রবাদ তাহা অমূল্য।

ইহারা অতীতের স্মৃতি বহন করিতেছে শুধু এই কারণেই ইহাদের মূল্য নহে, আমার মনে হয় ইহাদের মধ্যে বাঙালী জাতির প্রাণসত্তা নিহিত রহিয়াছে। ...

... বাংলার এই সম্পদ কিভাবে সঞ্চিত হইয়াছিল তাহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে আমরা যে এক অখণ্ড আধ্যাত্মিক জাতীয় ভাবের সন্ধান পাই, তাহার মধ্যে ভেদবুদ্ধির কোন অবকাশ নাই।

ইহাই আমার মতে বাঙালীর অবিসংবাদিত মরমী পরিচয়। ... ইহা কোনও ধর্মবিরোধ বা বর্ণভেদের দ্বারা ব্যহত হয় নাই। হিন্দু, মুসলমান, ব্রাহ্মণ, বৈশ্য সকলেরই মধ্যে যে মূলগত সাম্য, তাহারই উপরে প্রতিষ্ঠিত এই জাতীয় ভাবধারা।

খগেন্দ্রনাথ মিত্র

পরিচয়, হারামণি ২য় খণ্ড

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ৮ই ভাদ্র, ১৩৪৯

আমাদের মধ্যে এককালে গভীরভাবে জ্ঞানচর্চা হইয়াছিল। সেই জ্ঞান স্পৃহা এবং জ্ঞানচর্চার ধারা আমাদের মধ্যে আর দেখিতে পাওয়া যায় না। এমনকি আমাদের চতুর্পার্শ্বে কি ঘটিতেছে সে বিষয়েও আমরা অত্যন্ত উদাসীন। ... যাহা হউক আমার মনে হয় এখন নিরেট জড়তা পরিত্যাগ করিয়া আগ্রহের সঙ্গে এই আলস্যের প্রায়শ্চিত্ত করা দরকার হইয়া পড়িয়াছে, আমাদের আশেপাশের খরব লইতেই হইবে নতুবা আমাদের জীবনধারা ও মননধারা পরিস্কার বুঝা যাইবে না। আরেকটি লজ্জার বিষয় এই যে বিদেশীয় পণ্ডিতেরা আমাদের অনেকের অনাদৃত অবহেলিত এবং অজ্ঞাত ব্যক্তিবর্গের জীবন ও বাণী বিশেষ যত্ন সহকারে সংগ্রহ করিতে লিপ্ত রহিয়াছেন। সুতরাং আমাদের আর বসিয়া থাকিলে চলিবে না। বাংলাদেশে বাউল বলিয়া একটি সম্প্রদায় আছে, আর এই সম্প্রদায়ের সঠিক বিবরণ তাহাদের মতবাদের ইতিহাস এবং তাহাদের জীবন আদর্শের প্রত্যেক গানগুলি এখনো সংগৃহীত হইল না। ..... বাউল ধর্মমত সমর্থন না করিলেও আমাদের আশেপাশে ঘর বাঁধিয়া গান গাহিয়া তাহারা জীবন কাটাইল কিসের মোহে তাদের সন্ধান লইতে হইবে ... বাউল গানের

সাহিত্যের দিক হইতে উচ্চস্থান যোগ্য ... গানগুলি যত সম্ভব দ্রুত সংগ্রহ করা উচিত তাতে বাঙালী জাতির নানা তথ্য পাওয়া যাবে। এমন সব তথ্য যা লিখিত ইতিহাসে পাওয়া সম্ভবপর নহে। ...

... বাংলাদেশের প্রত্যেক জেলাতে খুঁজিলে এই প্রকার গান সংগ্রহ পুস্তক মিলিবে। সকল গানগুলি এবং সকল বাউলদের জীবনী একস্থানে করিতে পারিলে তবে এ বিষয়ে গভীর আলোচনা করা যাইতে পারে ... আমাদের শিক্ষিতদের মধ্যে উৎকৃষ্ট বাউল গানগুলি কিছু কিছু আদর হইতেছে; অবশ্য রবীন্দ্রনাথ এই রসবোধ জাগ্রত করিয়াছেন। কিন্তু অন্য গানগুলিও আদরের সহিত চর্চা করিবার জিনিস। এই হিসাবে এই সকল গানগুলোর মধ্যে আমরা সাধারণ মানুষের মনের সাক্ষাৎ পাইব। ইতিহাসের দিক দিয়ে বিচার করলে ইহা বড়ই মূল্যবান ... রবীন্দ্রনাথ বাউল গানের এই ঐতিহাসিক মূল্য স্বীকার করেছেন। আসল কথা বাউল গায়কদের জীবনী এবং বাউল গান সমূহের সংগ্রহ করা বড়ই প্রয়োজন। বাংলাদেশের তরুণ চিত্তের নিকট আমার এই সানুনয় আবেদন তাঁহারা উৎসাহের সহিত এই মহাকার্যে ব্রতী হউন ...

বাংলাদেশের লোকসঙ্গীত সংগ্রহ করা আমার ছেলেবেলা থেকে সখ। ছাত্রজীবনের সংগ্রহ আমি স্বব্যয়ে ছাপাইয়াছি। পণ্ডিত সমাজে উহার আদর হইয়াছে দেখিয়া আমার হৃদয় খুদাতায়ালার নিকট হাজারবার শোকর গুজারী করিয়াছে। ইউরোপ এর নানা দেশে তাহাদের লোককথা লোকসঙ্গীত, গল্প, ছড়া, প্রবাদ প্রভৃতি সংগৃহীত হইয়াছে। ইহার মধ্যে কয়েকটি সমিতি বিখ্যাত Folklore Society (London), Finnis Society of Folklore (Helsinki) প্রভৃতি সমিতি প্রচুর কাজ করিয়াছেন। নৃতত্ত্বের মাল মশলা হিসাবে এই সকল জিনিসের বিশেষ মূল্য আছে। ... লোকসঙ্গীত সম্বন্ধে একটি ধারণা আমাদের বিদগ্ধ সমাজে প্রবল। রবীন্দ্রনাথ উৎকৃষ্ট শ্রেণীর লোকসঙ্গীতগুলির বিশেষ আদর করিয়াছেন, তিনি অবশ্য অন্য গানগুলির মূল্য অস্বীকার করেন নাই। কিন্তু পণ্ডিতেরা মাত্র দার্শনিকতা, ভাবুকতা ও কবিত্ব পরিপূর্ণ লোকসঙ্গীতগুলিরই বিশেষ পক্ষপাতী। এই মনোভাব নানা প্রকার লোকসঙ্গীত সংগ্রহের পক্ষে অনুকূল নহে। কেননা সকল প্রকার
লোকসঙ্গীতের মধ্যে উচ্চ ভাব ও কবিত্ব পাওয়া দুষ্কর, অথচ সমাজ ধর্ম্মের ও অন্যবিধ ব্যাপারের ইতিহাস আলোচনা সম্পর্কে সকল প্রকার গানেরই প্রয়োজন অনুভূত হয়। ...

আশা করা যায় মুসলমানদের নবজাগরণ জ্ঞানচর্চার দুরূহ কার্য্যে নিয়োজিত হবে। ... মুসলমান আগমনের চিহ্ন এই গ্রাম্য মারফতী সঙ্গীতে স্পষ্ট ধরা পড়ছে বঙ্গদেশে, ... বঙ্গদেশে সূফী প্রভাবের বিস্তৃত ইতিহাস লিপিবদ্ধ করতে গেলে এ গানগুলি বিশেষ প্রয়োজন ... বাংলাদেশের বিদগ্ধ মুসলিম চিত্তের নিকট সমগ্রভাবে বাংলা সাহিত্য অবহেলিত হয়ে আসছে, অথচ বাংলা সাহিত্য চর্চার প্রথম স্তরেই গানগুলি সাক্ষ দেবে বাঙালী মুসলমান অশিক্ষিত জনসাধারণের বাংলা সাহিত্য প্রীতি ও চর্চার। বটতলা সাহিত্য অপেক্ষা এই পর্যায়ের সাহিত্য নিদর্শন অধিকতর বিশাল এবং উচ্চাঙ্গের। রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতি মনীষী বহুস্থানে এই সকল লোকসঙ্গীতের শ্রেষ্ঠ গুলোর যথেষ্ট সমাদর ও প্রশংসা করেছেন। আজ আমরা আরবী-ফারসী শব্দের কলহ দ্বারা বঙ্গ সাহিত্য কলুষিত করছি। অথচ ফারসী শব্দের প্রাচুর্য এই সকল সঙ্গীতে জীবন্ত হয়ে রয়েছে। ... আজ ভারতে Rural Reconstruction-এর উৎসব চলছে। বাংলাদেশকে সঠিকভাবে বুঝে পুনর্গঠন করতে গেলে এই গানগুলির বিশেষ প্রয়োজন। জনমনের চমৎকার পরিচয় এই গানে পাওয়া যাবে। গ্রামকে সংস্কার এবং পুনর্গঠন করতে গেলে এই সঙ্গীতকে তার পূর্বতন কার্যকরী প্রভাব বিস্তার করতে দিতে হবে। আরও একটি কথা এই সম্পর্কে উল্লেখযোগ্য হিন্দু-মুসলমানের অন্তরঙ্গ পরিচয় এবং মিলিত সাধনা এই গানগুলোকে জন্ম দিয়েছে ...

... বাংলাদেশে যে সকল রূপকথা সংগৃহীত হইয়াছে তাহার অধিকাংশই হিন্দু জীবন লইয়া মুসলমানী রূপকথা মাত্র দু'একটি মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইয়াছে ... সরকারী ইতিহাসাদিতে মুসলমানের রাজ্য জয়, রাজ্য বিস্তার এবং রাজ্যশাসনের সুবিস্তৃত কাহিনী যথাযথভাবে লিপিবদ্ধ রহিয়াছে, সাহিত্য, দর্শন, শিল্প স্থাপত্য, ভাস্কর্য প্রভৃতিতে হিন্দু-মুসলমানের সম্মিলিত ব্যক্তির মনোরম বিকাশের বিবরণী আমরা পূর্ণরূপে জানি। কিন্তু লোক শিল্পে, লোকসাহিত্যে এবং লোকচিত্তে এই মিলন কি প্রকার দ্রুত ও সার্থকভাবে সংঘটিত হইয়াছিল তাহার ইতিহাসের কোন সন্ধান নাই। অশিক্ষিত বহুজনের মিলন বা সংমিশ্রণের সেই কাহিনী বাউলদের গান বা মারফতী গানে পর্যাপ্ত পরিমাণে পাওয়া যায়। ... হিন্দু-মুসলমানের সম্মিলিত মরমিয়াবাদ তাঁহার চিত্তে প্রয়াগ সঙ্গমের সৃষ্টি করিয়াছে। এই লোক কবির বাণী আজ আমাদের বড় প্রয়োজন, তর্ক এবং বিচারে জাতীয় গঠনের যে সকল জটিল গ্রন্থি উন্মোচন সম্ভব হইতেছে না, লালন এবং তাঁহার মতো ধ্যানী চিত্তের সংস্পর্শে আসিলে তাহা আপনা আপনি খুলিয়া যাইবে। ...

বিবাহ উপলক্ষ্যে গান গাহিবার এবং নৃত্য করিবার পদ্ধতি ছিল। হিন্দুরা ইংরাজী শিক্ষার ফলে উহা ত্যাগ করিয়াছে। মুসলমানেরা মাদ্রাসা শিক্ষার ফলে উহা আর গ্রহণ করে নাই। ফলে এই গানগুলি এখন লোক বিস্মৃতির অতলজলে নিক্ষিপ্ত হইতেছে। ... ঢাকাতেই নৌবহর এর প্রধান কেন্দ্র ছিল এখনও নানা প্রকার বাদ্যযন্ত্র ইত্যাদির সঙ্গে প্রতি বৎসর মহাসমারোহে বুড়ীগঙ্গায় নৌকা রাইচ্ সম্পাদিত হইতে দেখিয়াছি। অতীব ক্ষোভের বিষয় আমাদের নবীন শিক্ষিত যুবকবৃন্দ এই সকল সামরিক ক্রীড়া ও আনন্দ উৎসব হইতে সাবধানে নিজেদেরকে দূরে রাখেন।

মহম্মদ মনসুরুদ্দীন
হারামণি, ২য় খণ্ড
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক
প্রকাশিত, ১৯৪২

বাঙ্গালীর মতন 'মা' বলিয়া ডাকিতে পৃথিবীর আর কোন জাতি পরে নাই - বুঝি বা পারিবেও না। মাকে মেয়ে সাজাইয়া যে সব খেলা এদেশের ভক্ত ও সাধকেরা খেলিয়াছে, তাহার নিদর্শন ও অন্য কোথাও দৃষ্ট হয় না। তাই আগমনী ও বিজয়ার গান কেবল বাঙ্গালীই রচনা করিতে পারিয়াছে। আর কোনও জাতি পারে নাই। বাঙ্গালা ভাষা ভাণ্ডারের ইহা এক অমূল্য সম্পদ। শুধু আগমনী ও বিজয়া কেন? — রামপ্রসাদ, কমলাকান্ত প্রভৃতির রচিত অন্য প্রকার শক্তি বিষয়ক সঙ্গীত ও ভাবের গৌরবে ও গঠনের সৌন্দর্যে বাঙ্গালা ভাষায় এক অপূর্ব এবং অনুপম সামগ্রী। বৈষ্ণব সঙ্গীতের ন্যায় ইহাও বাংলা সাহিত্যের একটা অংশ সমুজ্জ্বল করিয়া রাখিয়াছে। রামেন্দ্রসুন্দর একবার বলিয়াছিলেন, "আধুনিক সাধু শব্দবহুল সাহিত্যের পোনের আনা লুপ্ত হইলে আমরা সবিশেষ দুঃখিত হইব না; কিন্তু চণ্ডীদাসের অথবা রামপ্রসাদের গানের যদি কেহ সাহিত্য হইতে নির্ব্বাসন ব্যবস্থা করিতে চাহেন, আমরা ক্ষমতা পাইলে তাঁহাকে তুষানলে পোড়াইয়া মারিব।"

ব্রহ্মকে মাতৃরূপে উপাসনার ভিতরে যে ভাব আছে তাহা যাঁহারা জানেন না, বাঙালীর সাধনকান্ডের কোনও সংবাদ না রাখিয়া যাঁহারা খ্রীষ্টান পণ্ডিতগণের গবেষণানুসারে দুর্গা, কালী, শিব পূজা প্রভৃতিকে অসভ্য বর্ব্বর অনার্য জাতিদিগের ভূত পূজার আকারান্তর মাত্র মনে করেন, শক্তি-বিষয়ক সঙ্গীতে তাঁহারা কোন রস বা কবিত্ব দেখিতে পাইবেন কিনা সন্দেহের বিষয়। তবে

ভরসার কথা এই যে, পুরুষানুক্রমে আমরা মা বলিয়া আসিতেছি, সে পৈতামহ সংস্কার (Heredity) আমাদের প্রকৃতির সহিত গাঁথা আছে, তাহা তো ছাড়িবার নহে। মনে পড়ে, বঙ্কিমচন্দ্র একবার লিখিয়াছিলেন "একদিন বর্ষাকালে গঙ্গা তীরস্থ কোন ভবনে বসিয়াছিলাম। প্রদোষকাল প্রস্ফুটিত চন্দ্রালোকে বিশাল বিস্তীর্ণ ভাগীরথী লক্ষ বীচি বক্ষেপশালিনী-মৃদু পবন হিল্লোলে তরঙ্গ ভঙ্গ চঞ্চল চন্দ্রকরমালা লক্ষ তারকার মত ফুটিতেছিল ও নিবিতেছিল। যে বারান্দায় বসিয়াছিলাম, তাহার নীচে দিয়া বর্ষার তীব্রগামী বারিরাশি মৃদু রব করিয়া ছুটিতেছিল। আকাশে নক্ষত্র, নদীবক্ষে নৌকায় আলো, তরঙ্গে চন্দ্ররশ্মি। কাব্যের রাজ্য উপস্থিত হইল। মনে করিলাম কবিতা পড়িয়া মনের তৃপ্তি সাধন করি। ইংরাজী কবিতায় তাহা হইল না। ইংরাজীর সঙ্গে এ ভাগীরথীর তো কিছুই মিলে না। কালিদাস, ভবভূতিও অনেক দূরে। মধুসূদন, হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র তাহাতেও তৃপ্তি হইল না। চুপ করিয়া রহিলাম। এমন সময়ে গঙ্গাবক্ষ হইতে সঙ্গীতধ্বনি শুনা গেল। জেলে জাল বাহিতে বাহিতে গাহিতেছে —

'সাধো আছে মা মনে
দুর্গা বলে প্রাণ ত্যজিব
জাহ্নবী জীবনে'

তখন প্রাণ জুড়াইল — মনের সুর মিলিল — বাঙ্গালা ভাষায় বাঙ্গালীর মনের আশা শুনিতে পাইলাম — এ জাহ্নবী জীবনে দুর্গা বলিয়া প্রাণ ত্যজিবারই বটে, তাহা বুঝিলাম। যখন সেই শোভাময়ী জাহ্নবী, সেই সৌন্দর্যময় জগৎ, সকলই আপনার বলিয়া বোধ হইল - এতক্ষণ পরের বলিয়া বোধ হইতেছিল।" — বাস্তবিক বাঙ্গলা ভাষায় বাঙ্গালীর প্রাণের সুর, মনের আশা, হৃদয়ের ভাব শুনিতে হইলে শাক্ত সঙ্গীতের মত আর কিছু আছে কিনা জানি না। মা-গঙ্গার পলিমাটি স্তরে স্তরে সাজাইয়া বাঙ্গালা দেশ হইয়াছেও যেন মাতৃস্নেহ স্তর বিন্যস্থ হইয়া এই দেশকে জাগাইয়া তুলিয়াছে। সেই মায়ের গড়া দেশে মায়ের ছেলেরা যুগে যুগে সাধনার প্রভাবে মাতৃ নাম কত রকমে উচ্চারণ করিয়াছে, মায়ের লীলা কেমন অনন্ত মাধুরী মাখাইয়া প্রচার করিয়াছে, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। বাঙ্গালার পাঠকবর্গকে সেই অনির্ব্বচনীয় মাধুরী মাখা গানের কথাঞ্চিৎ পরিচয় প্রদান উদ্দেশ্যে এই গ্রন্থ সঙ্কলিত হইল।

বৈষ্ণব সঙ্গীতের সঙ্কলন বা সঞ্চয়ন গ্রন্থ এদেশে অনেক কাল হইতে অনেকেই রচনা করিয়া আসিতেছেন, কিন্তু শাক্ত সঙ্গীতকে ভাব হিসাবে শ্রেণী

বিভাগে সাজাইয়া কোনও গ্রন্থ প্রকাশের চেষ্টা এ পর্যন্ত কেহ করিয়াছে বলিয়া আমার জানা নাই। এ গ্রন্থখানি সেইরূপ চেষ্টারই ফল।

শ্রী অমরেন্দ্রনাথ রায়
ভূমিকা, শাক্ত পদাবলী, ১৩৪৯

বাংলাদেশের সাধনার কথা বলিতে গেলে বাংলাদেশের বাউলদের কথা বলিতেই হইবে। বাউল সাধকেরা বাংলাদেশের মর্মের কথা বলিয়াছেন। মধ্যযুগের ভারতীয় সন্ত বলে। দীর্ঘকাল কাজ করিয়া দেখিলাম এই সন্তমত ও বাউলমত অনেকটা একই। উভয়েরই সাধনীয় 'সহজ' উভয়েরই পথ 'মধ্য পন্থা' উভয়েই শাস্ত্রভার হইতে মুক্ত, উভয়েরই লক্ষ্য আপনার কায়ার মধ্যে, দেহের মধ্যেই তাহাদের বিশ্ব, জাতি ও সমাজের বন্ধন উভয়ের কাছেই অর্থহীন। তাহাদের সবকিছুই মানবের মধ্যে কাজেই তাঁহাদের উভযের ধর্মকেই মানবধর্মও বলা চলে।

ভারতের ধর্ম সাধনার কথা মনে হইলে প্রথমে অবশ্য শাস্ত্রাশ্রিত ধর্ম সাধনার কথাই মনে আসে। তাহার রচয়িতা ও স্থপয়িতাদের মধ্যে বড় বড় অভিজাত বিদ্যান ও পন্ডিত জনের অভাব নাই। তাহার পরে আসে বাউল প্রভৃতিদের কথা। এই সন্তমত বা বাউলিয়া মতে সব গুরুরাই প্রায় হীনবংশ জাতি নিরক্ষর। অথচ এই ধর্মের ভাব ঐশ্বর্য দেখিলে বিস্মিত হইতে হয়। শাস্ত্র ও লোকাচারের ভার মুক্ত এই সব সাধকদের তুলনা নাই।

এই সন্ত ও বাউলিয়াদের মধ্যে আর একটা ঐতিহাসিক যোগও আছে। এই উভয় মতেরই উদ্ভব বৈদিক আর্যভূমির বাহিরে ভারতবর্ষের পূর্ব-উত্তর সীমান্তে। এই প্রদেশেই একদিন বেদ বিরুদ্ধ জৈন ও বৌদ্ধ মতের জন্ম হইয়াছিল, হয়তো শৈব নাগ যোগ বৌদ্ধ সহজিয়া মত ধর্ম উপাসনা শক্তি পূজা প্রভৃতি অবৈদিক মতের ও মুখ্য স্থানও আদি এই প্রদেশেই। বৈদিক ভূমির মধ্যে এইসব মতবাদীদের তেমন বসবাস ছিল না। পরে মধ্যযুগে কবীর প্রভৃতির মতবাদও ভারতের পূর্ব-উত্তর অবৈদিক এই দেশ ঘেসিয়াই উদ্ভূত হইল।

কবীরের জন্ম কাশীতে, অর্থাৎ 'পুরবিয়া' হিন্দী ভাষীদের দেশ। তাহার পর কবীরের মতামত গেল আরও পূর্ব ভারতের দিকে। 'ধনৌতি' প্রভৃতি যে সব মঠে তাঁহার বাণী বহুদিন রক্ষিত ছিল তাহাও একেবারে পূর্বদেশ ঘেঁষিয়া উড়িষ্যা-মধ্যে দেশের একপাশে।

কবীরের নামে চলিত — 'আদিমঙ্গল' বাংলাদেশের 'মঙ্গলকাব্যের' কথা মনে জাগায়, যদিও তাহা অনেক পরে লেখা। তাহাতে যেসব নাথমত, যোগমত

ও ধর্মমতের কথা আছে — তাহাই বাউল ধর্মের প্রাণবস্তু। কাজেই আর্যভূমি যখন শাস্ত্রবিহিত ধর্ম লইয়া প্রতিষ্ঠিত ছিল তখন আর্যভূমির বাহিরে এই অনার্য মগধ বঙ্গের অশুচি ভূমিতে সন্ত বাউলিয়াদের এই শাস্ত্রভার মুক্ত মানবধর্মই সকল দীন হীনের অধ্যাত্ম চিন্তাকে জাগ্রত রাখিয়াছিল। এইসব নিরক্ষর দীনহীনের কথা বহুকাল ভারতের কোনো বড় পণ্ডিতজনের লেখায় আত্মপ্রকাশ করিতে পারে নাই। ...

... কবিগুরু জগতের শ্রেষ্ঠ বিদ্বৎ সমাজের আহ্বানে দুই বারই এই নিরক্ষরদের কথা বলায় বিস্মিত হইলাম। আমাদের সাহসও ইহাতে বাড়িয়া গেল ...

... বাউলদের সাধনায় আর এক অঙ্গ হইল 'জ্যান্তে মরা' সূফীদের মধ্যে ও ঐজন্য 'দিব্‌না' (পাগল) নাম লইয়া একদল সাধক মুসলমান শাস্ত্রের প্রচণ্ড দাবি এড়াইয়াছেন। তাহাদের মধ্যেও ফিলা-ফনা- বা জ্যান্তে মরা আছে। হয় নিজেদের পাগল বলিয়া নয় তো বা মৃত বলিয়া তাহারা সমাজের সব বাঁধন অস্বীকার করিয়াছে...

... ঋগ্‌বেদ সাম্‌বেদ উভয়েরই এক কথা —

মোষু ব্রহ্মেব তন্ত্রযুর্ভুব।। ঋ. ৮.৯২.৩০
সাম. ২.১৭৬

প্রেমের চেতনাই আসল জাগরণ। কর্মকান্ড তো গতানুগতিকতা মাত্র। তাহা ঘুমন্ত লোকের চেষ্টিত। ঋগবেদ ও সামবেদ এখানে বাউলদের মর্মকথাই বলিতে লাগিলেন।

পুরুষসূক্ত হইল বাউলদের মূলমন্ত্র। ...

... বাউলিয়া মতের গৌরখনাথী ধাঁধা যজুর্বেদেও বিস্তর আছে ...

... এইবার আসা যাউক অথর্ববেদে। ইহাতেই বাউলিয়া মতের অজস্র ধারার মূল উৎস ও ভান্ডাগারের পরিচয় পাই। ...

... উপনিষদের লক্ষ হইল মুক্তি, স্বর্গ নহে। সত্যই ইহা মুক্তির আলাক দেখাইল। এই উপনিষৎ যে শুধু মানবকে ধর্মবিষয়েই আলোক ও আধ্যাত্ম সত্য ছিল তাহা নহে। সামাজিক ও ব্যক্তিগত সকল দিকেও ইহা দীর্ঘকাল সঞ্চিত পুরাতন নানা বাধাবন্ধন ঘুচাইয়া দিল। বাউলতত্ত্বের মত উপনিষদের সত্য ও সর্বভাবে জাতি, পঙ্‌ক্তি প্রভৃতি নানা বন্ধ সংস্কার ভাঙিতে প্রবৃত্ত হইল। ...

... মহাভারতের বাউলিয়া বহু তত্ত্ব আছে। ...

... বাউলদের সেরা কথা মৈত্রেয় উপনিষদে, দেহই তোমার দেবালয়, তাহাতে যে জীব তিনিই তো শিব

দেহো দেবলয়ঃ প্রোক্তঃ স জীবঃ কেবলঃ শিবঃ।।

কাজেই বাহ্য ও বৈদিক কর্মকান্ড হইতে মানুষের অন্তরের ভাব ও চরিত্রই যে বড় কথা পরবর্তী বাউলদের ও বহু পূর্বে ইঁহারা জোর করিয়া শুনাইয়া দিলেন। ...

... উপনিষৎ ও তন্ত্রাদির পর বেদবাহ্য ধর্মগুলির মত দেখা যাইতে পারে। তাহাদের মধ্যে জৈন ও বৌদ্ধ মতে ওতো মানুষই সার তত্ত্ব জাতি পংক্তি প্রভৃতির বিচার মিথ্যা মাত্র। সাধনার মধ্যপন্থাই সার সাধনা। মানবীয় চরিত্রের মহত্ত্বই যথার্থ মহত্ত্ব। মানুষের মত মানুষের সেবা করিতে পারিলে দেবতারাও ধন্য হন। কাজেই জৈন-বৌদ্ধ মতের ও বাউল মতের মিল না দেখাইলেও চলে। পুরাণের অনেক স্থলেই 'বাউলিয়া' তত্ত্ব দেখা যায়। জাত-পংক্তি অগ্রাহ্য করা এইসব কথা কোনো কোনো পুরাণেও বর্ণিত হইয়াছে।

এইসব বৌদ্ধ ও জৈন দোহার আগে হইতেই গোরক্ষনাথের যোগ ও নানা নাথপন্থীদের উপদেশ চলিতে আরম্ভ করে, নাথপন্থা বিষয়ে আমার সহযোগী শ্রীমান হাজারী প্রসাদ ত্রিবেদী বহু কাজ করিয়াছেন। তাহার গ্রন্থেও দেখা যাইবে বাউলিয়া মতের প্রায় সবই সেখানে আছে। ...

... মুসলমানদের আসার পরে ভারতীয় চিন্তার মধ্যে এবং ধর্ম সাধনার মধ্যে বড় একটা সংস্পর্শ ঘটিল। পাশাপাশি থাকিলেও হিন্দু-মুসলমান দুই দলেরই পণ্ডিতেরা দেখিলেন চেষ্টা করিয়া কিছুতেই দুই ধারাকে মিলাইতে পারিলেন না। তখন নিরক্ষর সাধকের দলই উভয় সাধনার মান রক্ষা করিলেন। ...

... রামানন্দের মধ্যেই বাউলিয়া তত্ত্বের সারমর্ম পাই। তিনি দেখাইলেন বাহ্য আচারই হিন্দু-মুসলমান সাধনার মিলনের বাধা। ভক্তিতে প্রেমেও সবাই মিলিতে পারে। ...

... আর্যদের চেয়ে দ্রাবিড়দের মধ্যে প্রেম ভক্তি ছিল বেশী করিয়া। তাই বলা যায় এতদিন প্রেম ভক্তি ছিল ভারতের দক্ষিণ দেশে উত্তর ভারতে ছিল ব্রহ্ম জ্ঞান, যুক্তিবিচার ও কর্ম, এতদিনে রামানন্দ সেই দক্ষিণের প্রেমভক্তি উত্তরে আনিলেন। সঙ্গে সঙ্গে তিনি উত্তর-পূর্ব ভারতের বঙ্গ মগধের স্বাধীন চিন্তাও নিলেন ইহাতে এক মহাসাধনার সঙ্গম ঘটিল। এই সঙ্গমের ফল কবীর সর্বত্র ছড়াইলেন —

ভক্তি দ্রাবিড় উপজীলয়ে রামানন্দ
প্রগট কিয়ো কবীরণে সপ্তদীপ লৌখণ্ড

... বাউলিয়া মতের সব কথাই কবীরের মধ্যে পাওয়া যায় ...

... সন্তদের সঙ্গে বাউলদের ভাবের মিলের বিষয়ে লিখিতে গেলে শেষ নাই। ...

কিন্তু চার চন্দ্র ভেদও কায়িক ব্যাপার। তাহা হইতেও উচ্চতর ভাব সাধনওয়ালা বাউল আছেন ... বাউলদের বাহিরেও বাউলিয়া মতের বহু লোক এবং সাধনা আছে। তাঁহাদের বাণীতে, গানে ও রচনায় তার দেখা পাওয়া যায়। আবার বাউলদের মধ্যেও অবাউল আছে। বাউল ভাব হইল অন্তরের সত্য, বাহিরের এই ভাগ-বিভাগে ইহার পরিচয় দেওয়া চলে না ...

... বাউলিয়া প্রেমতত্ত্বের পরিচয় দিতে গেলেও এক বাউল সাধু বলিয়াছিলেন, "এইসব ব্যাকরণ ও পরখ হইল বাহ্যপন্থীদের, আমাদের ক্ষেত্রে ইহা চলিবে কেন? তিনি তাই গান করিয়াছিলেন —

ফুলের বনে কে ঢুকেছে রে সোনার জহরী
নিকষে ঘষয়ে কমল আ মরি মরি

মিশনারীরা যেমন ভারতীয় ধর্মের ঠিক পরিচয় বুঝেনও নাই এবং দিতেও পারেন নাই। তেমনি গ্রন্থাশ্রয়ী পণ্ডিতদের দল ঠিক বাউলিয়া ভাব ও মর্ম ধরিতেও পারেন নাই, এবং তার পরিচয়ও দিতে পারেন নাই, যাহারা নির্গ্রন্থ তাঁহাদের পরিচয় গ্রন্থে কেমন করিয়া মিলিবে? ঝুটা বাউলেরাই নিজেদের পরিচয় গ্রন্থে রাখিয়া গিয়াছিলেন। ...

... প্রচারের জন্য বাউলদের কোন আগ্রহ নাই। তাহার কিছু কারণ পূর্বেই বলা হইয়াছে। এইসব পদ সাধনার জন্য, সাহিত্যের জন্য নয়। সাহিত্য অর্থেই পুরাতন সব সংগ্রহ, এই সংগ্রহের উৎসাহ বাউলদের নাই। বাউলেরা পুরাতনের সংগ্রহ পুঁথির চেয়ে নতুন জীবন্তকে বিশ্বাস করেন। তাই তাঁহার শাস্ত্রাদির সংগ্রহকে মান্য করেন না।

ক্ষিতিমোহন সেন
বাংলার বাউল, লীলা বক্তৃতা
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৮৪৯

প্রথম জীবনের সশ্রদ্ধ আকর্ষণ ও পল্লী সাহিত্য প্রীতির ফলে পরবর্তী জীবনে সাধারণ দৃষ্টিতে অস্বাভাবিক এবং সামাজিক বোধে অসামাজিক, বাংলার এই অদ্ভুত ধর্ম সম্প্রদায়ের নিজস্ব ভাবধারা ও তাহার গূঢ় ধর্ম জীবনের পরিচয় গ্রহ-

করিবার জন্য একটা প্রবল কৌতুহল ও অনুসন্ধিৎসা অনুভব করি। তাহারই ফলে শুরু হয় বাউল গান সংগ্রহ ও বাউলদের সঙ্গে অন্তরঙ্গভাবে মেলামেশা।

খ্রীষ্টীয় ১৯৩৭ সাল হইতে আরম্ভ হয় গান সংগ্রহ ও বাউলদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনার পালা। প্রথম কুষ্ঠিয়া অঞ্চল তারপর যশোহর, ফরিদপুর, পাবনা, রাজশাহী প্রভৃতি জেলার মধ্যে বিস্তৃত হয় এই কার্যের পরিধি। এই প্রচেষ্টার সর্বাঙ্গীণ সাফল্যর জন্য ১৯৪০ সালে কবি-তীর্থ শিলাইদহ পল্লীতে 'নিখিল বঙ্গ পল্লী সাহিত্য সম্মেলন' নামে এক সাহিত্য সম্মেলনের আয়োজন করা হয়। এই সম্মেলনে পার্শ্ববর্তী ছয়-সাতটি জেলার বাউল-বৈষ্ণব-বৈষ্ণবী ও ফকিরদের আহ্বান করিয়া আনা হয় এবং কয়েক দিন ধরিয়া চলে তাহাদের গান ও তত্ত্বালোচনা। এই সময়ে বাউল গান ও তথ্য সংগ্রহ একটা বিশিষ্ট রূপ লাভ করে। ক্রমে এই কার্যের পরিধি বিস্তৃত হয় পূর্ববঙ্গে বিশেষ করিয়া বিক্রমপুরে।

তারপর হঠাৎ সংঘটিত হইল বাংলার অঙ্গচ্ছেদ। বাঙালী জাতি ও বাঙালী সংস্কৃতির উপর এত বড়ো আঘাত আর কোনদিন আসিয়াছে কিনা সন্দেহ। (বাঙালী জাতির যাহা বৈশিষ্ট্য, তাহা পূর্ব ও পশ্চিম উভয় বঙ্গের সমন্বয়ে গঠিত, বাঙালীর সংস্কৃতি উভয় বঙ্গের মিলিত সংস্কৃতি - হিন্দু ও মুসলমান, 'সংখ্যাগুরু' ও 'সংখ্যালঘু', 'তফশীলী' ও অ'তফশীলী', ছোট ও বড় সমস্ত বাঙালীর সম্মিলনে গঠিত বঙ্গ সংস্কৃতি। বাংলার নিতান্ত নিজস্ব বৈশিষ্ট্য পূর্ণ এই যে বাউল ধর্ম ইহাতে হিন্দু ও মুসলমান একত্রে মিলিয়াছে — মিলিয়াছে বৌদ্ধ, হিন্দু ও সুফীধর্ম। সমগ্র বাঙালী জাতির সংস্কৃতির ঐক্য ইতিহাস বিধাতার চিরন্তর বেদীতে প্রতিষ্ঠিত, কোন দ্বি-জাতিতত্ত্ব বা সাম্রাজ্যবাদী চক্রান্ত ইহাকে পৃথক করিতে পারে না - পারিবে না।)

বঙ্গ বিভাগের পর বাংলার এই বৈশিষ্ট্য পূর্ণ ধর্ম শাখার সাহিত্য রক্ষা ও সাধনার পরিচয় প্রদান আমার জীবনের প্রধান লক্ষ্য হইয়া পড়িল। পাকিস্তান ছাড়িয়া পশ্চিমবঙ্গে এই কয় বৎসর স্বাস্থ্য, অর্থ ও শরীরের ক্লেশ অগ্রাহ্য করিয়া বিভিন্ন জেলার বিভিন্ন স্থানে বাউল গান ও বাউল সাধনা সম্বন্ধে তথ্য সংগ্রহ করিয়া বেড়াইয়াছি। পূর্বের সংগৃহীত ও পরবর্তী সংগ্রহের দেড় হাজার গানের মধ্য হইতে নির্বাচিত পাঁচশতেরও অধিক গান এবং এই ধর্মের তত্ত্ব। দর্শন ও সাধনার বিবরণ সংবলিত এই বিরাট গ্রন্থখানি আজ বাঙালী পাঠকের হাতে তুলিয়া দিয়া আমার দীর্ঘ বিশ বৎসরের সংকল্পিত কার্য শেষ করিলাম।

বাংলার বাউল ও বাউল গান
উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য
প্রথম সংস্করণের ভূমিকা, ১৩৬৪

গত প্রায় কুড়ি বৎসর, বিশেষ করিয়া দেশ বিভাগের পর এই দশ বৎসর, পথে, মাঠে, ঘাটে বাউল বৈষ্ণব ও ফকিরদের পিছনে পিছনে ঘুড়িয়া বেড়াইয়াছি, পল্লীর অভ্যন্তরে পায়ে হাঁটিয়া কখনো কখনো গরুর গাড়ীতে কতো পথ অতিক্রম করিয়াছি। কত বিচিত্র পরিস্থিতির সম্মুখীন হইয়াছি, কতো সাদর অভ্যর্থনায় মুগ্ধ হইয়াছি, কতো আখড়ায় রাত কাটাইয়াছি, আবার কতো বিরূপ, অপমানজনক প্রতিকূলতায় ব্যথিত হইয়াছি — সেই সব আনন্দ বেদনার স্মৃতি আজ মনে ভিড় করিতেছে। আমার নিদারুণ শারীরিক অসুস্থতা, পারিবারিক বিশৃঙ্খলা, প্রেসে নানা কারণে মুদ্রণ কার্যে আড়াই বৎসরব্যাপী বিলম্ব প্রভৃতিতে কতোবার মনে হইয়াছে, এ পুস্তক আর বাহির হইবে না। আজ সে সবই পথের স্মৃতিমাত্র মনে হইতেছে। আজ আমার দেশবাসীর হাতে এত দিনের পরিশ্রমের ফল তুলিয়া দিয়া চিন্তামুক্ত হইলাম।

কেহ কেহ হয়তো বলিতে পারেন বাউল গানের সাহিত্য সম্পদ আর কতটুকু। অনেকে বলিতে পারেন, বাউল সাধনা শিষ্টজন-নিন্দিত ও ধর্মের নামে ইন্দ্রিয় সেবামাত্র। তবুও এই গানগুলি উভয়বঙ্গের প্রায় আড়াই লক্ষ বাঙালীর (১৯৪২ সালের একটা মোটামুটি হিসাব অনুসারে) ধর্মসঙ্গীত; এই ধর্ম মূলতঃ বাংলাদেশের পাল শাসনের চারিশত বৎসর ব্যাপী প্রকাশ্য ও প্রধান ধর্ম ছিল, তাহার পর সমাজের অন্তরালে শ্রেণীবিশেষের মধ্যে আবদ্ধ হইয়া বিংশ শতাব্দীর প্রথম পাদ পর্যন্তও ইহার ক্ষীণ অস্তিত্ব বজায় রাখিয়াছে এবং এখনও একেবারে নিশ্চিহ্ন হইয়া যায় নাই। ইহাকে পছন্দ না করিলে বাংলার সংস্কৃতি ও ধর্মের অংশ হিসাবে ইহার ঐতিহাসিক অস্তিত্বকে কেহ অস্বীকার করিতে পারে না। আমি ব্যক্তিগত মতামতের উর্দ্ধে উঠিয়া ঐতিহাসিক ও সামলোচক দৃষ্টিভঙ্গী লইয়া বাউল ধর্ম ও বাউল গানের যথাযথ পরিচয় দিতে চেষ্টা করিয়াছি। আমরা যেন ভুলিয়া না যাই যে, এই বাউল ধর্ম ও বাউল গানগুলি বাংলার ধর্ম ও সংস্কৃতির একটি ঐতিহাসিক দলিল।

নানা সামাজিক ও অর্থনৈতিক কারণে এই ধর্ম সম্প্রদায় দ্রুত বিলুপ্তির পথে চলিয়াছে। পূর্ব ও পশ্চিমবঙ্গের বিরাট ফকির সম্প্রদায় ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইয়া নিশ্চিহ্ন হইবার মুখে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে, বৈষ্ণব বাউলের সংখ্যা অত্যন্ত কমিয়া গিয়াছে এবং দিন দিন তাহাদের সংখ্যা হ্রাস পাইতেছে। উভয় বঙ্গে তাহাদের অবস্থা অনেক বৎসর ধরিয়া যাহা লক্ষ্য করিতেছি, তাহাতে আশঙ্কা হয়। আগামী পঁচিশ বৎসরে ইহাদের আর কোন অস্তিত্ব থাকবে না। তাই সর্বধ্বংসী কালের হাত হইতে এই ধর্ম সম্প্রদায়ের ভাবধারার নিদর্শন এই

গানগুলি এবং এই ধর্মের তত্ত্ব, দর্শন ও সাধনা সংক্রান্ত মোটামুটি একটা বিবরণ সংগ্রহ করিয়া রাখিয়া গেলাম ভাবীকালের বাঙালী অনুসন্ধিৎসুদের জন্য। যদি ইহার কোন প্রয়োজন উপলব্ধি না হয়, তবে ইহাও এই সম্প্রদায়ের মতো অতীতের বিস্মৃতির তলে সমাহিত হইয়া যাইবে, কাহারো কিছু বলিবার থাকিবে না।

উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য
বাংলার বাউল ও বাউল গান
প্রথম সংস্কারের ভূমিকা, ১৩৬৪

বাউলদের তত্ত্ব ও দর্শন সম্বন্ধে লিখিত বিশেষ কোন সন্দর্ভ নেই, সাধন পদ্ধতির ও স্বতন্ত্রবাবে লিপিবদ্ধ কোন বিবরণ নাই। গানেই তাহাদের ধর্ম তত্ত্ব দর্শন ও ক্রিয়াপদ্ধতি ব্যক্ত হইয়াছে। গানই তাদের আত্মপ্রকাশের একমাত্র মাধ্যম। ...

... আত্মারূপী আল্লা বা অধর কালাকে উপলব্ধি করিতে হইলে যে সাধন পদ্ধতি প্রয়োজন, তাহাতে হিন্দু ও মুসলমান উভয় জাতির সাধকই এক প্রথাবলম্বী। প্রকৃতি-পুরুষের মিথুন তত্ত্বের মধ্যে দিয়াই তাহাদের সাধনা। ...

... সুফীদের সাধনা ও বাউলদের সাধনার মধ্যে মূল পার্থক্য বর্তমান। সুফীদের সাধনা মানুষ ও ভগবানের মধ্যে প্রেমের সাধনা প্রেমের তীব্রতায় পরমাত্মা ও জীবাত্মার এক প্রকার অভেদ জ্ঞানই তাহাদের সাধনার মূলভিত্তি। ইহা জ্ঞানমূলক ও বিশেষভাবে অনুভূতিমূলক সাধনা অনুভূতি ও আবেগের তীব্রতায় কানা অবস্থা প্রাপ্তির সাধনা এবং ইহা বিশেষ ক্রিয়ামূলক নয়। বাউলদের সাধনা নির্দিষ্ট যোগমূলক ক্রিয়া। প্রকৃতি-পুরুষের মিলনের মধ্যে দিয়া নিজের আনন্দস্বরূপের উপলব্ধির সাধনা। ... সুতরাং মূল সাধন তত্ত্বে বাউল ও সুফীদের প্রভেদ বর্তমান ... আমাদের কল্পনায় বাউল নামে এক অদ্ভুত জীব বাস করে এবং এই কল্পনার উপর নির্ভর করিয়াই এতদিন তাহাদের বর্ণনায় বেশ খানিকটা রঙ চড়ানো হইয়াছে। ...

... ভগবৎ ভক্তিমূলক বা বৈরাগ্যসূচক বা হিন্দু-দর্শনের দুই একটি তত্ত্বমূলক গানের ভাষা সহজ ও প্রচলিত বাউল গানের মতো এবং সুর পল্লী গানের সুরের মতো হইলেই তাহা বাউল গান হয় না। ইহা একটি নির্দিষ্ট ধর্ম মতের সাধন বিষয়ক গান। সাধকগণের দ্বারা রচিত নিজেদের ধর্মতত্ত্ব, জ্ঞান ও অভিজ্ঞতাপূর্ণ গানই প্রকৃত বাউল গান। ...

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ... তিনিই প্রথম লালন ফকিরের কতকগুলি গান তথাকথিত শিক্ষিত সমাজে প্রচার করেন। কিন্তু খুব সম্ভব তাহাদের বিশিষ্ট ধর্মমতের জন্য তিনি সেগুলি সংগ্রহ করেন নাই। পল্লী সাহিত্যের উচ্চভাব সমৃদ্ধ নিদর্শন হিসাবেই সেগুলি সংগ্রহ করিয়াছিলেন।

উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য
বাংলার বাউল ও বাউল গান, ১৩৬৪

The Folk Music and Folklore Research Institute, Calcutta, came into being only three years back. The awareness of an impending crisis in folk music impelled us to form this institute. This crisis in folk music has set in the form of its gross commercial distortion and consequent falsification.

A folk melody is not merely a literary or a musical work, but a product of the continuous process of life of a people. Folk tunes grow and develop in this process. Songs, ballads and lore graing out of new experiences are constantly enriching the folk tradition.

It is unfortunate that folk music and folklore as yet has remained just a branch of special study for a handful of academicians or enthusiasts. Moreover, in our country, studies in folk music till now have been primarily limited to the spheres of sociology and literatures; but almost nothing has been done so for to study the musicological characteristics that distinguish folk songs of one region from those of another. Our primary emphasis in this volume has been on the musicological aspects of folk music.

Foreward
Flok Music and Folklore
An Anthology, Vol. 1
October 1, 1967

A purely academic and conservative approach to folksongs often overlooks and even ignores one of its most human aspects - the 'protest songs' which express invaried forms the struggle of our oppressed people through the ages against an unjust social order. These 'protest songs' can be classified into two categories – socio-economil and political : the former

being against the feudal order with its caste system and economic exploitation, women's bondage and numerous other taboos, the later being mainly products of our national movement and peasant rebellion against the British Rule ...

Our folk singers and researches very often do not see the social content of the songs of the former category, behind their religious and spiritual trappings and in assessing the songs of the latter category some of them appear to have developed an antipathy and even refuse to accept them as folksongs considering them as songs composed by politically motivated individual going off the time worn track of tradition.

... In a broader sense a good number of our love songs, marriage songs or songs known as 'Baramashya' 'Birha' or 'Dehotattva' etc express in an indirect way a protest against the prevalent social system ..... The heartless marriage system, the agonies of an unhappy marriage, the bondage of women, persecution by the mother-in-law or the husband, all these from the understone of what is known as lovesongs ...

... In Bhatiali which constitutes the main melodic pattern of East Bengal, very often the ward 'naior' – going of the housewife from the father-in-law's house to her paternal home strikes a keynote of the whole gamut of emotion of our rural womanhood.

... Even in the impersonal abstraction of love in the form of Radhakrishna story behind the cover of religiosity one cannot fail to discover the protest against a society where free love is banned ...

... In Baramashi song prevalent in many parts of India, the separation between husband and wife is dolefully related through the description of the twelve months. The separation is caused mainly by economic reason. Struck by poverty the husband has to go out for his livelihood, the nature of the job sometimes keep the husband and wife apart for a long time. This constitutes the common theme in the buffalo boy songs of North Bengal or the Mahut songs of Goalpara in Assam, both belonging to the same plaintive melodic pattern known as Bhawaiya.

... The cleavage between the huts and the castles became sharper and sharper and our folk poets ground down by a colonial economy gave vent to the feelings of our toiling masses, often in a veiled figurative language with a double meaning ...

... The truth remains the allegory is taken from life itself, describing the conditions of our exploited peasartry under the Zamindary system.

Hemango Biswas
Glorious Heritae,
Folk Music an Folklore
An Anthology, Vol. I, 1967

As literary scholars or enthusiasts have taken the lead in folklore study in Bengal most of them are not prepared to expand their idea and conception of folklore much beyond folk literature.

Shankar Sengupta
Folk Music an Folklore
An Anthology, Vol. I, 1967

We find folk songs of Bengal reflecting both the spiritual as well as the emotions of the common Bengalee and the Baul songs symbolize exclusively the spiritual quests of a section of her rural people. Herein lies the significance of these songs and their importance in the cultural life of rural Bengal ... If the common man is not exclusively interested with the spiritual life, neithre is he interested only with material life ... So it would not be correct to exclude a song from the rank of folk songs simply because its theme is spiritual ... Baul is not tied down by the usual vital strings of the society. Although he lives in society yet he tries to remain detached from its vital demands and desires because he considers these to be stumbling block in his path ... He is hated by a section of our society especially by that part which is guided by the Brahminical priesthood – This is not very surprising. Because of their class content the Bauls like other sections of the so-called lower casts of Bengal, have grown out of the resultant

impact of various types of cultural and Religious modes that emerged through the fusion of various castes and tribes. They have never been swayed away by the exclusive influence of the so called upper casts alone. Hence the later refuse to accept them within their field. The Baul is therefore treated as an untouchable and his religious practices are decried ... But social ostracism has not succeeded in distracting him from his path which he follows with singular devotion. ... It is unfortunate that this sect is dying out. Perhaps from the point of view of material progress of the society at large, this is inevitable. But it has to be admitted with the passing away of this sect, Bengal will be losing one of her richest forms of folk songs. The decay has already set in and most of the Bauls that we see today, looking out for a professional musical programme here and there in the city or who are introduced to the city musical circles or conferences by the 'cultural bosses' are fake representatives of the sect. Having lost their faith in their own creed having forgotten their basic spiritual aim they now demonstrate their songs with a mere professional and mechanical attitude. The songs which now frequently pass as Baul songs lack both the true spirit and genuine folk tonal qualities ... The Bauls themselves are mainly interested in earning money maintaining their popularity among the urban middle class intelligentsia. As a matter of fact most of the Baul songs that we hear today (especially in the urban sector) may be termed as only one form of the modern versions of the so called 'Palli-Geeti' or folk songs which are being patronized by the official and non-official cultural societies with a view to uphold to the cultural tradition of our country.

Sanat Kumar Bose
Bauls of Bengal
Folk Music an Folklore
An Anthology, Vol. I, 1967

The question arises whether and to what extent Baul melodies might be reflections of the Religious thoughts of the Bauls; and the purpose of the essay is to throw light on possible interconnection between the musical structure of the

songs and the religious context of their text ... Baul text adheres to a particular performed melodic type. So the prolongation of words or syllables occur to meet out such a melody pattern ... syllables are generally prolonged on peak notes of melody and the assumption is likely that there is a strong relationship between melodic structure and textual content prolonged words are those which are of special significance ... when the picture grows more colourful the Baul voice rises to the peak of melody ... With each new poetic image the voice goes up to the octave and returns into the lower fifth when the refrain is performed ... There are considerable parallels between musical and philosophical principles ... It has been stated earlier that the Baul is incessantly on the way to his true inner self and his song tells about his journey in search of becoming one with God with 'the man of the heart'. This way, however, is not an easy one, it is full of obstacles and disappointments but also joy and progress and is it not this thorny path towards realization which is reflected in the simple melodies of the Baul songs; sometimes undoubtedly developing, 'then moving straight forward in fixed rhythms' again thoughtfully hesitating in recitative - like sections; but always characterized by the presence of deep underlying devotion. Moreover the Bauls have realized that one of the major principles to reach their ultimate aim of spiritual union with the supreme lies in the reversal of the current and the downward movement of the melodies, which is basic to the baul gana seems to reflect this principle ... The reverse principal of Baul downward elaboration and sustained descendence of melody is valid for North Indian Classical music, where in the alaps the notes are successively introduced and developed in ascending direction, followed by a rapid descent after the climax i.e. the upper tonic has been reached.

Josef Kuekertz
Origin and Construction of The
Melodies in Baul Song
Year Book of the International
Folk Music Council, 1975

আমি সংগীতের লোক নই সাহিত্যের লোক, কিন্তু লোকসংগীতের কথাগুলি সাহিত্যের অধিকারভুক্ত সুতরাং আমি লোকসঙ্গীতের অধিকারী। সাহিত্য কখনো সম্পূর্ণতা পেতে পারে না যদি লোকসাহিত্য তার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়, সেই জন্য আমি লোকসাহিত্য তথা লোকসঙ্গীতের অনুরাগী। বিদ্যা নয় সাক্ষাৎ উপলব্ধিই তাদের সম্বল ও সম্পদ তাদের সেই উপলব্ধির মধ্যে উচ্চাঙ্গের উপলব্ধিও পড়ে। তা না হলে লালন ফকিরের গান এত গভীর ভাবের হোত না ...

... ক্ষিতিমোহন সেন এর কাছে অসংখ্য বাউল গান আছে কিন্তু প্রকাশ করছেন না কারণ কি জিজ্ঞেস করায় বললেন, 'মানা আছে, এ সব গান যাদের রচনা তারা সাহিত্যিক নন, সাধক, তাঁরা গোপনেই থাকতে চান। প্রকাশ্যে আসতে চান না, তাতে তাঁদের সাধনার ক্ষতি হয় ...'' ... রচনা লিপিবদ্ধ না হলে ভয় শুধু লোপ পাবারই নয় বরং লোকমুখে বিকৃত হওয়ার। ... ইতিমধ্যে ড: আশুতোষ ভট্টাচার্য ও তার শিষ্যরা এ কাজে ব্রতী হয়েছেন। সংগ্রহের ও প্রকাশের প্রয়াস বহুদূর অগ্রসর হয়েছে। এতে যোগ দিয়েছেন স্বনামধন্য বাউল পূর্ণ চন্দ্র দাস দেখা যাচ্ছে বাউলদের সাধনার বিঘ্ন ঘটার আশঙ্কার চেয়ে তাদের বাণী ঘরে ঘরে পৌঁছে দেওয়ার তাগিদটাই আরো জোরদার ... লোকগীতিকা লোককাহিনী, ছড়া, রচনা, প্রবন্ধ প্রভৃতির ব্যাপক অনুসন্ধান ও উদ্ধার দিন দিন আরো জরুরী হয়ে উঠেছে। এর একটি কারণ এগুলির সম্ভবপর বিলোপ। লিখে না রাখলে, টেপ রেকর্ড না করলে কেবল মুখে মুখে এগুলি আর কতকাল চলিত থাকবে বা অবিকৃত থাকবে। দ্বিতীয় কারণ হচ্ছে লোকসাহিত্য তথা লোকসংগীতের প্রবহমান ঐতিহ্য যে আর কতকাল বহতা থাকবে সেটাও অনিশ্চিত। স্রষ্টা যারা তারা যদি গ্রাম ছেড়ে শহরে শহরে চলে আসে আখড়া বা আস্তানাগুলো যদি লোকাভাবে লুপ্ত বা অর্থাভাবে ধ্বংস হয়, বাউলকে বা বৈষ্ণবীকে ভিক্ষা দেবার জন্য যদি কেউ না থাকে তা হলে মঙ্গলকাব্য যেমন আর রচিত হচ্ছে না লোকসাহিত্য বা লোকসঙ্গীতও আর মুখে মুখে তৈরী হয়ে উঠবে না। চাহিদা থাকলে যোগানও থাকবে। কিন্তু সেটা হবে কৃত্রিম বাউল গীতিকা বা কৃত্রিম ভাটিয়ালি গান। আজকাল আমরা যা সাধারণত শুনতে পাই তাতে কৃত্রিমের ভাগই বেশী। তার চেয়ে ভালো অকৃত্রিমের সন্ধান ও সংরক্ষণ।

অন্নদাশঙ্কর রায়

লালন ও তার গান, ১৯৭৪

শ্রেণী সমাজে দারিদ্রের গর্ভেই লোকসঙ্গীতের জন্ম। অন্যান্য দেশে যেমন আমাদের দেশেও দারিদ্র, শোষণ ও শাসন ছিল এবং আছে। কিন্তু সমাজ বিকাশে ভারতের একটা বিশেষ প্রকৃতি ছিল, যেজন্য তার ভাবাদর্শে ভাববাদের প্রাধান্য ভারতের শোষিত সমাজের লোকায়ত দৃষ্টিকে অনেকখানি আচ্ছন্ন করতে সমর্থ হয়েছিল। এ বিষয়ে ঐতিহাসিক বস্তুবাদের বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে অধ্যাপক দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় তাঁর মূল্যবান গ্রন্থ 'লোকায়ত'-তে বিশদ আলোচনায় বিশ্লেষণের চেষ্টা করেছেন। ভারতীয় চিন্তার দুটি পরস্পর বিপরীত ধারা সম্বন্ধে বলতে গিয়ে তিনি লিখেছেন, 'ভারতীয় সংস্কৃতির ক্ষেত্রে যেন দুটি স্পষ্ট ধারা স্বতন্ত্রভাবে প্রবাহিত হতে দেখা যায়। একদিকে আধ্যাত্মবাদের মহিমামুখর শাসকশ্রেণীর সংস্কৃতি। অপরদিকে প্রাক্-আধ্যাত্মবাদের এবং অতএব প্রাক্ বিভক্ত পর্যায়ের স্মারক বহুল গণসংস্কৃতি। দ্বিতীয়টি লোকেষু আয়ত এবং সেই অর্থে লোকায়ত।' লোকসংস্কৃতির দ্বিতীয় ধারাটিরই অন্তর্গত গণসংস্কৃতির নামান্তর হিসাবে লোকায়ত শব্দটি ব্রাহ্মণ্যনীতির প্রচারকদের কাছে গালগালাজের সামিল হয়ে দাঁড়িয়েছিল। লোকায়ত দর্শন ও চিন্তাকে অবদমন করার জন্য যে সংঘবদ্ধ প্রচার পুরাণকারেরা করেছিলেন এবং কঠিন সন্ত্রাসী বিধানের ব্যবস্থা দিয়েছিলেন তা আমাদের দৃষ্টিকোণে না রাখলে আমরা আজ আমাদের দেশের লোকসংস্কৃতির ঐতিহাসিক বিশ্লেষণে ব্যর্থ হব। ...

যে অতীত গ্রাম সমবায়গুলি একদিন ছিল লোকশক্তির ঘাঁটি, উৎপাদন পদ্ধতির কোনো মৌলিক পরিবর্তন না হওয়াতে ক্রমশ তার প্রগতি সম্পূর্ণ রুদ্ধ হয়ে যায় এবং শাসকশ্রেণীর প্রতিক্রিয়াশীল ব্রাহ্মণ্যবাদের প্রভাবে আচ্ছন্ন হতে থাকে। এই অচলায়তন গ্রাম্যসমাজেরই বনিয়াদের উপর ভাবগত উপরিসৌধে নানাপ্রকারের জীবন বিরোধী তত্ত্ব ও চিন্তা দানা বেঁধেছিল। আমাদের লোকসঙ্গীতেও তার দীর্ঘস্থায়ী প্রভাব লক্ষ করা যায়।

... বিদেশী শাসক ও তার দেশীয় ম্যুৎসুদ্দির বিরুদ্ধে বিদ্রোহী জনশক্তি বারে বারে পরাজিত হয়েও বারে বারে আত্মপ্রকাশ করেছে। শ্রী সুপ্রকাশ রায় তাঁর ''ভারতের কৃষক বিদ্রোহ ও গণতান্ত্রিক সংগ্রাম'' নামক অমূল্য গ্রন্থে অসংখ্য কৃষক অভ্যুত্থানের বীরগাঁথা লিপিবদ্ধ করেছেন। তার সাথে সাথে জনসাধারণের নতুন মূল্যবোধ, নতুন গণ ধর্ম প্রভৃতির ইতিহাসও আমরা পাই। কিন্তু প্রশ্ন জাগে, লোকসংগীতে তার প্রতিধ্বনি সেরকম আমরা পাই না কেন? ভাবজগতে আধ্যাত্মবাদের অপ্রতিহত ক্ষমতাই কি তার একমাত্র কারণ? তাছাড়াও অন্য প্রশ্ন

মনে জাগে। তা হল আমাদের জনগণ সৃষ্ট বীররা যেমন ইংরেজি শিক্ষায় শিক্ষিত ঐতিহাসিকদের ইতিহাসের পাতায় ছিল চিরদিন বিস্মৃত ও অবজ্ঞাত, তেমনি আমাদের লোকসংস্কৃতির বৈপ্লবিক ঐতিহ্যের পথে ছড়ানো আদিম রুক্ষ গ্র্যানাইট পাথরগুলি আমাদের পল্লী সংস্কৃতির ভিজেমাটির গবেষকরা ও সংগ্রাহকরা কোনোদিন আদর করে কুড়িয়ে ঝোলায় ভরতে রাজি হননি। এঁদের মধ্যে অনেকেই ছিলেন আবার ব্রিটিশ ভক্ত কিংবা সরকার অনুরাগী, সেদিক দিয়েও বাধা ছিল তাদের মানসিকতায়। আজো অনেকাংশে একথা প্রযোজ্য, তাছাড়া ভক্তিবাদী আত্মসমর্পণের ও আধ্যাত্মিক তত্ত্বমূলক ধারাটিকেই তাঁরা 'ভারতীয় ধারা' বলে মেনে নিয়ে সেই দৃষ্টিতেই সংগ্রহ করেছেন। সামান্য অনুসন্ধান করলে আজও অনেক টুকরো ছড়া গানের ভাঙ্গাকলি গীতিকার ছিন্নমালা খুঁজে পাওয়া যায় — তবু বাংলাদেশে নয়, ভারতের সর্বত্র। ...

... সাধারণত দেখা যায়, সংগ্রাহকরা ও গবেষকরা লোকসংগীতকে প্রণয়, প্রকৃতি, বিবাহ, ব্রত, পূজা, শ্রম, স্বদেশ ইত্যাদি শ্রেণীতে বিভাগ করেন। আঞ্চলিক ঐতিহ্য, আঙ্গিক ও ভাষাগত বৈচিত্র বুঝাবার জন্য এ ধরনের শ্রেণীর বিভাগের প্রয়োজন আছে, কিন্তু বিচার ও বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে এ ধরনের vertical বিভাগ না করে আমাদের বিভাগটা হওয়া উচিত horizontal। কারণ তা থেকেই বেরিয়ে আসবে class contents বা তার অন্তর্নিহিত বক্তব্যের শ্রেণী সংগ্রামগত চরিত্রটি। তা থেকেই জানতে পারব লোকসংগীতের সামগ্রিক ধারাটির অন্তর্লীন ভাবাদর্শের সংঘাতের স্বরূপটা কি।

যারা শ্রমজীবনের গান বলে একটা আলাদা category করে থাকেন, তাঁরা ছাদ পেটা, ধানভানা ইত্যাদি গান প্রত্যক্ষভাবে শ্রমের ছন্দ সঙ্গীতের জন্য সৃষ্ট ধ্বনিযুক্ত গীত একসাথে জড়ো করে শ্রমজীবনের গানের শ্রেণীবিভাগ করে — অন্য গান থেকে সম্পূর্ণ পৃথক করে আলোচনা করে থাকেন। আমার মতে তাঁরা গাছ দেখেন কিন্তু বন দেখতে পান না।

লোকসংগীত সামগ্রিকভাবেই শ্রমজীবনের ও শ্রমকামনার সঙ্গীত। যেখানে শ্রমের সঙ্গে, শ্রমজাত উৎপাদনের ফলশ্রুতির সঙ্গে বিচ্ছিন্নতা সেখানেই লোকসঙ্গীত স্বধর্মচ্যুত। বাউল ও সুফীদের নিগূঢ় তত্ত্বকথা নিয়ে অনেক আলোচনা হয়েছে। যদি সেই নিগূঢ় তত্ত্বকথাই বাউলগানের আসল বক্তব্য হতো তাহলে তো লোকসঙ্গীতের আলোচ্য বিষয় বলে গণ্য হতো না; কারণ

লোকসঙ্গীত একটি জনসামজের সৃষ্টি, তা গুহাবাসী বা আখড়াবাসী গোষ্ঠী বা তন্ত্রচারীর সৃষ্টি হতে পারে না। বাউল গানের তত্ত্ব একটা সমাজ সত্যের উপরেই একদিন প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। তার রচনায় ও সুরে সেই সহজিয়া সত্যটিই নিঃস্ব জনসাধারণের যৌথ আবেগকে আন্দোলিত করতে পেরেছিল। সেই সহজিয়া সত্যটি কী? কেনই বা আমাদের দেশের সমাজপতিরা একদিন বাউল-খেদা আন্দোলনে মেতে উঠেছিলেন?

শ্রেণী সমাজের উৎপত্তির পর থেকেই শোষকের ধর্মের পাল্টা শোষিতের ধর্ম নানা নামে আত্মপ্রকাশ করেছে। শ্রেণী সংঘাতটা উপরিসৌধে এসে বাহ্যত ধর্মের সংঘাত বলে চিহ্নিত হয়েছে। ...

... বাউল মতবাদের বিকাশ হয় সামন্ত সমাজের শাসক শ্রেণীর প্রতিকূল মতবাদ হিসাবেই। বাউলরা প্রচলিত ধর্ম, জাতি বা বর্ণবৈষম্য দেবদেবী, পূজা-আচার, নামাজ, রোজা, মন্দির-মসজিদ কন্টকিত সামন্ত সমাজের ধ্যান-ধারণাকে প্রকাশ্যে অস্বীকার করতেন, এবং সেই ভাবধারাতেই আপ্লুত তাঁদের 'মনের মানুষ' এক নতুন মানবতাবাদের প্রতীক হয়ে উঠেছিল। সামন্ত সমাজে নিপীড়িত জনমানসে তাই সেই মানুষটি আসন পাততে পেরেছিল। সমাজের আর্ত দরিদ্র, ভূমিহীন, নিঃস্ব চাষী ও তথাকথিত নিম্নজাতি থেকে বাউলরা এসেছিলেন। বাউল দর্শন মানুষমুখী, ইহজীবন মুখী, তবু কেন তাঁরা বিবাগী, কেন নিজেরা বলে 'আমরা পাখির জাত'। তার কারণ আচার বিচারের প্রহরী ঘেরা বর্ণহিন্দু সমাজের অচলায়তনে মুক্তমতি বাউলদের বাসা বাঁধবার কোনো সুযোগ ছিল না। এই 'মুক্ত ডানা' পাখির জাত ছিল সামন্ততন্ত্রী শেকলে বাঁধা মেহনতকারী মানুষের মুক্তিকামনারই প্রতীক ও প্রতিনিধি।

সমাজের উৎপাদন ব্যবস্থায় কোনো পরিবর্তন না আসায়, সামন্তসমাজের বিরুদ্ধে কৃষি বিদ্রোহগুলি সব ব্যর্থ হওয়ায় জনজীবনে সামন্তবাদী আধ্যাত্মিকতা শক্তিশালী হয়ে ওঠে। সেজন্য লোকায়ত বাউল মতবাদে বিভিন্ন পশ্চাদমুখী ধর্মীয় মিশ্রণ ঘটতে থাকে। বাউলরা শ্রম জগৎ থেকে নিজেদের বিচ্ছিন্ন করে আখড়াবাসী হতে লাগলেন এবং আত্মকেন্দ্রীক তন্ত্রচারী যোগী হয়ে উঠলেন। ...

... সেজন্য বাউল বা মুরশিদি গানকে মোটামুটি দুভাগে ভাগ করতে পারি। এক মানবতাবাদী প্রতিবাদে ধ্বনিত যাকে Protest songs বা প্রতিবাদী গীতের পর্যায়ে ফেলতে পারি। অন্য ধারাটি হল কেবল গুহ্যতত্ত্ব আশ্রয়ী জীবনবিমুখী প্রতিক্রিয়াশীল ধারা। ... শোষক শ্রেণীর উগ্রজাত্যাভিমান জাতি বিদ্বেষ এবং ধর্মীয় সাম্প্রদায়িকতা সাধারণ মানুষের জীবনকে তাদের চিন্তাধারাকে বারে বারে

দূষিত করেছে। তাদের লোকগীতিতেও তার বহু চিহ্ন পাওয়া যায়। অর্থাৎ লোকসংগীতের জীবনমুখী লোকায়ত ধারার পাশাপাশি একটি প্রচ্ছন্ন কোনো কোনো সময় সুস্পষ্ট দূষিত জীবনবিমুখী ধারাও আছে। তাই লোকসংস্কৃতির অগ্রগতির ধারাটা শুধু গ্রহণের নয় বর্জনেরও। এ বিষয়ে লেনিনের বিখ্যাত উক্তির (There are two nations in every modern nation ... There are two national cultures in every national culture') দৃষ্টিকোণ থেকেই বিচার করতে হবে।

হেমাঙ্গ বিশ্বাস
লোকসংগীত সমীক্ষা, ১৩৮৫

One thing seems certain that the Bauls with their spirit of iconoclastic bhakti resembles greater Indian Bhakti tradition ... Kabir, Nanak, Tukaram, Dadu, Chaitanya, sant cults through effects of sufi show clear science. It is quite possible that some Bauls, carry things to their sahajiya conclusion and despite their antogonism to ritual worship follow sexual sadhana ... In all theories of lover and beloved, the Vaisnava Sahajiyas never speak of any love beyond the purest and most perfect forms of human love ... of man and woman, who are themselves incarnations of the eternal lover and Beloved. But the Bauls conceive Sahaja as the innermost eternal beloved who is in the 'Man of the heart'. The Bauls also speak of love and union, but this love means the love between the human personality and divine beloved within and in this love man realizes his union with divine...

... The difference between the Baul and the Sahajiyas is brought out in their poetry. The music and the poetry of the orthodox Vaishnava is lyrical. Sensual and full of enthusiasm even at its most poignant. That of the Sahajiyas is doctrinal, obscure and with some notable exceptions dry – especially to someone who cannot fully understand the code. The Baul songs are more in the Vaisnava Spirit emotional and full of earthly imageries and while the Sahajiya poems are confident, the songs of the Bauls are often sad, filled with longing and a profound consciousness of human fraitly.

.... And Baul songs are sometimes songs of pure joy when the Baul has rolled back the veil of maya that hides him who

dwells in the heart, when he has seen his true reflection in the mirror ...

... The mysteries of love and God hinted by Vaisnava poets explained by Vaisnava theologians perhaps find their trust expression in the songs of the Baul.

Edward Dimock 1989
The Place of the Hidden Moon :
Erotic Mysticism in the
Vaishnava Sahajiya Cult

The Bauls and their songs are an important component of Bengali cultural identity. Yet middle class urban Bengalis have ambivalent feelings towards the tradition. On the one hand they often idealize the Bauls regarding them as almost saintly figures who are free of social conventions inhibitions and prejudices. They also highly value their songs for their musical and literary qualities and consider them one of the main types of Bengali folk songs. But on the other hand, they often condemn or deny their tantric sexual rituals .....

... It was largely Tagore and his associate Kshitimohan Sen who elevated the Bauls to the status of a cultural symbol. This idealization took place at the expense of the Baul esoteric aspect and had a deleterious effect on scholarship, leading scholars to eschew field work and focus exclusively on their humanistic beliefs. As a result Baul Sadhana (religious practice) was given short shrift. Scholars mistakenly characterized the Bauls as practicing different sadhanas united only by a common spirit of extreme unconventionalism .... In 1968 Upendranath Bhattacharya published his ground breaking work ... based on many years of field work. In this he proved the Baul whether Hindu or Muslim, practice more or less the same sexual rites, and that those rites are central to Baul religion and to an understanding of their songs. Though subsequent fieldwork done by scholars have corroborated his findings, the Old Romantic image of the Bauls continue to hold sway today.

Baul Songs
Daniel S. Lopez (ed.)
Carol Solomon, 1995

অন্তর্লীন বিবেচনা থেকে বোঝা যায় চর্যাগান থেকে নাথ পল্লীদের গান, বৈষ্ণব সহজিয়াদের গান, শাক্ত গান, বাউল গানকে ছুঁয়ে সেই গোপন গানের ধারা রবীন্দ্রনাথের গানকেও স্পর্শ করেছে। একে চলতি ভাষায় বলা হয় রূপক গান ...

... রূপকের আবরণে ঢাকা চর্যাগান থেকে বাউলগান পর্যন্ত বাংলা গানের সেই চর্চা ও তার শরীর ব্যবচ্ছেদ করলে একটা অন্তঃস্রোতের সন্ধান পাওয়া যায়। গভীর গোপন ব্যক্ততা ... দেহতত্ত্ব ... জীবনমুখীনতা বাঙালির এক সঙ্গীত প্রবাহের অন্তরলীন ধারা, জাতীয়তা — জাতীয় পরিচয় ... চর্যাপদ থেকে আরম্ভ করে শাক্ত গান পর্যন্ত বাংলা গানের ৮০০ বছরের ধারাবাহিকতায় রূপকের ব্যবহার উল্লেখযোগ্য ভাবে বেশী ...

প্রত্যেক জাতির আত্মপ্রকাশ এর একটা ধরন থাকে। বাঙালি গানে রূপক ব্যবহারের কৌশল তেমনই এক বিশেষ ধরন। ...

... বাংলা দেহতত্ত্বের গানের ভাষা এক বিশেষ গুহ্য লোকধর্ম সম্প্রদায়ের আচরিত ও পরিকল্পিত ভাষা পরিকল্পনা। এই আলোকে দেহতত্ত্ব গানের ভাষাবিচার ও শ্রেণীকরণ এক নতুন ভাবনাকে সম্ভাবিত করে এবং লক্ষ করা যায় প্রাগাধুনিক যুগের ও পূর্ব পর্যায়ভুক্ত চর্যাগান থেকে সর্বাধুনিক বাউল গানটির শব্দার্থ বিন্যাসে ভাষা পরিকল্পনার এক উদাহরণীয় বিন্যাস লুকিয়ে আছে। তাদের পরম্পরা কেবল গুহ্য সাধনার সমতাজাত নয়, তাতে সূক্ষ্ম ভাষা পরিকল্পনাগত মিলটুকুও চমকপ্রদ। ...

... উচ্চবর্ণের আধিপত্য ও শোষণের চাপে অবদমিত সামাজিক অবস্থানটিই কি তাঁদের সত্যদৃষ্টি ও সামাজিক বোধে উত্তরিত করেছিল? এ কথাই সত্য বলে মনে হয়, যখন দেখি আমাদের লালন-দুদ্দু-জালাল-যাদু বিন্দু-কুবিরের জন্ম খুবই নিচুবর্গের খেটে খাওয়া মানুষের ঘরে। এককথায় বৃহত্তর সমর্থন পাই মধ্যযুগে ভারতীয় সন্ত-সাধকদের জীবন ও রচনা পর্যালোচনা করলে। দেহতত্ত্ব হিন্দু-মুসলমান মিলনমন্ত্র দেহ ও জীবনের অনিত্যতাবোধ গুরুকরণের অবশ্যম্ভাবিতা, শাস্ত্র বিরোধিতা এবং জাতি-বর্ণ নির্বিশিষে মানবপ্রেম এদের সকলের জীবন ও গানের মূলকথা। সেই জন্যই মনে হয়, সারা ভারতের দেহতত্ত্বের গান একসঙ্গে হলে ভারতীয় নিম্নবর্গের এক সমৃদ্ধ জন-ইতিহাস পাওয়া যায়।

সুধীর চক্রবর্তী
বাংলা দেহতত্ত্বের গান
জানুয়ারী, ১৯৯০

গত পাঁচ দশকব্যেপে আমেরিকা-ফ্রান্স-জাপান-জার্মাণি ইত্যাদি দেশে বাংলার বাউলরা গান গাইতে যাচ্ছেন, সমাদৃত হচ্ছেন এবং বিপুল আততি, সাময়িক ফল ও কিছু কিঞ্চিৎ বিত্তের মুখ দেখছেন। বাউলদের মুক্ত জীবনের ধরন, গায়নের উন্মাদনা ও মাদকাসক্তি বাংলায় টেনে আনছে বিদেশী বিদেশিনীদের। এমনকি বহুবিদ্যাচর্চাকারী বাঙালি বুদ্ধিজীবীদের একাংশ এখন বাউল গানে খুঁজে পাচ্ছেন স্বতন্ত্র এক ধরনের 'টেক্সট'। গানের বাণীর অতলে ধরা পড়ছে নিম্নবর্গের ইতিহাস-প্রতিবাদ ও সমন্বয়বাদের নানা ভঙ্গী ও সংলাপ। এখনকার পোস্ট মর্ডান সমাজবিন্যাসের ছকে বাউলগান যেন একরকম এথনিক সংযোজন এমনও ভাবছেন কেউ কেউ। ফলে বরাবরের ব্রাত্য বাউলদের মেলামিছবে উন্নত ও শিক্ষিতবর্গের মানুষদের আনাগোনা, উৎসাহ ও তথ্যসংগ্রহের নেশা আজকাল বেশ চোখে পড়ে। দেশে-বিদেশে বাংলার বাউলগানের কমপ্যাক্ট ডিস্ক জনপ্রিয় হচ্ছে। বাউল জীবন ঘিরে তৈরি হচ্ছে তথ্যচিত্রের ভিডিও। লালন ফকিরকে নিয়ে সিনেমা, নাটক, ডকুমেন্টারি ফিল্ম এমনকি পুতুল নাচ হচ্ছে। বেরোচ্ছে লালনকে নিয়ে চমকপ্রদ উপন্যাস বা হাসন রাজার জীবনী। ভাবা যায় কলকাতায় সরকারী প্রয়াসে জন্মশতবর্ষ পালিত হয়েছে নবনী দাস ক্ষ্যাপার। বাঙালি চিত্রকররা কয়েক দশক থেকে আঁকছেন বাউল ফকিরদের স্কেচ ও পোট্রেট। শিল্পকর্মে, গৃহ সজ্জায় কাষ্ঠখণ্ড ও দেওয়ালচিত্রে বাউলের মোটিফ এখন হামেশা। অথচ সরেজমিন গবেষণায় গ্রামে গ্রামে ঘুরলে এখনও অন্য একটা ছবি দেখা যাবে। দেখা যাবে মৌলবাদের শাসানি এবং ফকির ও বাউল নিগ্রহ, গড় বাউলের চরম দারিদ্র। অনুগ্রহ ও সরকারী অনুদানের জন্য বাউলের নির্লজ্জ লোভ, গোপ্য সাধনার নামে কোথাও কোথাও মাত্রাহীন যৌনতা। অন্যদিকে বাউলগানের সুর ও পরিবেশন ভঙ্গীতে নাগরিক রুচির অভ্রান্ত দিগ্‌ভ্রষ্টতা বেশ স্পষ্ট।

এইসব তথ্য ও বিবর্তনের পরিপ্রেক্ষিতে একথাও সত্য যে বাংলার বাউল ফকিরদের সম্বন্ধে আমাদের গড়পড়তা জ্ঞান বা ধারণা বেশ প্রান্তীয় অথবা ধূসর। বিশেষত তাদের যাপনরীতি ও জীবনসংগ্রাম সম্পর্কে আমরা অজ্ঞ, তাঁদের সামাজিক অবস্থানগত বিপন্নতা, অবমান ও সংকট আমাদের শিষ্ট শহুরে জীবনের কোনোরকম ভাবনা পরিধির মধ্যে নেই। তাঁদের গান ও গায়ন অনেকের বিনোদনের উপকরণ অথচ তাদের জীবন ধারণের ক্লেশ ও দৈন্য বিষয়ে বৃহত্তম শিষ্ট সমাজ উদাসীন। সেই কারণে বছর কয়েক আগে বাউল-

ফকিরদে নিয়ে বিচিত্র ও বহুমুখী রচনাসম্ভারে একটি সংকলন প্রকাশের বাসনা জাগে আমার। ...

সুধীর চক্রবর্তী
বাংলার বাউল ফকির, ১৯৯৯

Both these sources, Bauls and Baul songs tend to be seen as solid and unambiguous by the authors of such studies. They are also thought to provide information about the same 'thing', due in part to the assumption that a word (baul) necessarily corresponds to some clear cut phenomenon, dubbed 'Baulism' by some (e.g. Ashraf Siddiqui 1976). This reification, the assumption that there is something to be discovered, inevitably means that the paths by which the secondary sources approach this 'thing' becomes irrelevant ...

... Recent perception may be broadly divided into two categories : first, Bauls as a class of heterodox mystics in eternal pursuit of the 'Man of the Heart' or the 'unknown bird' within, Rabindranath Tagore and K. Sen being the chief exponents of this approach. Second, Bauls as a sampraday (tradition) or even sect, entry to which requires initiation, and which consists of practitioners of arcane 'sexo-yogic' rites (This is argued with a nagative gloss by A.K. Datta and more emphatically by Upendranath Bhattacharya for example) to these may be added : Bauls as disreputable, low-class entertainers (as related in the writings of J.N. Bhattacharya for example) an image which, at any rate among scholars, have been superseded by the more elevated one of Bauls as performing artists of consummate skill (e.g. Majumdar and Roberge 1979) related to this is an image derived from the 'West' that is, Bauls as Bengali hippies. This familiar to anthropologists from a chapter in V.W. Turner 'The ritual process : structure and anti-structure, called 'Bob Dylan and the Bauls' in which music and itinerancy are emphasized. Turner concluding that 'this is the authentic voice of spontaneous communitas' (1969: 165-6). Finally there is the divergence of view dependent on situating Bauls against a Hindu or Muslim background, thus creating a fundamentally

Hindu or Muslim identity, whether or not this is then considered to 'spill over' to include the other community.

Bauls are primarily known to others through their often beautiful and enigmatic songs, and it is these that, especially from the end of nineteenth century, have given them an influence far wider than their number would suggest. Since that time, Baul songs, and notions of what it is to be Baul, heve become increasingly important to urbanised, educated more Bengalis, and recently to Euro-Americans in the process, Bauls assumed the guise of bearers of an authentic indigenous heritage, a beit constructed in startlingly different ways, as Bengali, Indian, Hindu, Muslim materialist or secular. The emergence of these perceptions and the concomitant rise of a class of semi-professional Baul performers so familiar is Bengal today in dealt with in the first part of this book. Nowadays as national and international representatives of South Asian folk culture or indigenous spiritualities, the iconic status of Bauls is firmly established.

Of no less significance to students of Bengali religion, culture and history is another less conspicuous class of people called Baul. These are initiates into esoteric practice who, although they know and sometimes sing songs, do not depend on music (and patrons) for their livelihood. My anthropological field work with such Bauls constitutes the core of this book. Nor can it be said that such Bauls are only of relevance to Bengali studies within the field of Indology. A study of Bauls is clearly important in the wider contexts of South Asian Buddhist, Tantric, Vaishnava, Nath, Sufi, Fakir and Siddha tradition. Most scholars are of the view the Bauls form part of pan – Indian 'Yogic' 'tantric' 'devotional' or 'mystical' movements ...

... Baul divinisation of the human being, an implicit characteristic in many areas of Hinduism (Fuller 1992: 72 pg) finds unambiguous expression in Tantra (Denton,1991). One of the more radical inferences of the present volume, concerning notions of the completeness or autonomy, and therefore superiority, of women, is not without echoes in Tantric tradition. .... The significance of a study of Bauls is no longer confined

to the south Asian context. Recent years have witnessed an immense expansion of the Baul role as representative of South Asian spirituality and folk culture.

Jeanne Openshaw

Seeking Bauls of Bengal, 2002

পরিশেষে সংকলন কার্যকালীন অনুভূত দু'টি খেদের বিষয় উপস্থাপিত করছি। এই সংকলনে লোকসঙ্গীত, দেশীয় গান তথা বাউল গানের সংমিশ্রণ দ্রষ্টব্য। কোন অবিমিশ্র, বিশেষ সাংগীতিক ধারার গবেষণা ধরে তার ঐতিহাসিক পরিসরে উদ্ভূত গবেষকের কার্যকারণ সম্পর্ক নির্ণায়ক উদ্ধৃতি প্রদর্শনী ও সমীক্ষা নিয়ে সর্বসাধু পাঠকজনের দ্বারে বিচারস্থ হওয়ার আশা, মনোবাসনা এ সাধনে পূর্ণ হল না। এ বিষয়ে আমার অপরিণত বোধবুদ্ধি, বিবেক-চেতনা, বিবেচনায় যে যুক্তিটি (এই সংকলন নির্মাণকালেই কালক্রমে) কিলিয়ে পেকেছে তার অপক্ক আস্বাদ-গন্ধ পাঠক সমীপে সোপর্দ করছি। বাঙালীর (প্রাচীন) গান (দুর্গাদাস লাহিড়ী মহাশয়ের অনুকরণে, অগ্নিযুগের নবদিগঙ্গনে প্রকাশিত, বাঙালির গান, ১৯০৫) চর্চা, সমীক্ষা গবেষণার 'প্রথম যুগের উষা' এই ব্যাপক সংগীত-সংজ্ঞার গর্ভাস্থিত কোন বিশেষ সংগীতধারাকে তার স্ববিশেষ, স্বতন্ত্র (অধ্যয়ণ-সংগ্রহণ) প্রয়োজনীয়তা বা উপযোগিতা গৌরবযুক্ত 'শিরতাজে' অভিষিক্ত করেনি। আমার অন্তরের অনুচ্চারিত বিশেষ লক্ষ্য ছিল ইতিহাসে 'বাউল গান চর্চার' ইতিহাস নজরবন্দি করা। সেই চর্চা একসময় অবধি সমগ্র পল্লী ও দেশীয়, হিন্দু বা প্রাচীন বাঙালি গান বিষয়ানুসন্ধান প্রকল্পের সাথে একাত্ম ছিল, অতএব সেমত অবস্থায় সিন্ধুদর্শন ব্যতীত বিন্দুদর্শনের সুযোগ নাস্তি বলেই মনে হয়। কালক্রমে জসীমুদ্দিন, ক্ষিতিমোহন সেন, উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, এডওয়ার্ড ডিমক্ মহাশয়দের রচনার মধ্যে অবিমিশ্র বাউলধারা পূর্বকল্পিত সমগ্র পল্লী বা দেশজ সুর-স্বর, জীবনযাপন, দর্শনসঙ্গতির থেকে বিযুক্তি প্রাপ্ত হয়। তৎপরবর্তী গবেষণা অধ্যায় অনেকাংশেই এই সংগীতধারাকে একমেবদ্বিতীয়ম্ রূপে প্রতিষ্ঠিত করতে উদ্যত হয় (অবশ্য হেমাঙ্গ বিশ্বাসকৃত সমীক্ষা বহুলরূপেই এই চিত্রের ব্যতিক্রমী দৃশ্য দর্শায়)। সমগ্র লোক, পল্লী বা বিশেষতর সহজিয়া বৈষ্ণব, মুর্শীদা ফকির, রাধাকৃষ্ণ গীতাবলি থেকে পৃথক আরেক স্পষ্ট জগতে স্থান দেয়। পূর্বেকার চর্চার সমন্বয়ী চেতনার থেকে যা এক স্পষ্ট দিক পরিবর্তনকারী ইঙ্গিত, এই ইঙ্গিতবহতার ঐতিহাসিক আধার অবতারণা অবশ্য এই স্থানে যথাপুযুক্ত হবে না।

আরেক ক্ষেদোক্তির কারণ হচ্ছে বাউল গান এবং বাউল সম্প্রদায় সম্বন্ধীয় গবেষণা বিভাজন বা বলা ভাল পৃথকীকরণ এখানে অবিরলরূপে উপেক্ষিত। আমার অমার্জিত সম্পাদনাবোধের জন্য আমি সহস্রবার ক্ষমাপ্রার্থী। এক্ষেত্রে হাজার কুণ্ঠাজনিত স্থগিতাদেশ থাকলেও দু'এক কথা ব্যক্ত করতে ইচ্ছা করি। বাউল গবেষণায় এমত সরল বিভাজিকা রেখা বহুলাংশেই অবর্তমান। বাউলের গান তার জীবন-যাপন, দর্শন, ধর্মীয় ও সম্প্রদায় বোধের ফলিত আধার। বহিরাগত সমীক্ষকদের কাছে, পর্যবেক্ষকদের কাছে, এই গীতাবলীই ফলস্বরূপ হয়ে তার সম্প্রদায় বৃক্ষের পরিচয়প্রদান করে। সাম্প্রতিক ইতিহাসে সরেজমিন ক্ষেত্র সমীক্ষার প্রভাব বৃদ্ধি পেলেও ভজনের এই বিশেষ 'মারফতী' ভূমিকা কখনোই উপেক্ষিত হয়নি। এক্ষেত্রে উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য মহাশয় নির্দিষ্ট পথেই পূর্ব ও পরবর্তী গবেষণার পথ চালিত হয়েছে। "বাউলদের তত্ত্ব ও দর্শন সম্বন্ধে লিখিত বিশেষ কোন সন্দর্ভ নাই, সাধন পদ্ধতিরও স্বতন্ত্রভাবে লিপিবদ্ধ কোন বিবরণ নাই। গানেই তাহাদের ধর্মতত্ত্ব দর্শন ও ক্রিয়াপদ্ধতি ব্যক্ত হইয়াছে, গানই তাদের আত্মপ্রকাশের একমাত্র মাধ্যম ..."। গবেষক ও গবেষিত 'নির্গ্রন্থ' সমাজের মাঝে মহাজনী কাষ্ঠের এই ভজনা-নৌকার মারফতী স্মরণাগতি যে সকল অধ্যায়ণরীতি অবহেলা করেছে সেই সকল কর্মকাণ্ডকে এই উপরোক্ত প্রদর্শন পরিসর-বন্ধন থেকে মুক্ত রেখেছি।

অর্বাচীন ইতিহাসে, প্রাচীন বাঙালির গানচর্চা, তার গ্রন্থন সংগ্রহণ, সঞ্চয়, সমীক্ষা তার বহুধা ভাব-ভাবনা বৈচিত্র্য নিয়ে বর্তমান। যে দুর্ভাগা অবস্থার কথা তীব্রভাব উদ্বেলতায় জসীমুদ্দিন সাহেব তাঁর কলমে (The Decline of Folk Songs উপরোক্ত) বয়ান করেছেন, অথবা যে সংশয় উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য তার স্বভাবসুলভ, অচপল, ঐতিহাসিক-দার্শনিক প্রজ্ঞায় উপস্থাপনা করেছিলেন তার ৫-৭ দশক অব্যবহিত পরেও 'বাউল' বা Jeanne Openshaw মহশয়া বর্ণিত 'Baulism' ফুলে-ফলে সমৃদ্ধ হয়ে দিনে দিনে বন মাতিয়ে তুলেছে অনির্বিত। সুধীর চক্রবর্তী মহাশয় এই উন্মাদনার, এই বন বিস্তারে নজীর জবানবন্দি করেছেন।

ঐ বিচিত্র, বিস্তৃত বনের প্রত্যেক বৃক্ষ, একই বীজে রোপিত, এরকম 'ভাবালুতার' কারণ নাই বলে মনে হয়। এই চিন্তা-চেতনার বিস্তীর্ণ উদ্ভিদ বৈভব প্রাণীবৈচিত্র্য উপস্থাপিত করাই আমার সাধ ছিল। অবশ্য এ কথা অনস্বীকার্য যে আমার সাধ্য ও সাধনার মাঝে অন্তর বিস্তর। যাই হোক, এই বনশোধনের কার্য

আমার নয়, বন দেখানোর কার্যে নিযুক্ত ছিলাম মাত্র। কোন নির্বিকল্প সত্যস্বরূপ মহীরুহ সন্ধান ও স্থাপনের জন্য অবশিষ্ট বন উজার করে ফেলা অতি কষ্টসাধ্য, 'ছল' ও 'ফল'-এর সূক্ষ্ম বিচার আমার দুরারাধ্য। আমার সাধ্যসাধনার লক্ষণরেখার বাইরে তার মৃগয়াক্ষেত্র। বন দেখানোর কর্তব্য মনস্থ করেছিলাম আশংকা করি তাতে বিফলই হলাম।

মন ফকিরা মনেরই কথা
সে কথা গুরুজী তা জানে রে

কি ধনে শুধিব তোমার ঋণ গো রাধে
রাই আমার সেই ধন নাই

এখন বাংলা গান ও বাউল-ফকির

একটি আলোচনা

রংগন চক্রবর্তী, পার্থ মজুমদার

পার্থ : মনে পড়ে, ১৯৭৬ বা ১৯৭৭-এ যাদবপুরের আর্টস ফ্যাকাল্টির নিচে পোসকটার পড়েছিলো 'বাউল জ্যাজ', 'মহীনের ঘোড়াগুলি'। সে অনুষ্ঠানে দু-একটা বাউল গান পেয়েও ছিলো ওরা। যতদূর মনে পড়ে — একটি মেয়ে গঙ্গা-যমুনা-সরস্বতী গেয়েছিলো — সঙ্গে ছিলো মিউজিক্যাল অ্যারেঞ্জমেন্ট মণিদার মতই। পরবর্তীকালে 'ঐক্যতান' এসেছে বনিদের হাত ধরে — কার্তিক গায় ওদের সঙ্গে — ওরা কাজ করে Heavy folk content নিয়ে। আজকাল বিভিন্ন ব্যান্ডের লোকজনওতো বাউলগানে উৎসাহী — যেমন পুরোনো ক্যাকটাসের পিঙ্কি, সঞ্জয়, পটা।

রংগণ : সঞ্জয় তো বেরিয়ে এসে ব্রহ্ম বলে দলই করেছে।

পার্থ : আবার নাকি পটা ফিরে এসেছে এরকম শুনেছি ... ও একটা বাউল গানের সিডিও করেছে বোধহয় বছর দুয়েক আগে।

রংগন : পটা ফিরে এসেছে আগেই শুনেছি।

পার্থ : আমি একটা জিনিস দেখি যে, গান যারা করছে, বাউলের ওপর দিয়ে মিউজিকাল এক্সপেরিমেন্ট কি করা যায় তারা তাদের মত করে করছে, সেটা আমাদের পছন্দ হতে পারে আবার নাও হতে পারে, সেটা অন্য বিষয়, কিন্তু করছে। কিন্তু আমার মনে মাঝে মাঝে প্রশ্ন জাগে যে মূলধারার জনপ্রিয় সংস্কৃতিতে বাউল জিনিসটা মিউজিক্যালি ক্যারিড হবে কি হবে না ...

রংগন : মানে মিউজিক্যালি ক্যারিড হবে কি হবে না বলতে তুই কি বোঝাতে চাইছিস?

পার্থ : বলতে চাইছি একটা প্রচলিত গানের ধারা আছে, সেটাকে যারা মিউজিক করছে ... সে fuse করছে বা যাই করছে, একটা অন্যভাবে প্রেজেন্ট করার চেষ্টা করছে। সেটা একরকম। আমার একটা মূল প্রশ্ন

আছে। আমি উৎসবটা করার পরে আরও ফোকাসড্ বলে বুঝতে পারছি, তার আগে একটা আন্দাজ ছিল। অতটা ভালো করে জানা ছিল না। বাচ্চারা কিন্তু বাউল গান শুনছে। এবার প্রশ্ন হচ্ছে, এটাই যথেষ্ট কিনা বাউল গান একটা মিউজিক্যাল ট্র্যাডিশন হিসেবে ক্যারিড ফরোয়ার্ড হওয়ার জন্য।

রংগন : এটার মধ্যে অনেকগুলো বিষয় আছে। আমরা যদি বিষয়গুলোকে এক এক করে সাজিয়ে ফেলি, তাহলে ভালো হয়। তুই যেখান থেকে শুরু করলি, আমিও যদি সেখান থেকেই শুরু করি তাহলে হয়তো সুবিধা হবে। আমরা যে সময় যাদবপুরে রাজনীতি করতাম সেখানে তোর আর আমার ভূমিকা কিছুটা আলাদা ছিল। তার একটা কারণ হচ্ছে তোর ফোক গানের প্রতি টান ছিল। অন্য একটা ভালোবাসা ছিল। তোর যোগাযোগ ছিল। কালীদাস গুপ্ত, রণেন রায়চৌধুরী, হেমাঙ্গ বিশ্বাস ইত্যাদিদের তুই চিনতিস। খানিকটা গান শিখতিস বোধহয়। আমাদের সেটা ছিল না। আমাদের শিল্প সাহিত্যের বোধটা, আমার নিজের যেটা মনে হয়, খানিকটা মার্কসবাদ নষ্ট করে দিয়েছিল। আমি তাই মনে করি তখন আমরা অনেক কিছু ভাবতাম না, বুঝতাম না। পরে বড় হয়ে মনে হয়েছে, আরে এ তো সর্বনাশ হয়েছে। নিজের অনেক ক্ষতি হয়ে গেছে। আমরা সবাই একধরনের মার্কসবাদীই ছিলাম। সেখানে দাঁড়িয়ে একটা সমস্যা ছিল। মানে আমার দিক থেকে আমি যেটা বলবো, পরে যখন আমরা হেমাঙ্গ বিশ্বাস পড়ছি, বা বুঝতে পারছি, বিশ্বাস করছি, বুঝতে পারছি যে কেমন করে একটা সময় গণনাট্য আন্দোলনে চালু হল অদ্ভুত কিছু ধারণা। এই যে linking up and way out দেখাতেই হবে, এই যে তথাকথিত লোকসংগীত ও গণসংগীতের বৈপরীত্ব, এই যে folk song এক ধরণের পলায়ন, মানে বড় হয়ে ওঠার বিরাট এক সময় stupid কিছু ধারণা ...

পার্থ : Almost bigotry ...

রংগন : Bigotry তো বটেই। যার জন্য আমি বলবো রাজ কাপুরের অসংখ্য ছবির মানে আমি তখন বুঝতে পারিনি। ছোটবেলায়, রাজ কাপুর তো এত দেখিনি, মানে আমাদের রাজনীতিবোধ ...

পার্থ : আমাদের কালচারেই ছিল না।

রংগন : আমি কিশোরকুমার বুঝতে পারিনি। "পাঁচ রুপায়া বারা আনা" যে একটা অসাধারণ মানুষের গান, মানে সাধারণ মানুষের অসাধারণ গান, এটা আমি বুঝতে পারিনি। এতে আমাদের একটা বড় ক্ষতি হয়ে গিয়েছিল। এটা হচ্ছে একটা জায়গা, সেই জায়গা থেকে আমার যেটা মনে হয়, আমরা আজকের আলোচনায় তুই বা আমি কোনও ভালো মন্দ নিয়ে কথা বলতে যাচ্ছি না, আমরা একটা জিনিস বোঝার চেষ্টা করছি, তার মধ্যে ভালোমন্দের সেন্স তো থাকবেই আমাদের political position তো থাকবে ...

পার্থ : কিন্তু একটা balance থাকবে।

রংগন : তা তো থাকবেই। কিন্তু কোন কিছুই ভালো বা মন্দ নয় এতটা open-ended খেলাও বোধহয় আমাদের খেলার দরকার নেই। সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে আমার যেটা মনে হয়, অন্তত আমার দিক থেকে, মহীনের ঘোড়াগুলির জিনিগুলোকেই একধরণের বুর্জোয়া জিনিস, একধরণের পশ্চিমী বিকার ভাবতাম। পশ্চিমের গান যদি হয় তাহলে সেটাকে শুধু international হতে হবে এবং কিছু গান, সেগুলো গান হিসেবে তো কিছু নয়। যেমন ধর ওই যে আমরা একটা গান গাইতাম না, At the call of comrate Lenin, হয়তো খুব একটা ভালো গান, আমি খুব ভালোভাবে জানি না। ওই যে আর একটা গান ছিল না, কি বল And he said goodbye goodbye, ডা ডা ডা ডা ... আসলে সেগুলো গান হিসেবে তো কিছু নয় ... রাজনৈতিক আন্দোলনের সময় ব্যবহারে লাগাবার মত একটা সুর একটা তাল।

পার্থ : একটা coinage বলা যেতে পারে

রংগন : বলা যেতে পারে। এক ধরণের তাল, ঠিক আছে, তো মহীনের ঘোড়াগুলিকে নিয়ে তখন সমস্যাও ছিল। এই ধরণের এক্সপেরিমেন্ট আমরা একধরণের বুর্জোয়া বিকার বা ... আমাদের সে সময় একটা ... ছিল কি, এরা ভীষণ গাঁজা খায়, কি লম্বা চুল, আমরা তো ভয়ানক কনজারভেটিভ। মার্কসবাদীরা একদিক থেকে ভীষণ sexist, ভীষণ conservative, অনেকগুলো গণ্ডগোল ছিল আমাদের। এটা মনে হয় ভারতীয় মার্কসবাদীদের বিশেষ সমস্যা। এটা আমার বারবার মনে হয়। যে জন্য বোধহয়, লাতিন আমেরিকায় অনেক ধরণের জিনিস উঠেও

যেতে পারে বা উঠেও আসতে পারে। আমাদের এখানে আমরা দেখেছি বিধবার ভিক্টোরিয়ান মার্কসবাদ, বিধবা বলতে আমি বৈধব্যবাদ বলছি। এটা একটা মূল সমস্যা ছিল। দ্বিতীয় সমস্যাটা যেটা ছিল সেটা হচ্ছে একটা purity-র প্রশ্ন। সেখানে একটু বল তুই কি বলিছিলি বাউল গান টিকবে কি না। চলবে কি না? এই ব্যাপারে আমার কোন পজিশন নেই। মানে একটা কোনও গান কিভাবে টিকতে পারে বা চলতে পারে আমি ঠিক জানি না। তোরা ধর এই যাদবপুরের মত জায়গায় এই উৎসবটা করছিল, যাদবপুরে তো ধর ১৯৭৭ থেকে ২০১০ সব কিছুই তো বদলে গেছে।

পার্থ : Demographic Patternটাই বদলে গেছে।

রংগন : সব লোক বদলে গেছে। সেখানে ধর বাউল গান নিয়ে যে একটা মেলা করার চেষ্টা করছিস, প্রথমে যদি আমরা একটু আলোচনা করি যে কেন করছিস এবং তার পেছনের সাংস্কৃতিক রাজনীতিটা কি?

পার্থ : না, আমরা যে খুব সাংস্কৃতিক রাজনীতি ভেবে এই উৎসবটা শুরু করেছিলাম তা তো নয়। আমরা কিছু লোক একসঙ্গে আড্ডা মারতাম যারা বাউল গান শুনতে ভালবাসতাম। উৎসবটা প্রাথমিকভাবে শুরু হয়েছিল ভাল বাউল গান শোনার একটা পরিসর খোঁজার তাগিদে।

কিন্তু এখন এটা basically কতগুলো purpose serve করছে। একটা হচ্ছে যে তোমাকে যদি একটা genre-কে টিকিয়ে রাখতে হয় বা তাকে যদি রসদ যোগাতে হয় তাহলে তো কিছু উপায় বের করতে হবে, তাই না? তো একটা জিনিস এই উৎসব করতে পেরেছে। তা হলো যে আমাদের ওখানে যখন বাউলরা গাইছেন তখন সেখান থেকে যোগাযোগ হওয়ার ফলে ওঁরা সারাবছর কিছু প্রোগ্রাম পাচ্ছেন। যত কমই হোক পাচ্ছেন। এই একটা জিনিস হচ্ছে।

দ্বিতীয় কথা হচ্ছে যে আমাদের উৎসবে একটা খুব মজার জিনিস হয়। সেটা আমার খুব ভালো লাগে। এটা যে আমরা খুব ভেবে করেছিলাম তা না, আস্তে আস্তে evolve করেছে। সেটা হচ্ছে যে আমরা কোনও শিল্পীকে বলি না যে তুমি এ'বছর এসো না। এ বছর যে আসবে তাকে পরের বছর বলব না তা না। আমরা সকলকেই বলি তোমরা আসবে, থাকবে, খাবে, সকলের সঙ্গেই interact করবে আর

গান যে যার গাইবে। আর আমাদের উৎসবে, মঞ্চে গান যতটা হয় আখড়ায় তার থেকেও বেশি গান হয়। এই একটা space তৈরি করার ব্যাপার ছিল, urban living-এ একটা traditional art form-এর কোনও জায়গা আছে কি না, সেটা দেখার। কারণ দেখ আমার যে বক্তব্য তা হল পারমানেন্ট সেট্‌লমেন্ট-এর ফলে যখন জমিদারি কেনা বেচা চালু হয়ে গেল, তখন প্যাট্রন-ক্লায়েন্ট সম্পর্কগুলো নষ্ট হয়ে গেল। এই ধর আকবর বাদশা সেলিম চিস্তির কাছে ছুটে যাচ্ছে সন্তানের জন্য, তারপর ফতেপুর সিক্রি তৈরি করে দিচ্ছে মানে এই যে একটা কি বলবো ...

রংগন : একটা support system ...

পার্থ : হ্যাঁ। এই support systemটা যখন জমিদারি কেনাবেচা শুরু হল, তখন স্বাভাবিকভাবেই উঠে গেল। অমিতাভ ঘোষের নতুন বইটায়, Sea of poppies-এ, খুব সুন্দরভাবে আছে। ওই যে রসখালির জমিদার, তার যে জমিটা বিক্রি হয়ে গেল, বিক্রি নয় যখন বেদখল হয়ে যাচ্ছে, তখন প্রজাদের সঙ্গে তার যে বিচ্ছেদ হচ্ছে, সেটা যেন ভাই-বোনের বিচ্ছেদ হচ্ছে। জমিদার আর প্রজার সম্পর্ক যেন অনেকটা পারিবারিক সম্পর্কের মত। সেখানে যে অত্যাচার নেই তা না। অত্যাচার যথেষ্ট আছে, system-এর অত্যাচার। কিন্তু তা সত্ত্বেও প্রান্তিক সমাজের যে গুণী মানুষেরা, ফকির বা বাউলরা, তারা জানত-চিনত বিপদের দিনে কোথায় যেতে হবে। তার বদলে বলব না, কিন্তু এরাও অনেক সার্ভিস দিত সমাজকে। যেমন ধর স্বাস্থ্য সংক্রান্ত নানা পরামর্শ। একটা মেয়ে ঋতুমতী হলে তাকে সদুপদেশ দেওয়া ... সেই শিক্ষাগুলো এরা দিতে পারত, যেহেতু এরা menstrual fluidটা use করে ওদের ritual-এ, কাজেই সমাজের মেয়েদের সাথে ওদের একটা নিবিড় সম্পর্ক ছিল।

আবার দেখ সমাজে মেয়েরাও তো একটা প্রান্তিক গোষ্ঠীই। তাহলে দেখ এক প্রান্তিক গোষ্ঠীর সঙ্গে আর এক প্রান্তিক গোষ্ঠীর কি নিবিড় সম্পর্ক। এই সম্পর্ক থেকেই তারা নানারকম স্বাস্থ্য বিষয়ক উপদেশও দিত।

আবার দেখ আজ থেকে শ'তিনেক বছর পিছিয়ে যাও এই

সম্পর্কগুলো যখন থেকে নষ্ট হয়ে গেল। তখন কিন্তু সমাজের সংখ্যাগরিষ্ঠ অন্ত্যজরা এই ধর্মেরই অনুসারী। এরাই এক সময় দলে দলে মুসলমান হয়ে গেছিল। চৈতন্যদেবের লক্ষ্যও ছিল এরাই। নিত্যানন্দ মহাপ্রভু তো চৈতন্যদেবের এই বার্তা পৌঁছে দিতেই গঙ্গার কূল ধরে ধরে সংকীর্তন আর মোচ্ছব করে যেতেন। গৌড়ীয় বৈষ্ণবরা এ জিনিসটা ভাল চোখে দেখেনি। কিন্তু চৈতন্যদেব তাদের বিরত করেছেন। হীতেশরঞ্জনের 'বাংলা কীর্তনের ইতিহাস' এ বিষয়ের বয়ান বড় সুন্দর করেছে। কিন্তু খ্রীষ্টাব্দ ১৫৩৩-এ চৈতন্যদেবের মৃত্যুর পরে গৌড়ীয় বৈষ্ণবরা কিন্তু সত্যি এই প্রান্তিক মানুষগুলোর ছায়া মাড়ানো ছেড়ে দিল। এর একশ' বছরের মধ্যে বাউলের উদ্ভব। উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য বলছেন, ১৬২৫-১৬৭৫ বাউল ধর্মের বিকাশের কাল।

বহু মানুষের সমর্থন তাদের পিছনে ছিল, তাই ধর্মীয় আন্দোলন হিসেবে বাউল-ফকির পন্থা দানা বাঁধতে পেরেছিল। কিন্তু এর সোয়াশ' বছরের মধ্যেই চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত এই আন্দোলনের পায়ের তলার জমি কেড়ে নিল।

দেখ একটা ইচ্ছা ছিল আমাদের এই উৎসবটা থেকে যদি একটা support system তৈরি করা যায়, এটা খুব বড় কথা হয়ে গেল, কিন্তু সেরকম একটা ইচ্ছা ছিল।

আর তৃতীয় কথা হল যে এই গানগুলো বাজারে কিনতে পাওয়া যাচ্ছে না, এটা একটা বিরাট সমস্যা বলে আমার মনে হয়। দেখ বাজারে তুমি যদি তোমার পণ্য নাই যোগান দিতে পার, তুমি যদি সেই distribution-এর মধ্যে নাই থাক, তাহলে তো তোমার সেই গান বিক্রি হবে না। তো সেইটা করা খুব দরকার। আমরা যেমন প্রত্যেক বছর যে সিডিগুলো বের করি, সেগুলো নিমেষের মধ্যে শেষ হয়ে যায়। কাজেই এর একটা বাজার আছে বেশ বোঝা যায়। কিন্তু আমরা বাণিজ্যিক সংস্থাগুলোকে সেকথা বোঝাতে পারিনি। আমরা নিজেরা পারি না, আমাদের ইনফ্রাস্ট্রাকচার নেই বলে পারি না। আরেকটা কথা মিউজিক ইন্ডাস্ট্রির নিজস্ব কতগুলো oligopolistic পাহারাদারী আছে, সেইগুলোকে ভেঙে ঢোকার কতগুলো মুশকিল আছে। মানে যে মুহূর্তে তুমি কোন সিডি নিজে ডিস্ট্রিবিউট করতে যাবে তোমার

applied for sales tax কাগজ লাগবে, তার জন্য কুড়ি হাজার টাকা খরচা হয়ে যাবে।

আর একটা জিনিস এই উৎসবে আমরা করতে পারছি। যেটা আমরা ছোটবেলায় যেভাবে বাউল গান শুনতাম, আমি তো অনেক ছোটবেলা থেকে বাউল গান শুনছি, তখন আমরা লাইন ধরে গাওয়া যেটাকে বলতাম, একটাই বিষয় ধরে তার ওপর দু'ঘন্টা, তিন ঘন্টা, চার ঘন্টা গান চলছে। আমরা কিন্তু সে জিনিসগুলোকেও শুরু করার চেষ্টা করছি। গত দু'বছর ধরে সেরকম গানের session হয়েছে রাত্তিরবেলা যেখানে একদম serious শ্রোতা থাকবে। বেশী শ্রোতার দরকার নেই। এই তিন চারটে জিনিস করবার জন্যই এই উৎসবটা আপাতত চলছে, মানে প্রথম যে বছর আমরা শুরু করেছিলাম, তখন কিন্তু আমরা শুধু গান শুনব বলে শুরু করেছিলাম। কিন্তু শুরু করার পরে করতে করতে আজকে এরকম জায়গায় পৌঁছেছে।

রংগন : তা আমরা যদি আবার গোড়ার প্রশ্নটার দিকে ফিরে যাই বাউল গানের, তাহলে আমার যেটা মনে হয় সেটা হচ্ছে মানে বাউল গান তো আর group theatre নয় যে একটা লোক যে ব্যাঙ্কে চাকরি করে সেই theatre করে, মানে বাউল তো যে গানটা গায় সেই গানটাতেই সে বাঁচে মানে its a lifestyle dependent গান ...

পার্থ : একদম।

রংগন : তা আজকে যদি সেই livelihood বা সেই living-এর process-টা বদলে যায়, তাহলে গানটা সার্ভাইভ করা মুশকিল। এই বৃহত্তর process-টায় তুই বোধহয় intervene করতে পারবি না।

পার্থ : না কিছুতেই পারব না।

রংগন : কারণ যেভাবে economy বদলে যাচ্ছে, যে ভাবে সমাজের চেহারা বদলে যাচ্ছে, তুই যেটা বললি যে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত থেকেই যদি বদল শুরু হয়ে থাকে, এবং আমার মনে হয় এখন বাউলের অধিকাংশই কিছুটা group theatre type-এর জিনিসপত্র হয়ে যাচ্ছে, যারা অন্য কিছু করছে। কিছু কিছু বাউলের ক্ষেত্রে, যারা গান গেয়েই জীবন চালায়, তাদের হয়তো patronage নিয়ে কিছু কিছু problem হচ্ছে তারা কিভাবে কি করে ইত্যাদি ইত্যাদি। একটা জিনিস বোধহয়

আমাদের পরিস্কার রাখা উচিত সেটা হচ্ছে তুই যে বলছিল না বাউল গান market বিক্রি করে না আরেকটা কিন্তু problem যেটা হচ্ছে ...

পার্থ : Market বিক্রি করে না আমি ঠিক বলতে চাইনি। আমি বলছি market-এ পৌঁছে দিতে হবে তো আগে, তারপর প্রমাণ হবে বিক্রি হয় কি হয় না, market-এ পৌঁছোচ্ছেই না।

রংগন : আরেকটা জিনিস আমি যেটা ১৯৯১-৯২তে যখন সুমন এলো, নচিকেতা নতুন আরো কেউ কেউ এলো তাদের আর ধর রূপমদের মতো কিছু গায়ক এবং কিছু Band ছাড়া এবং রবীন্দ্রসংগীত কিছুটা steadily বিক্রি হয়, এছাড়া বাংলা গানের কিন্তু হতদরিদ্র অবস্থা। সাধারণভাবেই বলা যায় রেকর্ড ইন্ডাস্ট্রি কোন বিশাল বাংলা গান বিক্রি করছে তা কিন্তু নয়।

পার্থ : সবই Hundreds-এ বিক্রি হচ্ছে।

রংগন : কাজেই এখন কিন্তু মূলত আর্টিস্টরা টিকে আছে শুধুই performance-এর উপরে, একটা সিডি লাগে তাদের, কারণ সিডিটা তাদের বিজ্ঞাপন। যে আমি একজন সিডির গায়ক, গাইতে পারি, এবার তুমি আমায় ক্যানিং বা হাঁসখালিতে show দাও। তো সেখানে দাড়িয়ে তুই বাউল গান বিক্রি করাবি এটা একটু এমনিতেই মুশকিল। কারণ রুচিও তো বদলে যাচ্ছে। আমার মনে হয় যে, বাউল একদমই নয়, যেটাকে বলে রসের গান ওই পরীক্ষিৎ বালা বা ওই ধরনের গায়করা যেগুলো গায় সেগুলোর কিন্তু subaltern market একটা বিশাল আছে ...

পার্থ : Huge market আছে সেটা একদম openly sexual গান, আদিরসাত্মক গান ...

রংগন : কিন্তু খুবই interesting গান। যাই হোক সেটা অন্য বিষয়। তুই যেটা বলছিল ideally বিদেশে যেটা হয়, প্রায় শেষ হয়ে যাওয়া যে ফর্মগুলো টিকে আছে, সেইগুলোও বোধহয় এই state council-এর grant বা ওরকম কিছু দিয়ে বাঁচিয়ে রাখার চেষ্টা হয়।

পার্থ : Museum level-এ।

রংগন : State-এর grant-এ basically, এখানে state-এর grant যে ছিল না বা নেই তাও না কিন্তু সেটাও তো ...

পার্থ : কুক্ষিগত হয়ে গেছে।

রংগন : ভীষণভাবে কুক্ষিগত হয়ে গেছে, এবং বাউলদেরকেও আবার continuously স্বাস্থ্য শিক্ষা প্রসারে ব্যবহার করছে।

পার্থ : হ্যাঁ। মানে Polio-র গানে, Aids-এর গান ...

রংগন : তার মানে হচ্ছে, যে রাজনীতি polio-র গান এবং Aids-এর গানটাকেই ultimate গান বলে মনে করে তার পক্ষে খুবই কঠিন হয়ে যায় সত্যিকারের বাউলগানের প্রতি মমত্ববোধ প্রকাশ করা। এবং তখন আর সে 'রস খাবি তুই রস খাবি' বুঝতে যাবে কেন? তাদের কোন দায় পড়েনি। তাই এইখানে দাঁড়িয়ে the larger question of survival of Baul art form-এর একটা সমস্যা আছে।

আরেকটা হচ্ছে যে আমি নাম করতে চাই না, অনেক তাত্ত্বিক যারা বাংলা গান নিয়ে অনেক কথা বলে, তাদের মধ্যে একটা আক্ষেপ দেখি যে বাউলরা নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। এখন সেভাবে দেখলে আমরা তো সবাই এক-না-এক ভাবে নষ্ট হয়ে গেছি .।।

পার্থ : ওগুলো খুব Verrier Ellwin মার্কা কথাবার্তা। মানে সব সময়ই তুমি একটা Anthropological Society খুঁজছো। এগুলোর কোন মানেই হয় না। কারণ যে বাউল রেডিও শুনছে — আমি এগুলো আজকের কথা বলছি না, ১৯৭০-এর দশকের কথা বলছি, যখন টিভি ছিল না তখনকার কথা বলছি, এবার রেডিওতে যখন সে popular কোন সুর শুনছে, তখন সেটা তার মাথায় ঘুরবে না? এবং সেই সুরটা কি তার সুরকে প্রভাবিত করবে না? নিশ্চয়ই করবে। সেটা নিয়ে আমার কোন মাথাব্যাথা নেই, এবং সত্যি বলছি এটা নিয়ে যাদের মাথাব্যাথা আছে ...

রংগন : এটা আমি এই অর্থে বলছি যে মানে বাউল গানের ধারাটা একভাবে বজায় থাকে এটাও তো চাস?

পার্থ : নিশ্চয়ই চাই। Purity বলতে আমি যেটাকে করবার চেষ্টা করছি, আমি বলে না আমরা সবাই চেষ্টা করছি, সেটা হচ্ছে বাউল গান আগে কিভাবে গাওয়া হত সেটা যদি discover করা যায়, আমি কাউকে বলছি না তুমি সেরকমভাবেই গাও, কিন্তু যারা সেরকমভাবেই গায় তাদের তুলে এনে অদীক্ষিত শ্রোতার সামনে গাওয়াও। ধরো, আমি তোমাকে বলছি সনাতনদার recording কিছু শুনেছিলাম, সৌম্যদা

(চক্রবর্তী) দিয়েছিল। সনাতন দাস ঠাকুর তুমি জান এখন নব্বই অতিক্রান্ত। সনাতনদার গান যদি তুমি শোন প্রত্যেক গানের সাথে প্রত্যেক গানের মিল পাবে, link পাবে। মানে একটার পর একটা develop করছে, মানে সে অর্থে পাল্লা হচ্ছে না কিন্তু উনি নিজেই একটা পাল্লা দিচ্ছেন।

রংগন : পাল্লা মানে?

পার্থ : পাল্লা মানে line ধরে গাওয়া, যেটা মানে একটা প্রশ্নোত্তর basis-এ হয় সাধারণতঃ দুজনে মিলে হয় অথবা তার বেশী গায়কও থাকতে পারে। সনাতনদার আমি একটা পাল্লাই শুনেছিলাম সনাতনদা, বিশ্বনাথদা আর চিন্তামনিদি, সেটা শান্তিনিকেতন stage-এ একবার হয়েছিল, ওটাই ছিল আমার একমাত্র অভিজ্ঞতা, কিন্তু এখনো আকছার পাল্লা হয়, অদ্ভুত ব্যাপার ...

রংগন : এখনো আছে?

পার্থ : এখনো আছে। এবং আমরা নিয়ে আসি প্রত্যেক বছর। সেটা আছে। এবং এ প্রসঙ্গে একটা মজার গল্প বলি। আব্দুল হালিম বলে একজন ফকির আছে রামপুরহাটের, আমারই বয়সী, আমার সাথে তুমি তুমি করে কথা বলে। পৌষমেলায় দেখা হয়েছে। আমি বললাম, হালিম এবার আমাদের উৎসবে তুমি পাল্লা গাইবে, তুমি আর রাধেশ্যাম দাস। রাধেশ্যামদাও রামপুরহাটেরই একজন বাউল শিল্পী। তোমরা গাইবে। ও বলল হ্যাঁ। প্রথমে খুব excited। কিছুক্ষণ বাদে ঘুরে এসে বলল, শোন পার্থ, আমি না পাল্লা গাইব না। আমি বললাম কেন? ভালো তো। বলল, না, পাল্লা গাইলে না মাথাটা ভীষণ গরম হয়ে যায়, প্রচণ্ড রাগ হয় মানে হেরে গেলে বা কিছু হলে প্রচণ্ড রাগ হয়। এই জিনিসটা কিন্তু এখনো রয়েছে, মারাত্মক involvement। এই ফর্মটার যদি at least কিছু আমরা নিদর্শন দেখাতে পারি, তাহলে সেটা আমরা পরবর্তীকালে উপভোগ করতে পারি।

রংগন : এটার কি একটা parallel আমরা Indian Classical গানের ক্ষেত্রেও দেখতে পারি? যেহেতু একটা patronage পাওয়া গেল upper class-এর তাই টিকে গেল একটা ফর্ম-এ, মানে সেখানেও আধুনিকতা এসেছে বা বদলেছে, কিন্তু মূল ফর্মগুলো তো রয়ে গেছে।

পার্থ : এখানে একটা কথা বলতে চাই। ধরো পশ্চিম বাংলায় যেটাকে তুমি classical বলছো, সেটা মধ্য প্রদেশ-এ কিন্তু folk। কুমার গন্ধর্বের যে গানগুলো আমরা classical হিসেবে treat করে কিনছি, মানে গন্ধর্বজী যে কবীরের গানগুলো গাইছেন, বা আরো কারো গান যেমন নামা বা আর কারো গানগুলো গাইছেন, সেগুলো কিন্তু সব folk। ওখানে তুমি যদি জয়পুর থেকে ইন্দোর বা জয়পুর থেকে গোয়ালিয়র ট্রেন নাও, সেখানে ট্রেনে যে গানগুলো শুনতে পাবে সেগুলোই কিন্তু কুমার গন্ধর্বের গান, তাই কোনটাকে classical বলব, কোনটাকে folk বলবে সেটাকে categorize করা কিন্তু একান্তই আমাদের বুদ্ধিজীবীদের সমস্যা।

রংগন : আমি কিন্তু খুব গোদাভাবে বলছি যে ধর রবিশঙ্কর এখানে যে বাজনাটা বাজাচ্ছেন, তাকে তো বাংলা ব্যান্ড-এর সুরে বাজাতে হচ্ছে না। তার মধ্যে তো synthesiser বাজাতে হচ্ছে না। উনি যে ওঁর মতো বাজিয়ে যেতে পারছেন whatever the Raga তার পেছনে নিশ্চয় একটা কারণ আছে যে nationaly বা more than that internationaly একটা clientele তৈরি হয়েছে যার কাছে এটার একটা, সে exotic other হিসাবেই হোক বা যা করেই হোক, একটা sustainable music market তৈরি হয়েছে। আমার একটা যেটা মনে হয় যে এঁরা সবাই যে অধিকাংশভাবে বিদেশে থাকেন, তার কারণ বিদেশে প্রচুর শেখার লোক বা শোনার লোক Global industry-তে একটা জায়গা নানা ধরনের fusion-এর জায়গা ...

পার্থ : তাই করে survive করছে। কলকাতায় আমাদের teenage-এ কতকগুলো music conference হত বল। এখন টিমটিম করে একটা ডোভার লেন, একটা উত্তরপাড়া আর একটা নতুন হয়েছে সল্টলেক — এই রয়েছে তিনখানি। সদারঙ্গ বন্ধ হয়ে গেছে, পাকসার্কাস বন্ধ হয়ে গেছে, you name it বন্ধ হয়ে গেছে, কাজেই আমাদের দেশের মধ্যে music-এর stand alone role-টা যেটা ছিল সেটা কিন্তু নেই এখন আর ...

রংগন : যে নানা বিশাল রকম music practice এর scope-টা ছিল সেটা কমে গিয়েছে, মানে তুই রবীন্দ্রসঙ্গীত বল, ভীষ্মদেবের ঘরানা একটা আলাদা ছিল, তার মানে music-এর scope নেই, কমে আসছে ... in

that case তোকে যদি আজকে বাউল গানের purity-টাকে ধরে রাখতে হয় তাহলে যে কোন দেশেই হোক তোকে একটা সেই form-এর clientele তৈরী করতে হবে, তো সেটার ... মানে তোরা যেটা চেষ্টা করছিস, civil society-র মধ্যে থেকে কিছু লোক দেবে, বা রাষ্ট্র দেবে, বা বাজার দেবে। এই তিনটে form-এর মধ্যেই হতে হবে। বাজার এখনো অবধি কিছু দিচ্ছে না যদিও কিছু বাউল যেমন পূর্ণ দাস-এর international একটা market আছে। নাকি?

পার্থ : খুব যে বাজার আছে আমার মনে হয় না। যেমন ধর আমি নাম করতে চাই না ... কেউ যদি ওখানে survive করে তার আরো নানারকম factor আছে। I don't want to go into the details কিন্তু সে শুধু গান গেয়ে বেঁচে আছে এমনটা বিশ্বাস করা কঠিন। কিছু অনুষ্ঠান নিশ্চয়ই পায়। কিন্তু যে অর্থে আলি আকবর খাঁ সাহেব আমেরিকা-তে বসে থাকেন সে অর্থে কোন বাউল বিদেশে বসে থাকতে পারে না। কিছুতেই পারে না। অবশ্য ওরা যে এটা চাইছে তাতো নয়, মানে বেশীরভাগই তা চায় না। কিন্তু আমার যেটা বক্তব্য, ধর যাদবপুর বা প্রেসিডেন্সির ছেলেরা, মানে কলেজের ছেলেরা তাদের যে festival হয় তাতে কিন্তু চায় ওখানে একটা বাউল গানের অনুষ্ঠানও হোক। বেশীরভাগ জায়গায় হয়ও। সেগুলো আমি নিজেও দেখেছি। ছেলেপিলেও অংশীদারী থাকে। তারা উপভোগও করে গানটা তখন। But the moment they go to the market they don't find anything to buy.

রংগন : বাউল গানের একমাত্র ভালো Recording তো ওই French Recording-টা, আর তো প্রায় নেই ...

পার্থ : ওই ব্যক্তিগত stock-এ যা আছে। মানে proper sound recording খুব কম। পূর্ণ দাসের কিছু গান Dylan-রা করেছিল সেগুলো আছে এরকম আর কিছু। যাদবপুরের তো নিয়মিত ছেলেরা বাউল অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। এমনকি আমার জানা আছে সেন্ট জেভিয়ার্সেও ইদানীংকালে বেশ কয়েকবার বাউল অনুষ্ঠান হয়েছে। অতএব বাউলগানের যে শ্রোতা আছে তা অনস্বীকার্য। কিন্তু তোমাকে শুনতে হলে, যে সমস্যায় আমি সারাজীবন ভুগেছি তাতে ভুগতে হবে। Unless you yourself record it you don't get to listen to it.

রংগন : এটা খুব contradictory না? আমরা চিরকাল জেনে এসেছি যে কোন কিছুর যদি demand থাকে তাহলে market সেটা তৈরি করবে। মানে এর পেছনে তো কোন political resistance নেই, তাহলে বাজার তৈরি হচ্ছে না কেন?

পার্থ : আমার মনে হয়েছে যে Music Industry-র চলনটাই খুব গতানুগতিক হয়ে গিয়েছে। যেমন ধর HMV বা অন্য কোন রেকর্ডিং কোম্পানিগুলোর গোড়ার দিকে মানে ১৯৫০ বা ৬০-এর দশক অব্দি অনেক লোক থাকত যারা গিয়ে গান বা গায়ক খুঁজে নিয়ে এসে রেকর্ড করাত। এখন কিন্তু সেটা উঠে গেছে। কোন improvisation নেই কোন innovation নেই। তার ফলে জিনিসটার মধ্যে একটা জড়তা এসে গেছে। মানে তুমি যে নতুন, নতুন ঠিক নয়, এগুলো কোনটাই নতুন নয়। But you have to know the right people to sing the right songs.

মনে হল যে বাউল করি তো করলাম। কিন্তু তোমার কোন Research নেই। তা হাতের কাছে যাকে পাওয়া গেল তাকে দিয়েই Record করিয়ে দিলে। সে হয়তো exponent নয়। মানে marketing point of view থেকেও তো জিনিসটা ঠিকঠাক হলনা। সেটা তো আমাদের পক্ষে করাও সম্ভব নয় কারণ আমরা তো music industry-র একদম ভেতরে বসে নেই। আমরা তো peripheral একটা ঘটনা।

রংগন : এসব ক্ষেত্রে কি Net ব্যবহার করে কিছু করা যায়?

পার্থ : আমরা চেষ্টা করছি। কিন্তু Net ব্যবহার করতে গেলে তো তোমাকে Net savvy হতে হবে। সেটা আমার নিজস্ব একটা অসুবিধা আছে।

রংগন : কিন্তু তার জন্য তো লোক আছে।

পার্থ : হ্যাঁ তা আছে। কিন্তু তা ছাড়াও সমস্যা আছে। এই ধর credit card number দিয়ে দিতে হবে। Credit card লাগবে Debit card দিয়ে হবে না, এইসব আর কি। আমাদের website-টা ready-ই হয়ে গেছে কিন্তু চালু করতে পারছি না। একটা হাজার দশেক টাকা মত লাগবে।

রংগন : তা তোর কি মনে হয় youth তুই বলছিলি এখনো বাউল গান পছন্দ করছে এই youth তো তোর আমার youth যখন ছিল ধর ৩০টা বছর

আগে তার থেকে তো আলাদা।

পার্থ : অনেকটাই আলাদা।

রংগন : তো তারা কি বলছে? তাদের অমন বাউল গান ভালো লেগেছিল কেন? সেটা কি আমরা জানি? আমাদেরই বা কেন ভাল লেগেছিল?

পার্থ : Difficult প্রশ্ন। ঠিক আঙুল দেখিয়ে বলতে পারব না। মানে সুরের বোধহয় ওরকম করে ঠিক বলা যায় না। একটা সুর কেন ভালো লাগে ওরকম করে বলা মুশকিল। তবে একটা জিনিস তো বলাই যায় যে আমরা একটু আলাদা type তো ছিলাম। মানে তখনকার যাদবপুরের সাধারণ ছেলেমেয়েদের থেকে। মানে গান শোনার জন্য তুমি হঠাৎ করে কেন্দুলি চলে গেলে এটা সবাই করত না। এবারে এটা এখনকার ছেলেদের মধ্যেও আছে। এবার যখন তারা ফিরে আসছে, একটা জিনিস organise করছে তখন দেখা যাচ্ছে yes a crowd could gather around it.

রংগন : একটা জিনিস আমার মনে হয় যারা seriously বাউল গান শুনছে তারা তো শুনছেই, আবার কিন্তু Modernity সারাক্ষণই তো একটা glamourous other তৈরী করে। মানে আমরা ধর Buffalo soldiers এর ঐ লোকটা, Bob Marley-কে দেখি, মানে আমাদের problem-টা হচ্ছে এখন যে অবস্থা আমাদের সময়ও প্রায় একই রকম ছিল। এখন pressure-টা একটু তুলনামূলকভাবে বেড়েছে, মানে engineer হতেই হয়। তারপর IIM যেতেই হবে। তারপর, Bangalore যেতেই হবে, বা আজ নিজের একটা গাড়ি কিনতে হবে তারপর আর একটা বড় বাড়ি কিনতে হবে। তারপর এখন তো Love Marriage খানিকটা কমেই এসেছে। মানে এখন যেটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে Love Marriage within the category of arranged marriage. আমি অনেক মেয়ের সাথে কথা বলেছি, তারা বলছে, আমরা মোটামুটি জানি ছেলেদের কাছে আমরা কি চাই। সেরকম ছেলে দেখেই তাদের ভালোবেসেছি। এবং এটা খুবই interesting কারণ ধর এখন তো Revolution-এর গল্প মোটামুটি static-ই হয়ে গেছে। আমার একটা যেন মনে হয় প্রচুর মেয়ে ভালোবেসে বিয়ে করে ঠকেছে, মানে বিরাট CPM বা নকশাল বিয়ে করে দেখা গেছে তাদের

রান্নাঘরে আটকে দিয়ে তারা বিপ্লব করতে গেছে। এটা আমার খুব favourite quote, অনেকসময়ই বলি। আমি একদিন এক মহিলার বাড়ি গিয়েছিলাম। সে রান্না করছিল। আমি তার স্বামীর সাথে চা খেয়ে বিপ্লব নিয়ে আড্ডা দিচ্ছিলাম। বিপ্লব তার আগে over হয়ে গেছে, over হয়ে গেছে মানে তার date over হয়ে গেছে। মহিলা আমার জন্যই রান্না করছিলেন। বাঁধাকপি কাটতে কাটতে বললেন আসলে সবই ঠিক আছে জানেন কিন্তু রাজনীতি করতে কি যে ভাল লাগত। তাই তাদের তো আমাদের so called মার্ক্সবাদীরা কিছু দিতে পারেনি।

তো যদি ফিরে আসি, যে জীবনটা এখন কতটুকু আমরা গুছিয়ে নিতে পারি সেই calculation-এ চলে গেছে। আবার violence বাড়ছে চারদিকে মানে যতই তুই পোশাক পর, যাই কর, ভেতরে একটা নগ্নতা থেকেই যায়। বাউল গান বোধহয় একটা available and permissible otherness-এর একটা প্রতীক কিছু লোকের কাছে। Definitely একটা mystic other এবং আমি নিশ্চিত তোদের দর্শকদের মধ্যেও কিছু লোক আছে যারা এসেছে একটু গাঁজা খাব, একটু মাল খাব, একটু অন্য রকম হবে বলেই। কাজেই বাউলকে আমরা একটা otherness এর জায়গা হিসেবেই ধরে নিয়েছি। যে বাউলরা এরকম থাকে, বা বাউলদের sex life নিয়ে আমরা কিছু জানি না কিন্তু সেটা নিয়ে আমাদের বিশাল ধারণা আছে। এবং সেটা নিয়ে কিছু লোকের লেখা-টেখার ফলে আরোই একটা ব্যাপার হয়েছে।

পার্থ : কিন্তু আসলে কিছুই হচ্ছে না।

রংগন : কি জানি? আমার এ বিষয়ে কোন ধারণা নেই।

পার্থ : মানে আমি তো খুব কাছ থেকেই দেখেছি খুবই সাধারণ সাংসারিক জীবন।

রংগন : এরকম বলিস না অনেকেই ভেঙে পড়বে।

পার্থ : না আমি এই রহস্যটা একদম ভেঙে দিতে চাই। এটা নিয়ে অনেক কথা অনেকের কাছেই অনেক শুনেছি। কিন্তু আমার জীবনে আমি অনেক ভালো-ভালো, আচ্ছা-আচ্ছা বাউল দেখেছি। সনাতনদা তো বলেনই যে বাউলরা হচ্ছে গৃহী সন্ন্যাসী। কারো কারো দেখেছি দুটো বিয়ে আছে। কিন্তু কতো লোকেরই তো আমাদের বাবা-কাকাদের আমলে

দুটো বিয়ে, তিনটে বিয়ে থাকত। কিন্তু সেটা খুব সাংঘাতিক Universal কিছু নয়।

রংগন : একটা ধরণ তো সেটা যখন লোকে পায় তখন enjoy করে।

পার্থ : কিন্তু তার মানেই যে সারাক্ষণ দেহ সাধনা হচ্ছে সাধনসঙ্গিনী বদলে যাচ্ছে এগুলো সবই একটা materialistic সমাজের গল্প।

রংগন : অতটা কিছু হচ্ছে না।

পার্থ : মানে এটা ঠিক যে দেহ সাধনার কতগুলো পদ্ধতি আছে প্রকরণ আছে কিন্তু সেগুলো আমরা যে অর্থে যৌনতা বুঝি তা তো নয়।

রংগন : না না একদমই নয়।

পার্থ : মানে তুমি একটা মেয়েকে পাঠিয়ে ছিলে না কয়েকদিন আগে? আমি তাকে বললাম যে তুমি যদি sexuality দিয়ে দেহতত্ত্ব বুঝতে যাও তবে সেটা নেহাৎই খণ্ড চিত্র হবে। আর কিছুই হবে না। দেহতত্ত্বের মূল কথা হচ্ছে ভাণ্ডেই ব্রহ্মাণ্ড। ভাণ্ড বলতে এখানে মানবদেহ বোঝান হচ্ছে। মানে দেহের মধ্যে যে নিয়মগুলো আছে, সেগুলোকে যদি তুমি জানতে পার তাহলে বিশ্বচরাচরের নিয়মগুলোও তুমি আবিস্কার করতে পারবে। দেহতত্ত্বের যে প্রকরণগুলো সবই চান্দ্র calendar মেনে। দেহের যে fluid তার চর্চা তো তাই ২৮ দিনে মাস। সেটা একটা pre-industrial calendar, মানে নারীদেহের যে নিয়ম। মানে পুরুষের দেহেরও তাই নিয়ম কিন্তু সেটা অত প্রকট নয় বলে শুধু নারীদেহের কথা বললাম। শুধু তাই নয় it's a pre-industrial calendar, pre-industrial physiology, pre-industrial medicine, ওষুধের ব্যবহার, তন্ত্র তো basically pre-industrial physiology, দেহতত্ত্ব তো পুরোপুরি একটা তান্ত্রিক ব্যাপার। আমাদের তো Buddhist tradition-টা খুব strong ছিল মানে আমাদের বাংলা সাহিত্যের প্রথম নিদর্শন চর্যাপদ। চর্যাপদ তো তান্ত্রিক text এবার তারপরে ইসলাম এল, সুফীবাদ এসে convert করে দিলো একটা বড় সংখ্যক নিম্নবর্গের জনসাধারণকে, এবার এরা যখন মুসলমান হলো তখন কিন্তু তন্ত্র ছেড়ে দিল না। এবার ধর পঞ্চদশ শতব্দীতে চৈতন্য আসছে। এসে তাদের ফিরিয়ে আনছে। তখন কিন্তু এরা তন্ত্র, সুফী, সবশুদ্ধ নিয়েই বৈষ্ণব হল। মানে তন্ত্রেরও অনেকটা থেকে গেল।

তারপর চৈতন্য মারা যাওয়ার পর কি হলো, গৌড়ীয় বৈষ্ণবরা এদেরকে ত্যাগ্ করল। চৈতন্যের যে জনসমর্থন সেটা তো নিত্যানন্দের হাতে তৈরী। নিত্যানন্দ তো ঐসব মানত না শুধু মদ খেত, মচ্ছব করত আর সংকীর্তন করত। তাই করে বহু লোককে বৈষ্ণব করে দিত। হিতেশ বাবুর ওই বইটার খুব ভালো লেখা আছে বাংলা কীর্তনের ইতিহাস — তুমি এটা এখন পাবে না, out of print, centre-এর library-তে পাবে। ছাপার ব্যবস্থা হচ্ছে কবে বেরোবে জানি না, তাতে আছে নিত্যানন্দের বিরুদ্ধে অদ্বৈত, শ্রীবাস এরা নালিশ করছে। কৃষ্ণদাস কবিরাজের text-এ আছে। এবার যখন ১৫৩৩ খ্রীষ্টাব্দে চৈতন্যদেব মারা গেল তখন এদের ছেড়ে দিয়ে ওরা upper caste vaisnabism-এ চলে গেল, তখন এরা যারা left out, এই left out অংশটাই পরে বাউল হলো। ধর in another 100 years time।

রংগন : তো বহু ধরনের প্রান্তিকতা মিলে একটা জিনিস তৈরী হল। এটা খুব ইন্টারেস্টিং কথা এখন মার্কেট হয় প্রান্তিকতাকে মার্কেট করে মেইনস্ট্রিম করে দেয়, না হয় তাকে শেষ করে দেয়। প্রান্তিকতাকে প্রান্তিক মার্কেটের জন্য বাঁচিয়ে রাখা যদি প্রফিটেবল না হয় তাহলে তো মার্কেট তাতে ইন্টারেস্টেড নয়, তাহলে এই গল্পটার মধ্যে দাঁড়িয়ে বাউল, তাদের ভবিষ্যৎ কি সেটা নিয়ে ভাবনা চিন্তা চলছে তোদের। আমার যেটা খটকা লাগছে মিউজিকের ক্ষেত্রে, একটা তো তুমি কলেজ স্যোসালে গেয়ে বেড়াচ্ছ। তোমার একটা অডিয়েন্স আছে সেটা তো ঠিক আছে, কিন্তু ধর ফিল্মের ক্ষেত্রে যেমন মাল্টিপ্লেক্স ব্যাপারটা হয়েছে মিউজিকের ক্ষেত্রে তেমনটা নতুন কিছু হতে হবে যেখানে মার্কেটেবিলিটিটা বাড়বে বা যাই হোক একটা চেহারা পাবে shape পাবে — সেটা কিন্তু হচ্ছে না।

পার্থ : নন-ফিল্ম মিউজিকের ক্ষেত্রে সেটা একেবারে হচ্ছে না, যেমন ধর শারদ গান-টান — এগুলো যেমন হারিয়েই গেল। ললিতা-টলিতা কত হিট হিট গান বেরোত, "এই যে নদী" তারপর "নয়ন ষড়যী" প্রত্যেক বছর ৮-১০ টা করে হিট গান হতো।

রংগন : সেইগুলো অনেকটাই হারিয়ে গেল এই যে ইউথের যে রাজনীতিটা, আমরা বলার চেষ্টা করছি, তার মধ্যে একটা some kind of protest

কথাটা আমি বলব না but different in a certain sense মানে difference-এর ক্ষেত্রে বাউলের একটা acceptability আছে। যে এই লোকগুলো এখনও খানিকটা মার্কেটটাকে defy করে চলেছে বা আমাদের main stream life-এর নিয়মগুলোকে defy করে চলেছে সেই জন্য একটা আকর্ষণ আছে। দুটো issue আছে। একটা হচ্ছে পুরোন formগুলোকে, তুই যেটাকে বলছিস archival space, তাতেই হোক বা যারা practitioner তাদের patronage তৈরি করেই হোক, এদের টিকে থাকার একটা ব্যবস্থা। অথবা আরেকটা হচ্ছে এই যে বাউল জ্যাজ্ যেটা গৌতম চট্টোপাধ্যায় শুরু করেছিলেন বা এখানকার পটা বা বনি যে বাউল গায়। আমার নিজের ভালো লাগে না এত বেশি ইলেকট্রনিক সাউন্ড দিলে ফোকের মধ্যে আমার ভালো লাগে না

পার্থ : কিন্তু আমার কথা হচ্ছে তুমি সব সময় ওদের ওপর তাকিয়ে থাকো তাহলে তো মুশকিল। আমাদের সোসাইটিতে কি কি পরিসর আছে যেগুলোকে আমরা ব্যবহার করতে পারি, আমার কাছে সেগুলো খুব পরিষ্কার নয়, সেটাই মুশকিলের জায়গা একটা জায়গা বোঝা গেলে সেটাকে তখন ব্যবহার করা যায়।

রংগন : রাস্তার ধারে bookstallগুলোও তো উঠে গেছে। নয়তো ওখান থেকে হয়তো কিছু বিক্রি করা যেত।

পার্থ : Outletগুলো কমে গেছে। আমি যে শুধু বাউল গান নিয়ে ভাবি তা নয়, ধর তুমি প্রমিতা মল্লিক বা রবীন্দ্র সংগীতের এখন যারা স্টার তাদের সিডি বিক্রির হাল শুনলে তুমি অবাক হয়ে যাবে।

রংগন : বাংলার নামকরা ব্যান্ডেরও ১১০০-১২০০-র বেশী বিক্রি হয় না।

পার্থ : আসলে ব্যান্ডের লোকজন কিছু পয়সা করছে কারণ এত শো করে ওরা। যেমন লক্ষ্মীছাড়া সে কোচবিহার চলে যাচ্ছে ত্রিপুরা চলে যাচ্ছে ...

রংগন : বাউলরা এই ধরনের শো পাচ্ছে না কেন?

পার্থ : একেবারে যে পায়না তা নয়। কিন্তু তার সংখ্যা কম। আসলে ওখানে একটা স্টার ভ্যালু কাজ করে তো।

রংগন : আর একটা কথা তুই আমাকে বল। যে ফোক সঙ্, ধর কোন একটা টিমের ফোক সঙ্-কে টিকে থাকতে গেলে সেটা has to be the folk side of significant marketable community, আমি যেটা

বোঝানোর চেষ্টা করছি যে বাংলা যদি নিজেই একটা marginal ভাষা হয়ে যায় তো তার যে 'other' মানে ধর এক্ষেত্রে বাউল আরো insignificant হয়ে যায় কিনা for example আজ America এত বড় একটা capitalist community বলেই তার মধ্যে ধর পিট সিগার আমাদের অনেকের থেকে বেশী বিক্রী হয়। বাউলের কি কোনও প্যান ইন্ডিয়ান মার্কেট আছে?

পার্থ : হ্যাঁ আছে। তো এই ধর একটা বড় টিম যাচ্ছে দিল্লীতে।

রংগন : না দিল্লীর বাঙালিরাই শুনবে সেটা। অবাঙালিরা কি বাউল শোনে?

পার্থ : হ্যাঁ শোনে, কিন্তু এই ইস্যুটাই যেটা তুমি বললে খুব গুরত্বপূর্ণ যদি বিদেশে একটা লোক পূর্ণ দাস শুনতে যায়, তাহলে একজন পাঞ্জাবী কেন বাউল শুনতে পারবে না। না শোনার কিন্তু কোন কারণ নেই, আমরা যেরকম বাবা মাল বা আলি ফারকাতুর শুনছি। কথার তো মানে বুঝছি না কিন্তু অসাধারণ লাগছে, তো বাউল তো সেরকম লাগার কথা।

রংগন : কথা তো।

পার্থ : আমরা যখন বাউল গান শুনি কটা কথা আর মন দিয়ে শুনি সবসময়? এক নম্বর। আর দুনম্বর হচ্ছে কথা মন দিয়ে শুনলেও তুমি অনেক কথা বুঝতে পারবে না, কারণ ওটা এত গভীর গল্প। তুমি বাউল ছেড়ে দাও। তুমি ভাওয়াইয়া গানের অবস্থা বল। অথচ বাংলাদেশে কিন্তু তা নয়। বাংলাদেশে কিন্তু রথীন রায়ের মতো স্টার ছিলেন। বাংলাদেশের গানের ব্যাপারটা কিন্তু আমাদের চেয়ে অনেক ভাল।

রংগন : না যেহেতু ওদের জাতীয় ভাষা বাংলা, তার ফলে অন্য কোন competing language তো নেই।

আমি ধর বাংলাদেশে কাজ করছি বাচ্চাদের সাথে বা বড়দের সাথে। গান নিয়ে ওদের ব্যাপারটা কিন্তু অন্য রকম, ওদের আধুনিক গান অনেক কম। ফোক কিন্তু অনেক বেশী। আমাদের আবার কি হয়েছে একটা মর্ডানিটির গল্পের পিছনে দৌড়তে গিয়ে, যেটা হেমাঙ্গ বিশ্বাস বলেছেন যে একটা সময় ফোকটাকে হেয় করে প্রায় বাদ দিয়ে দিয়েছিলাম। পল্লীগীতি বানিয়ে দিয়েছিলাম। এগুলো খুব কতগুলো

deep problem তৈরী হয়ে গেছে। এগুলোকে কি করে address করা যাবে আমি জানিনা।

পার্থ : আর একটা হচ্ছে, আগেও একদিন তোমার সাথে কথা হয়েছিল, যে আগে ছিল একজন গায়ক, তার গীতিকার আর সুরকার, তিনজন মিলে গানটি তৈরী হচ্ছে একটা team work। এখন তো এই ব্যান্ড-এর বাজারে সকলেই গান লিখছে, তারাই সুর দিচ্ছে, তারাই গাইছে — এবার গীতিকার সুরকার এই কথাগুলোরই মানে থাকছে না। ফলে ভালো গায়ক হচ্ছে কিন্তু তারা ভালো গান পাচ্ছে না।

রংগন : আমার মনে হয় একটু ইন্টারন্যাশনালি খোঁজ করা উচিৎ বিদেশে এরকম অবস্থায় কি হয়েছিল।

With Best Compliments

P. P.
ELECTRO
POWER
Kolkata

Philips Lighting Channel Partner

With Best Compliments

S & IB

SERVICES PVT. LTD.

With Best Compliments

Kalyan Kumar Banerjee

5, Rishi Bankim Chandra Road
P.O. Behala, Kolkata 700 034

Philips Lighting Channel Partner

With Best Compliments

BLUE DART EXPRESS LTD.

With Best Compliments

Supreme Suppliers Syndicate

Philips Light Channel Partner

With Best Compliments

Just in Time

With Best Compliments From:-

THE AD-O-GRAPHY

58/3A, Christopher Road, Kolkata - 700 046
Phone : (033) 6450 4871/ 2329 0120
E-mail : adography@yahoo.co.in

With Best Compliments

Kalyan Kumar Banerjee

5, Rishi Bankim Chandra Road
P.O. Behala, Kolkata 700 034

With Best Compliments

M/s Modak Bhander

Garia Main Road, Karer Ganga
Laha Bagan, Kolkata 700 084

θ থীমা

মণিকুন্তলা সেন: জনজাগরণে নারী জাগরণে। জন্মশতবার্ষিক সংকলনে আত্মজীবনী *সেদিনের কথা*, অপ্রকাশিত রচনা, আত্মীয়বন্ধুদের স্মৃতি ও রাজ্য বিধানসভার পাঁচটি বক্তৃতা। ৩৫০ টাকা। দুর্লভ চিত্রশোভিত।

জীবনের টানে শিল্পের টানে। রেবা রায়চৌধুরী। ৭০ টাকা।

সর্বজয়া। করুণা বন্দ্যোপাধ্যায়। ১০০ টাকা।

আরেক সর্বজয়া। করুণা বন্দ্যোপাধ্যায়। ৮০ টাকা।

ওঁরা, আমরা, এরা। শোভা সেন। ১২০ টাকা।

কেতকী দত্ত: নিজের কথায়, টুকরো লেখায়। শমীক বন্দ্যোপাধ্যায় গ্রন্থিত। ১০০ টাকা।

বিবিধ রচনা। বিনতা রায়। অভিনেত্রী-লেখিকার গল্পসংকলন ও চিত্রনাট্য। ১২০ টাকা।

[illegible]। জ্যোৎস্না দেবী। ১০০ টাকা।

[illegible]। স্মৃতি মিত্র। ১০০ টাকা।

সংগীতসূর্য উস্তাদ আমীর খাঁ। তেজপাল সিং। মীনা বন্দ্যোপাধ্যায় অনুবাদিত। জীবনী ও বন্দীশ সংগ্রহ। স্বরলিপি ও দুর্লভ চিত্রশোভিত। ৩৫০ টাকা।

মোর বন্ধু কাজলভোমরা। বিখ্যাত লোক সংগীত গায়ক কালী দাশগুপ্তের চিন্তা ভাবনা ও গানের সংগ্রহ। ৫০ টাকা।

হিন্দুস্থানী সংগীতে তানসেনের স্থান। বীরেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী। দুর্লভ ছবি ও চিঠিপত্র। ১০০ টাকা।

দেখি শুনি পড়ি লিখি। সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের শেষ কীর্তি। বাংলা ভাষার প্রথম পাঠ ও পঠনের এক একান্তই মৌলিক পাঠ্যপুস্তক। ২৫০ টাকা।

ঠিকানাঃ কলকাতা। সুনীল মুন্সী। ভূগোলবিদ ও রাজনৈতিক কর্মীর দৃষ্টিতে কলকাতার অন্য ইতিহাস। সচিত্র। আলোকচিত্রশোভিত। ১৫০ টাকা।

কলকাতার রাস্তায় রাস্তায়। রণজিৎ সিংহ। ১০০ টাকা।

৪৬ সতীশ মুখার্জি রোড, **কলকাতা ৭০০ ০২৬। দূরভাষঃ ৬৫৪৫ ৭১৬০/২৪৬৬ ৭৭৯৪**
themabooks@yahoo.com / www.themabooks.com

With Best Compliments

TEC

TECHNO ELECTRIC CORPORATION

36 Ezra Street, Ground Floor, Kolkata 700 001
Phone : 3985 0171-75 Fax : 91 33 2235 6702
Mobile : 98300 85453
adimohanka@yahoo.co.in
www.technoelectric57.com

Philips Lighting Channel Partner

With Best Compliments

SINGS TRAVELS

Kolkata

Authorised **Philips Railway & Air Travel Agent**

With Best Compliments

Arindam Bhunia

With Best Compliments

Just in Time

With best compliments

AUTO RIDERS

KOLKATA

PHILIPS LIGHTING CHANNEL PARTNER

Wishing Baul Fakir Utsav a grand success

From

GLOBAL ACCESS TRAVELS AND TOURS

13 J, Dhirendranath Ghosh Road
Neelkuthi, Bhawanipur, Kolkata 700 025

Kindly Contact us for following services :

- ~ Cheapest domestic Air Ticket
- ~ International Air Ticket
- ~ Hotel Reservation of any category in India and abroad
- ~ Package Tour in India and also abroad for groups and individuals (Tailor-made and Ready-made)
- ~ Indian Railway Ticket
- ~ Car rental Services of any city in India
- ~ Passport (New/Renewal) Assistance
- ~ Visa Assistance of any country
- ~ Foreign Currency of any country
- ~ Travel Insurance

Contacts :

Telephone : 083 2419 1333/1334/1377
Fax : 033 2419 1376
Email : globalacsstnt@vsnl.net
globalacss@rediffmail.com
Web : www.gatt.in

With best compliments

BRAND CATALYST

KOLKATA

PHILIPS LIGHTING CHANNEL PARTNER

With best compliments

ADIE CENTRE

SILIGURI

PHILIPS LIGHTING CHANNEL PARTNER